মগধ যুগে যুগে

রাজগৃহ পর্ব

শ্রীপারাবত

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ ॥ মে ১৯৬০ ॥ প্রকাশক ॥ সমীর কুমার নাথ ॥

নাথ পাবলিশিং ২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস ॥ কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট ॥ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ॥ নব মুদ্রণ ॥ ১ বি রাজা লেন ॥ কলকাতা ৭০০০০৯

শিল্পী

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

ময়নাপুরের নূরজাহান
মহাপ্রেম
কিতাগড
এখনো শিউলি ঝরে
লাভার্স লেন
শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে
বিনোদিনী
নির্জনতা নেই
তথন ওয়ারেন হেস্টিংস
এম. এল. পম্পা
আরাবল্লী থেকে আগ্রা
গাহাদুর শাহ
ভ্রমর গড়
বহ্নি পদ্মিনী

অতীত ভারতের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ইতিহাসের অস্পষ্টতার মধ্যে যে কয়টি আলোকস্তম্ভ দৃশ্যমান হয় মগধ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম। সাধারণ ভাবে আধুনিক যুগের বিহার প্রদেশের একটি অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন মগধরাজ্য, যা কালক্রমে তার সীমারেখা অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছিল। এই রাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানীর নাম ছিল গিরিব্রজ, কালক্রমে যার পরিবর্তিত নামকরণ হয়েছিল রাজগৃহ। এ যুগের রাজগীর। রাজগৃহ থেকে পরবর্তীকালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পাটলি-গ্রাম বা পাটলিপুত্রে। এ যুগের পাটনা।

পৃথিবীর খুব কম দেশের মানুষ মগধবাসীর মত তাদের অতীত গৌরব নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে। আধ্যাত্মিক দিকে দৃকপাত করলে দেখি বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের জীবনের বহু সময় এখানে অতিবাহিত হয়েছে। বস্তুত বুদ্ধদেব এই রাজ্যেই বোধিত্বলাভ করেন। মহাবীর ছিলেন এই রাজ্যের রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার এই দেশেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল। এই দেশ ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদ কৌটিল্যের আবাসস্থল। এখানেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন উপবর্ষ ও বর্ষ, পাণিনি আর পিঙ্গলা, বররুচি ও পাতঞ্জলি। কিংবদন্তী মানতে হলে মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান এই মগধ। জ্যোতির্বিদ্যার আদিপুরুষ আর্যভট্টের নামও এই রাজ্যের সঙ্গে জড়িত। তেমনি রয়েছেন চ্যবন ও দধীচির মত বহু মহাঋষি। এই দেশের আধ্যাত্মিক প্রবণতাকে বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করতে এখানে আধুনিক যুগে এসেছিলেন শিখ ধর্মের গুরু গোবিন্দ। পৃথিবীখ্যাত রাজন্যবর্গের কথা আমি এখানে উল্লেখ করলাম না।

মগধ রত্নগর্ভা। এই দেশ হল ইতিহাসের স্বর্ণখনি। সেই স্বর্ণ আহরণে প্রবৃত্ত হয়ে 'রাজগৃহ পর্ব' পাঠকবর্গের হস্তে তুলে দিলাম।

ইচ্ছা রইল 'পাটলিপুত্র পর্ব'ও তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার।

সাধুতার আমল

পুষ্প চয়নরতা আর্দ্রা আপন চিন্তায় মগ্ন। উদ্যানে প্রস্ফুটিত শতেক শ্রেণীর পুষ্পের দৃষ্টিনন্দন শোভা। সাধারণত আর্দ্রা প্রতিদিন শুধু অর্কপ্রিয়া কুসুম চয়ন করে। রাজকুমারী বাসবীর অতি প্রিয় এই পুষ্প। বাসবী তার প্রিয় সখী। অথচ সে নিজে কোন রাজকন্যা নয়, তার পিতা কঙ্ক একজন তপস্বী। বৎসরের অধিকাংশ সময় পর্বত-কন্দরে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকেন। ওই যে দেখা যায় পর্বতশ্রেণী, পাঁচটি পর্বত যেন পরস্পরের হস্ত দৃঢ় নিবদ্ধ করে দণ্ডায়মান এই নগরীকে বেষ্টন করে ওরই একটিকে নগরবাসীরা বলে ঋষিগিরি পর্বত। পিতা কঙ্ক ওই পর্বতের প্রায় শীর্ষদেশে এক গুহায় কৃষ্ণাজিন বিছিয়ে বৎসরের অধিকাংশ সময় তপস্যারত থাকেন। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা মহারাজা মান্ধাতার সুনির্দিষ্ট আদেশে মাঝে মাঝে আর্দ্রাকে নিয়ে যায় সেখানে পিতৃদর্শনের জন্য। অবশিষ্ট সময় এই পুষ্পসমৃদ্ধ উদ্যানের ভেতরের কুটিরে সে বসবাস করে এক বয়স্কা রমণীর তত্ত্বাবধানে। এই কুটিরের অবস্থিতি নগরীর একেবারে প্রান্তদেশে। কুটিরের পরই এক বিশালাকার তিন্তিড়ী বৃক্ষ। তারপর কিছুটা অসমতল অঞ্চল। সেই অসমতল ক্ষেত্রটি ক্ষুদ্রশাখ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। তারপরই সূচনা হয় পর্বতের উৎসঙ্গের।

আর্দ্রা মাতৃহীনা। তাকে কোনরকমে জন্ম দিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় ক্লিশ্যমানা তার গর্ভধারিণী স্বামীর মুখের দিকে একবার বেদনার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে স্বর্লোকে গমন করেছিলেন। সেই বিষাদ-ঘন দিবসটির কোন চিহ্ন আর্দ্রার চিত্তে পতিত হবার কথা নয়।

মহারাজা মান্ধাতা কঙ্কের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল। শিশু কন্যার প্রতিপালনের যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করে তপস্বীর ভারমুক্ত করেছিলেন। কঙ্ক কিন্তু চাননি তাঁর কন্যা রাজপুরীর বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠুক। তাই আর্দ্রা আপন কুটিরে থেকে গেল। তপস্বী কন্যা সে। তার আবাসভূমির পরিবেশ তপোবনের মত রইল।

অর্কপ্রিয়া পুষ্প বাসবীর খুব প্রিয়। কিন্তু আজ এই পুষ্প সে বাসবীকে দিতে পারবে না। দেবতাকেও নয়। আজ সে পবিত্র নয়। আরও দুদিন এইভাবে চলবে। কুটিরে থাকবে সে। তিনদিন পরে অর্কপ্রিয়ার সঙ্গে আরও কত বিচিত্র পুষ্পসম্ভার নিয়ে সে যাবে রাজপ্রাসাদে প্রিয় সখী বাসবীর কাছে। দীর্ঘ মালা গাঁথবে দুজনে মিলে। রাজপ্রাসাদের মালঞ্চের উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে সুবিশাল এক অশোক তরু। এই বৃক্ষকে তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে নিজেদের উদ্ভাবিত মন্ত্রে। পূজা সমাপনান্তে তারা তাদের সযত্ন-গ্রথিত মাল্য বৃক্ষের পদে

সমর্পণ করে। রাজমালঞ্চে কি কুসুমের অভাব রয়েছে? নেই। তবু আর্দ্রার উদ্যানের অর্কপ্রিয়া এক বিশেষ শ্রেণীর। এ জাতীয় বৃক্ষ রাজোদ্যানেও নেই।

পূর্ব গগনে নবার্ক যেন গণেশভূষণে আপ্লুত হয়ে সবেমাত্র পর্বতের অন্তরাল থেকে প্রকাশিত হয়ে উৎফুল্ল চিত্তে ঊর্ধ্বাকাশে পরিক্রমণের জন্য প্রস্তুত। পরিক্রমণের পূর্বে প্রতিদিনের মত একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য আর্দ্রার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়। এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে আর্দ্রার। প্রতিদিন এই মুহূর্তে বিবস্বানের ওই স্বর্গীয় রূপ দেখতে এখানে এসে দাঁড়ায় সে। অর্কপ্রিয়া বৃক্ষের নিকটে দাঁড়ালে তরুণার্ক কি তাকে না দেখে থাকতে পারবেন?

চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত মহারাজ মান্ধাতার রাজধানী এই গিরিব্রজ নগরী অতি মনোরম। সবাই জানে স্বয়ং ব্রহ্মার চতুর্থ পুত্র বসু এই নগরী প্রথম সৃষ্টি করেন। তারপর আর্যরা যুগের পর যুগ ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এদিকে এসে বসতি স্থাপন করে। দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এই নগরীর। অট্টালিকা গড়ে ওঠে, কত আবাসস্থল নির্মিত হয়। গিরিব্রজ নগরীর চতুপার্শ্বস্থ পর্বতগুলির পূর্বে কোন নাম ছিল না। সেগুলির এক একটির নামকরণ হতে থাকে। কী মাধুর্য সেই নামের। বৈভব, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক। ঋষিগিরি পর্বতকে বড় আপন বলে মনে হয় আর্দ্রার। সেখাসে তার পিতা থাকেন।

আর্দ্রা আজ ভাবে, প্রায় এক পক্ষকাল হতে চলল পিতার নিকট যাওয়া হয়নি তার। পিতার অভাব এমনিতে সে বেশী অনুভব করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে মন কেমন উতলা হয়ে ওঠে। পিতাকে না দেখে আসা অবধি শান্তি পায় না। তখন সে সখী বাসবীকে বলে একথা, মহারাজকে নিজে বলতে তার সঙ্কোচ। মহারাজা মান্ধাতা কন্যার মাধ্যমে আর্দ্রার এই অনুরোধ জানতে পেরে ব্যথিত হন। তিনি চান তাঁর কন্যার মত আর্দ্রাও তাঁর নিকটে এসে দাঁড়াবে, তাঁর কাছে আবদার করবে। মহারাজের কাছে অন্য কোন কথা বলায় আর্দ্রার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, শুধু নিজের প্রয়োজনের বেলায় যত সঙ্কোচ। কেন এমন হয় সে বুঝতে পারে না।

ওই তো ঋষিগিরি পর্বত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মনে হয়, কত নিকটে। উচ্চকণ্ঠে পিতাকে ডাকলে তিনি বুঝি শুনতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ওখানে যেতে হলে অনেকখানি পথ অতিক্রম করতে হয়। তারপর পর্বত-গাত্র বেয়ে কম উঠতে হয় না। একবার সে ভেবেছিল একা কোন একদিন চলে যাবে পিতার কাছে। হয়ত সেই সময় মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল তার বাসনার

কথা। নইলে একথা মহারাজের কানে যায় কি করে? তিনি কিন্তু এতটুকুও ক্রোধান্বিত হননি। তাকে তাঁর পাশে বসিয়ে মস্তকে হাত বুলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, গিরিব্রজ নগরীর অভ্যন্তরে বিপদের আশঙ্কা তেমন না থাকলেও প্রান্তদেশ মোটেও নিরাপদ নয়। আর্যরা এখানে বসতি স্থাপন করলেও স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা যথেষ্ট। তারা নগরীর পরিধির মধ্যে তেমন বসবাস না করলেও, পর্বতে ও অরণ্যে তাদের প্রাধান্যকে হেয় করা যায় না। তারা ব্রাত্য কিন্তু অসভ্য নয়। তাদের অনেকের রক্তের মধ্যে আর্য রক্তের সংমিশ্রণ রয়েছে। যে সমস্ত আর্য নূতন ভূখণ্ডের সন্ধানে সাহসে ভর করে বহু বছর পূর্বে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে এসেছিল। তাদের রক্ত এদের অনেকের ধমনীতে প্রবাহিত। তাই অন্তরে অন্তরে আর্যদের প্রতি এরা ঈর্ষা পোষণ করে। ঘৃণাও। ফলে অনেক পাপকর্ম সংঘটিত হয়। তারা জানে, ধরা পড়লে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

মহারাজা যেদিন আর্দ্রাকে অনেক ধৈর্য সহকারে এভাবে বুঝিয়েছিলেন, সেদিন রাত্রে কুটিরে পাশের শয্যায় শুয়ে তাঁর বয়স্কা প্রতিপালিকা প্রশ্ন করেছিল —মহারাজের কথা কিছু বুঝলে?

—বুঝেছি। আরও বুঝলাম, তুমিই মহারাজকে বলে দিয়েছ যে আমি একাকী পর্বতে যেতে চাই।

—বলবই তো। তোমার দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপর। তোমার বয়স হয়েছে। তুমি উদ্ভিন্নযৌবনা।

—জানি। বাসবী বলেছে।

—হুঁ। ব্রাত্যরা জানে পাপকার্যের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবু তারা নিবৃত্ত হয় না। সুযোগ পেলে আর্য নারীদের হরণ করে ওরা। বিশেষ করে তোমার মত কুমারীদের প্রতি ওদের লোলুপ দৃষ্টি থাকে। ওরা দেখে আর্যরা শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে ওদের ঘরের নারীদের এনে সম্ভোগে মত্ত। সেই নারীদের গর্ভে সন্তান এলে তারাও মোটামুটি আর্য পদবাচ্য হয়। তবে তারাই বা কেন আর্য নারীদের তাদের সন্তানের জননী করবে না? সেই সন্তানদের আর্য হতে বাধা কোথায়?

এই কথা শুনে সেই রাতে আর্দ্রার মনে পড়ে গিয়েছিল কপিশ বর্ণের ওই যুবকটির কথা যে তার উদ্যানের বহির্ভাগে দাঁড়িয়ে থেকে প্রায়ই তাকে নিরীক্ষণ করে। সেই নিরীক্ষণের ধরন অন্যরকম। যুবকটির দৃষ্টিতে সে আতঙ্কিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন ঘটেছে দ্রুত তালে। অথচ সে তার ধারয়িত্রী মাতার

কাছে একথা প্রকাশ করতে পারে না, পাছে সে উত্তেজিত হয়ে রাজপ্রাসাদে ছুটে গিয়ে সব প্রকাশ করে দেয়। একবার যদি মহারাজা মান্ধাতা একথা জানতে পারেন তাহলে তার স্থান বাসবীর মত হবে প্রাচীর ঘেরা রাজপ্রাসাদে। বন্দিনী হবে সে। এমন মুক্ত জীবন আর থাকবে না। ইচ্ছা মত ঘুরতে পারবে না, ফিরতে পারবে না, চিন্তা করতে পারবে না, গান গাইতে পারবে না। এই কুটিরে সে নাচেও। অথচ রাজপ্রাসাদে নৃত্য করে শুধু রাজনর্তকীরা—যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন ভদ্রা। এই কুটিরে গভীর নিশীথে অনেক সময় তার নিদ্রাভঙ্গ হয় অপূর্ব সঙ্গীতের মূর্ছনায়। সেই সঙ্গে আকাশ থেকে ভেসে আসে দেবনর্তকীদের চরণের শিঞ্জিনীর ঝঙ্কার, শুনতে পায় নৃত্যের ছন্দ। তার প্রতিপালিকা সারাদিনের পরিশ্রমের পরে তখন পার্শ্ববর্তী শয্যায় গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর তালে তালে নাচে। খুব আনন্দ হয় তার। পায়ে তার নূপুর থাকে না। থাকলেও পরতে পারত না। প্রতিপালিকার ঘুম ভেঙে যাবে। রাজপ্রাসাদে দূর এবং নিকট থেকে রাজনর্তকী ভদ্রাকে সে দেখেছে কয়েকবার। ভদ্রা শুধু সুন্দরী নন, তাঁর পাদচারণে নৃত্যের ছন্দ, তাঁর সর্বঅবয়বে অপূর্ব হিল্লোল, তাঁর প্রতিটি অঙ্গুলিসঞ্চালনে এক-একটি মুদ্রার প্রকাশ। আর্দ্রা গোপনে রাজনর্তকীর সবকিছু অনুকরণ করে। বিশেষ করে গভীর রাতে যখন দিব্যাঙ্গনাদের নৃত্যগীতের ঝঙ্কার ভেসে আসে তখন সে বিভোর হয়ে নাচে। এতে অপার আনন্দ। বাসবীর পাশে বসে মালা গেঁথেও এত সুখ পাওয়া যায় না। বাসবীর সান্নিধ্যের চেয়েও এই সময়টি অনেক বেশী উপভোগ্য।

আপন মনে পুষ্প চয়ন করতে করতে একসময় আর্দ্রা অস্বস্তি অনুভব করে। কে যেন অন্তরাল থেকে তার সর্বাঙ্গ অবলেহন করছে। সে চকিতে উদ্যানের বাইরে দৃষ্টিক্ষেপ করে। দেখতে পায় সেই কপিশ বর্ণের যুবকটি দণ্ডায়মান। আর্দ্রা অর্কপ্রিয়া পুষ্পের মতই আরক্তিম হয়ে ওঠে। এই রক্তিম হয়ে ওঠার পশ্চাতে যত না স্ত্রী তার চেয়ে অনেক বেশী অমর্ষণ। যুবকটির সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়া কঠিন। মানুষটি কোন্ দিকে তাকায় নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ সে কেকরাক্ষ। তবু আর্দ্রা তার দিকে চাইলে সে এতটুকুও ভীত হয় না। উপরন্তু পরিতৃপ্তির হাসি হাসে। সেই হাসি আর্দ্রার শরীরে জ্বালা ধরায়। সে মনে মনে সঙ্কল্প করে এবারে সব প্রকাশ করে দিতে হবে। লোকটি যাতে দণ্ড পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ব্রাত্যের উপযুক্ত চরম দণ্ড তার অবশ্যপ্রাপ্য।

পুষ্প চয়ন অসমাপ্ত রেখে আর্দ্রা দ্রুতপদে কুটিরে প্রবেশ করে। তনুলতা তার কম্প্রমান। আজ সূর্যদেবকে দর্শনলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হল সে। হয়ত তিনি ক্রোধান্বিত হলেন। আজ ওই যুবকটির স্থানে যদি তিনি এসে দাঁড়াতেন তাহলে দু বাহু বাড়িয়ে সে এগিয়ে যেত। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

কুটিরাভ্যন্তরে এসে দাঁড়িয়ে সে যখন একথা ভাবছিল তখন লক্ষ্য করল একটি রক্তিমরেখা ঋজুভাবে বাতায়নপথে তার কুটিরে প্রবেশ করল। সেই রেখা রূপ ধারণ করল এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষের। সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ আর্দ্রা বিস্মৃত হয় পারিপার্শ্বিক সবকিছু। তার বাক্যস্ফূর্তি হয় না। এই বিহ্বলতা কয়েক পল তাকে আচ্ছন্ন রাখে। তারপরই সহসা সে চিনতে পারে যিনি তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি স্বয়ং সূর্যদেব। ওই ব্রাত্য যুবকের স্থলে সে যে এঁকেই যাচ্ঞা করেছিল—দেবতাজ্ঞানে, স্বামীজ্ঞানে। মূর্তির পদতলে বসে তাঁকে প্রণতি জানাতে গিয়ে তার মনে পড়ে যায় সূর্যদেবকে আজ স্পর্শ করতে পারবে না সে।

সূর্যদেব হেসে বলেন—আমাকে তুমি স্বামীরূপে কখনো ভাবনি। আজ ভাবলে কেন?

আর্দ্রা অশ্রুসিক্ত নয়নে বলে—বাইরে একজনকে দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলাম। আর কারও কথা যে মনে পড়েনি প্রভু।. আপনাকে প্রতিদিন দেখি এই সময়, তাই আপনাকে স্বামী বলে মনে হল। স্বামীই তো রক্ষাকর্তা।

সূর্যদেব বলেন—আর্দ্রা ওই যুবক কর্তৃক তুমি লাঞ্ছিত হবে। এটা বিধিলিপি। বিধিলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না। আর আমাকে তুমি স্বামীরূপে পাবে না। তোমার স্বামী অন্য একজন। সে তোমার মত মানুষ। দেবতা নয়। তবে তার মধ্যে আমার তেজ নিহিত আছে। তাই মনুষ্যকুলে সে দুর্লভ পুরুষ। সে সুদর্শন। যে কোন নারীর পক্ষে তাকে স্বামীরূপে লাভ করা অতীব সৌভাগ্যের।

আর্দ্রা সূর্যদেবের উক্তির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করার পর বলে—আপনাকে কি কেউ স্বামীরূপে পাবে না কখনো?

—পাবে। আপাতত, একজন রমণীর কথা আমার গোচরে আছে। ভবিষ্যতে অন্য কোন রমণী পাবে কিনা এখনো জানি না।

—সেই সৌভাগ্যবতী কে?

—তিনি পরবর্তী যুগের এক রূপবতী রাজকন্যা।

—তাঁর কথা জানতে ইচ্ছা হয়।

সূর্যদেব হেসে বলেন—সেও ঠিক তোমারই মত। এক তেজস্বী ঋষি তার সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বর প্রদান করবেন এই বলে যে সে যখন যাকে আহ্বান করবে তাকে সামনে পাবে। খেয়ালের বশে সে আমাকে আহ্বান করবে। আমি উপস্থিত হলে সে ভীত হয়ে বলবে যে অন্যায় করে ফেলেছে। সে আমাকে অনুনয় করবে, প্রার্থনা জানাবে আমি যেন চলে যাই। কিন্তু তাতে বিধাতার উদ্দেশ্য তো সফল হবে না। তাই তাকে বলব, তুমি আমাকে স্বামী রূপে পেতে চেয়েছ। সুতরাং এভাবে চলে যেতে পারি না। সেই রাজকন্যা বিবাহিতা নয়। তবু তার গর্ভে জন্ম নেবে এক অসাধারণ সন্তান। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ক্ষত্রিয় মায়ের গর্ভে জন্মেও সেই সন্তান ক্ষাত্রমর্যাদা পাবে না। তবে অন্য এক অসাধারণ গুণের জন্য সে অমর হয়ে থাকবে। এই গিরিব্রজ নগরীরই এক অধীশ্বরকে তুষ্ট করে একখণ্ড রাজ্য লাভ করবে সে। কিন্তু জীবনে কখনো শান্তি পাবে না। সারা জীবন দগ্ধ হতে হতে নিঃশেষিত হয়ে যাবে সে।

—আপনি অন্যরকম ঘটাতে পারেন ইচ্ছা করলে।

—না। এও বিধিলিপি। এর পরিবর্তন নেই।

হঠাৎ আর্দ্রা দেখে সূর্য রশ্মি অন্তর্হিত, দেবতা অদৃশ্য। সে বিষণ্ণ হয়, আতঙ্কিত হয়। ওই যুবকটির হস্তে সে লাঞ্ছিত হবে। কতটা? সেকথা সূর্যদেব তাকে বলে যাননি। তবে নিস্তার নেই তার। বিধিলিপি। তবু এটুকু জেনে নিয়েছে সে যে তারও স্বামী হবেন একজন। যিনি স্বামী হবেন তিনি এই ধরণীতে আছেন। তারই মত মানব সন্তান। কিন্তু কতদূরে আছেন? এই মুহূর্তে তিনি কি করছেন? জানতে সাধ হয় আর্দ্রার। তিনি যদি বাইরের ওই যুবকটির হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন, তাহলে স্বামীর পদে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে শান্তি পাবে।

বয়স্কা রমণী তার কাছে এসে বলে—এত তাড়াতাড়ি ঘরে এলে যে! পুষ্প চয়ন করবে না?

—না। আজ থাক।

—উদ্যানে দেখলাম, ফুলগুলি ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কেন? কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি।

রমণী তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। শেষে বলে—এখানে কিসের সুঘ্রাণ? তুমি কিছু পুষ্প ঘরে এনেছ?

—না।

—এত সুঘ্রাণ কিসের তবে? দেবস্থানে যেমন সুগন্ধ বিরাজ করে, ঠিক

তেমন।

আর্দ্রাও জানে একথা। অর্কদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুবাসে চতুর্দিকে আমোদিত হয়ে উঠেছিল। এখনো তার সৌরভ বাতাসে ভাসছে।

সে বলে—দেবতা এসেছিলেন।

—কোন্ দেবতা? নারদ?

—কেন, তিনি হবেন কেন?

—তিনি বিশ্বের সর্বত্র ঘুরে বেড়ান।

—না, তিনি নন। সূর্যদেব।

রমণী প্রণাম জানায় সূর্যের উদ্দেশে। তারপর সে বাইরে যাবার সময় আর্দ্রা বলে—দেখ তো মা, উদ্যানের ওদিকে পথের ওপর কাউকে দেখা যায় কিনা?

—কাকে? এই সকালে কে আসবে?

—মনে হল, কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি দেখেছি।

—পুরুষ?

আর্দ্রা ভীত হয়। সে জানে, এতটুকু সন্দেহজনক কিছু বললেই মহারাজার গোচরীভূত হবে। বলে,—হ্যাঁ।

প্রতিপালিকার চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে চলে যায়। একটু পরে এসে বলে—কাউকে দেখলাম না তো।

আর্দ্রা বলে—তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কোথায় যাও?

—তোমার জন্য দুধ আনতে, মধু আনতে।

—প্রতিদিন যেতে হয়?

—হ্যাঁ।

—অত দেরি কর কেন? একটু আগে আসতে পার না?

—কেন? ভয় করে?

—হ্যাঁ।

—আমি মহারাজকে গিয়ে বলব। বলব, প্রাসাদে যখন তোমাকে রাখা যাবে না, এখানে প্রহরী রাখার ব্যবস্থা করতে।

আর্দ্রা বলে—মহারাজ অনেক আগে সেকথা আমাকে বলেছিলেন। আমি সম্মত হইনি। প্রহরী বেষ্টিত হয়ে থাকা আর প্রাসাদে থাকার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

প্রতিপালিকা একটু দ্বিধাভরে বলে—তুমি ভীত হবে বলে একটা কথা আগে

বলিনি। একজন ব্রাত্য এই কুটিরের ওপর লক্ষ্য রাখে।

—এমন সুন্দর পুষ্পোদ্যান। দেখতে আসে না তো?

ক্রোধান্বিত রমণী বলে ওঠে—হ্যাঁ পুষ্প দেখতেই আসে। তবে সেই পুষ্প উদ্যানের নয়, কুটিরের অভ্যন্তরের এই পুষ্পটি।

আর্দ্রা মস্তক অবনত করে।

সূর্যদেবের অতীব ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাব তার অন্তরকে রূপ রস গন্ধে ভরিয়ে দিয়েছিল। তার হৃদয় অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি অদৃশ্য হতেই সবকিছু নিমেষে অন্তর্হিত হল। রূপ রইল না, রসও রইল না। শুধু তাঁর দিব্য তনুর সৌরভ আঙিনার পুষ্পরাজির সুবাসের সঙ্গে মিলেমিশে ভাসতে থাকল। কিন্তু যে জ্যোতিতে চিত্ত আলোকিত ছিল সেই জ্যোতি না থাকায় অন্তর তার ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন হল। সে ভীত হয়ে পড়ল আবার।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রতিপালিকা গেল দুধ আনতে, মধু আনতে। আর্দ্রা চতুর্দিক একবার ভালভাবে দেখে নেয়। কেউ কোথাও নেই। দূরে চৈত্যক পর্বতে দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে। ওই দাবানল কিছুক্ষণের মধ্যে অনেকখানি বিস্তার লাভ করবে। তারপর একটি অঞ্চলকে দগ্ধ করার পর ধীরে ধীরে তার উগ্রতা হ্রাস পাবে। শেষে একসময় আপনা থেকে নির্বাপিত হবে। সে শুনেছে, ওই পর্বতের কোন একটিতে দেবকুলের আকুল প্রার্থনায় দধীচি মুনি তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রে দেবরাজ ইন্দ্র অসুর নিধন করে দেবতাদের প্রভুত্ব রক্ষা করেছিলেন। আ ার স্থির বিশ্বাস, ওই চৈত্যক পর্বতেই দধীচি আত্মত্যাগ করেছিলেন। কারণ ওখানে যখন দাবানল প্রজ্বলিত হয়, তখন বজ্রের ন্যায় নিনাদে চতুর্দিক প্রকম্পিত হতে থাকে। সে জানে আজও অমন শব্দ হবে একটু পরে। মুনিবরের অস্থিচূর্ণ কি এখনো পড়ে রয়েছে ওই চৈত্যক পর্বতগাত্রে—যার জন্য অমন নির্ঘোষ?

আচম্বিতে আর্দ্রা উদ্যানের এক পার্শ্বে পথের ওপর এই গোধূলি লগ্নের স্তব্ধতার মধ্যে কারও পদশব্দ শুনতে পায়। দাবানলের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সে দেখে সেই কপিশ বর্ণের যুবক উদ্যান-বেষ্টনী এক উল্লম্ফনে অতিক্রম করে তারই দিকে ধেয়ে আসছে। সন্ধ্যার পূর্বের অস্পষ্ট আলোকে যুবকটির কামার্ত মুখাবয়ব দেখে সে চমকিত হয়। সভয়ে কুটিরের প্রান্তদেশে আত্ম-

গোপনের জন্য ধাবিত হয়। কিন্তু বড় দুর্বলা সে। ওই যৌবনমদমত্ত শক্তিধর পুরুষটি অনেক দ্রুত। সে মনে মনে সূর্যদেবের কাছে আক্ষেপ করে, তুমি আমায় দর্শন দিলে অথচ বললে না এত তাড়াতাড়ি এমন অঘটন ঘটতে চলেছে। তবে কি তুমি আমাকে অভয় দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলে? তাই কি তুমি বলেছিলে, এই বিপদ আসবে, আবার কেটে যাবে। হে বীচিমালি! তাই কি তুমি বলেছিলে আমার স্বামী হবেন আর্য, হবেন নরশ্রেষ্ঠ?

ব্রাত্য যুবকটি উদ্যান অতিক্রম করে কুটির দেহলীতে দু বাহু বাড়িয়ে আর্দ্রাকে চেপে ধরে। এভাবে আশ্লেষ আকাঙ্ক্ষায় কখনো কোন পুরুষ তাকে স্পর্শ করেনি। আর্দ্রার শরীরের প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে কি যেন ঘটে গেল। কিন্তু এমন হলে তো চলবে না। এ ব্রাত্য, এ আর্য নয়। এর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। তার শরীর অবশ হয়ে আসে, আত্মসমর্পণোদ্যত হয়। কিন্তু না। কখনো নয়। তার স্বামী আর্য। সে নিজে আর্য নারী।

যুবকটি ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে অস্পষ্ট ভাবে কত কি বলে যায়, যার অতি সামান্য অংশই আর্য ভাষা। তবু বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না আর্দ্রার।

সে চিৎকার করে ওঠে—আমাকে ছেড়ে দাও। মুক্তি দাও।

—না। তোমাকে নিয়ে যাব নিধু বনে। তুমি আমার স্ত্রী হবে। হবে আমার সন্তানের জননী। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ।

—না না। তা হবে না।

কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় ক্ষিপ্ত যুবক আর্দ্রার বক্ষের কঞ্চুলিকা এক হাতে ছিন্ন করে ফেলে। তার নিটোল উরসিজদ্বয় অনাবৃত হয়ে পড়ে।

ভয়ার্ত আর্দ্রা চিৎকার করে ওঠে—তুমি ঘোরতম অন্যায় করছ। আমি কুসুমবতী। পুরুষের স্পর্শের যোগ্য নই আজ।

যুবকটি কয়েক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তারপর আর্দ্রাকে স্বীয় স্কন্ধে উত্তোলনপূর্বক বলে—বেশ, আজ নয়। আজ তোমায় নিয়ে যাচ্ছি ওই অরণ্যে যেখানে আমার আপন জনেরা রয়েছে, যেখানে তোমার মত আরও কয়েকজন আর্য কন্যা রয়েছে। তারা সন্তানের জননী হয়ে সুখে ঘর করছে। তারা একটুও বিষণ্ণ নয়।

আর্দ্রা বৃথাই হস্তপদ নিক্ষেপ করতে করতে বলে—না, না।

যুবক গর্বের হাসি হেসে বলে—ওতে কিছু হবে না। ওতে আমার ভালই লাগছে। আমার শৃঙ্গার-স্পৃহা প্রবলতর হয়ে উঠছে। তোমার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তুমি আমার দেহের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছ।

আর্দ্রাকে নিয়ে উদ্যানের বাইরে ছুটে আসে যুবক। আর্দ্রা একবার শেষ বারের মত চিৎকার করে ওঠে—মহারাজ আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর্য পুত্র, তুমি আজ কোথায় ?

তার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চৈত্যক পর্বতের দাবানল ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সেখানে ঘন ঘন বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হতে থাকে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা সহসা বৃদ্ধি পায়—সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ।

বিস্মিত যুবক অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে—অকালে হঠাৎ এত মেঘের সমাবেশ কি করে হল ?

সে অনেক দূর অগ্রসর হয়। একটু পরে শুরু হবে পর্বতের সানুদেশ। সেই সময় সহসা সে থেমে যায়। বিদ্যুৎ চমকে লক্ষ্য করে সম্মুখে এক অতিকায় ভুজঙ্গ সাক্ষাৎ কালের ন্যায় উত্তোলিত ফণা বিস্তার করে পথিমধ্যে দোদুল্যমান।

—একি ! এমন সব ঘটছে কেন ?

আর্দ্রার বোধশক্তি ফিরে আসে ততক্ষণে। সে বলে ওঠে—আমাকে মুক্তি দাও। নিয়ে যেও না।

—না। অসম্ভব। আমি জানি স্বর্গের দেবতারা আমার ওপর প্রসন্ন নন। নইলে এমন সব ঘটবে কেন ? তবু আমি তোমাকে চাই। এই কৃষ্ণ সর্পের পথে আমি যাব না।

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতে সে আর্তনাদ করে ওঠে। আর্দ্রা স্পষ্ট অনুভব করে যুবকটির দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। তার দেহ থেকে যুবকটির বজ্রমুষ্টি শিথিল হতে হতে স্খলিত হল। আর্দ্রা অসমতল ভূমিতে পতিত হয়। কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকার পর সে উঠে দাঁড়ায়। সে লক্ষ্য করে কপিশবর্ণের যুবকটি প্রথমে বসে পড়ে, তারপর ভূমিশয্যা নেয়। ভুজঙ্গটি ততক্ষণে ফণা নত করে পথ থেকে সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী তৃণভূমিতে প্রবেশ করে। তবে কি সর্পদংশনে এমন হল ? সর্পের ওপর আর্দ্রার বরাবর দৃষ্টি ছিল। সে তো দংশন করেনি। তবে ?

চৈত্যক পর্বতের দাবানল নির্বাপিত হয়েছে। মেঘের গর্জন হ্রাস পেয়েছে। শুধু একবার মাত্র বিদ্যুৎ চমকিত হল। আর সেই আলোয় আর্দ্রা দেখল যুবকটির বক্ষে আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে একটি চিত্রপুঙ্খ। কার কর্মুক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এই শর ? কে এই ব্রাত্যের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করলেন ? তবে কি তিনি আর্যপুত্র ? না, তিনি তাকে চেনেন না এখনো। সূর্যদেবও নন, তিনি এখন বিশ্রামরত। তবে কে ?

বজ্র নির্ঘোষ আর নেই। অম্বুদ যাদুবলে অন্তর্হিত। সেই মেঘমুক্ত ক্রন্দসীর বুকে চন্দ্রমা প্রতিভাত হয়। যুবকটির দেহ নিশ্চল নিথর। আর্দ্রা ভাবে এই সুঠাম দেহ একটু আগেও ছিল কত প্রাণচঞ্চল, কত আবেগপূর্ণ। এখন কিছু নেই। ও ঈশ্বরেরই সৃষ্ট। কিন্তু কে ওকে শরবিদ্ধ করল? ঠিক সেই সময় দেখতে পায় আকাশপথে কার্তিকেয় চলেছেন। স্কন্ধে তাঁর কোদণ্ড লম্বমান। আর্দ্রা বুঝতে পারে, কে তার রক্ষাকর্তা।

সে হাত জোড় করে বলে—হে ষড়ানন, হে স্কন্ধ, তোমায় প্রণাম। এই যুবকটি যেন স্বর্গে স্থান পায়। ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু করেনি।

কার্তিকেয় স্মিত হেসে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে তাকে বরাভয় প্রদান করেন। তারপর ধীরে ধীরে ঋষিগিরি পর্বতের দিকে অদৃশ্য হন।

এতক্ষণে আর্দ্রার খেয়াল হয় তার বক্ষ অনাবৃত, তার পরিধেয় বল্কল-বস্ত্র অক্ষত নেই। সে ছুটতে থাকে কুটিরের দিকে। তার প্রতিপালিকা নিশ্চয় অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। তাকে না দেখতে পেয়ে কি যে করছে ভাবা যায় না। হয়ত কাঁদতে বসেছে কিংবা প্রাসাদাভিমুখে ছুটেছে। ত্রিযামার প্রথম যাম শুরু হয়েছে। তবে এই রাত এখন আর তমস্বিনী নয়—চন্দ্রিকা উদ্ভাসিত। পথ দেখে চলতে কোন অসুবিধা হয় না।

কিছুটা পথ অতিক্রম করতে রথঘর্ঘর কর্ণগোচর হয় তার। এই রথচক্র ধ্বনি তার অতি পরিচিত। বুক কেঁপে ওঠে। মহারাজ মান্ধাতা জেনে ফেলেছেন। তাঁর রথ অতি দুর্গম পথও পাড়ি দিতে সক্ষম। মহারাজ এই রথারোহণ করে নিশাকালে আকাশ বিহার করেন। সেখানে দেবকুলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, কথোপকথন হয়।

দূর থেকে আর্দ্রা দেখতে পায় প্রস্তরময় পথে রথচক্র ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মহারাজ তার কাছে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু বক্ষ তার কীভাবে আবৃত করবে? উন্মাদিনীর মত সে পথিপার্শ্বে হস্ত প্রসারিত করে। ভূমিচম্পকের পত্র উঠে আসে হাতে। সেই পত্র দু হাতে চেপে ধরে বক্ষে।

রথ তার সম্মুখে এসে থেমে যায়।

—আর্দ্রা।

—মহারাজ।

—উঠে এসো মা! তুমি সুস্থ তো?

—হ্যাঁ তাত।

—তাহলে তোমার কঞ্চুলিকা কোথায় গেল ?

—ওটি শুধু ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল।

—রাজমহিষী বললেন, দেবসেনাপতি তোমাকে উদ্ধার করেছেন এবং তুমি অক্ষত।

—তিনি যথার্থ বলেছেন। আমার কুমারীত্ব রক্ষা পেয়েছে।

আর্দ্রাকে পাশে বসিয়ে মহারাজ মান্ধাতা প্রাসাদের দিকে রথ চালনা করেন।

আর্দ্রা এই প্রথম নিজে থেকে মহারাজকে বলে—আমি পিতাকে দেখব।

—হ্যাঁ। কাল সেই ব্যবস্থা করে দেব।

আর্দ্রা আবার দ্বিধাভরে বলে—আমি কুটিরেই থাকব।

মহারাজা মান্ধাতা হেসে উঠে বলেন—অবশ্যই। দেবতা স্বয়ং তোমার রক্ষাকর্তা। তোমার ভাবনা কি ?

আর্দ্রার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মহারাজের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধায় তার চিত্ত আপ্লুত হয়।

মহারাজা বলেন—তবে আজ তোমাকে প্রাসাদে থাকতে হবে। মহিষী ও বাসবী দুজনেই তোমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল। তারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছে।

—আপনি, আমাকে হরণের সংবাদ কোথায় পেলেন ?

—রাজমহিষীর নিকট। তিনি গণ্ডকী শিলায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী শুনলেন। তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রেরণ করলেন তোমার সন্ধানে।

—আমার প্রতিপালিকা ? তার কি হল ?

—তাকে ওই পাপিষ্ঠ একটি বৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। আমি তাকে মুক্ত করে দিতে সে অচেতন হয়ে ভূতলে পড়ে যায়। তাকে কুটিরে রাখা হয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠেছে।

প্রাসাদে এসে পৌছন মাত্র রাজমহিষী ও বাসবী ছুটে এসে একসঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে।

আর্দ্রা রাজমহিষীর কানে কানে বলে—আমি অপবিত্র।

—কেন আর্দ্রা, ও তো তোমার ওপর অত্যাচার করেনি।

—না রাণীমা, সেকথা নয়। আমি কুসুমবতী।

—ও, এই কথা। বিপদে ওসব কিছু নয়। বিপদে পড়লে এই অবস্থায় দেবতার চরণ জড়িয়ে ধরা যায়।

—আগামীকাল আমার পিতার চরণ স্পর্শ করতে পারব ?

—অবশ্যই পারবে। তুমি তাঁর কন্যা। কে বলেছে, তুমি অপবিত্র ?

—আমার প্রতিপালিকা।

—সে দেখছি বুদ্ধিহীনা।

পরে বাসবী তাকে চুপিচুপি বলে—আমি এসব কিছু জানতাম না। বয়স্কা রমণীর সংস্পর্শে বেশী না থাকা ভাল। তারা মাঝে মাঝে ভাল উপদেশ দেয় বটে, কিন্তু অনেক সময় মনকে সঙ্কুচিত করে দেয়।

পরদিন মহারাজা মান্ধাতা স্বয়ং তাকে নিয়ে চললেন ঋষিগিরি পর্বতে কক্ষ সকাশে। সঙ্গে ক্ষুদ্র একদল সেনানী। প্রস্তরময় অসমতল তৃণগুল্ম সঙ্কুলিত পথ। পথিপার্শ্বে ইতস্তত অটবী শ্রেণী শোভা পাচ্ছে। আর্দ্রার শরীর পুলককণ্টকিত। অনেকদিন পরে পিতাকে দেখবে সে। গতকালের ঘটনার কথা শুনে তিনি কি বলবেন, সেকথা ভাবে আর্দ্রা।

রথচক্রধ্বনি পর্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। সে আর বাসবী কতবার পর্বতসমীপে গিয়ে চিৎকার করে নিজেদের নাম ধরে ডেকেছে। সেই নাম একটু পরেই ফিরে এসে তাদের ডেকেছে। এবারে মহারাজা বাসবীকে সঙ্গে আনেননি। নিশ্চয় সঙ্গত কারণ আছে। মহারাজা অত্যন্ত বিচক্ষণ। তিনি অকারণে কিছু করেন না।

মহারাজা মান্ধাতা একস্থানে এসে রথের গতি সংবরণ করেন। আর্দ্রাকে বলেন—তুমি সম্ভবত জান, ওইখানে রয়েছে তাপোদক কুণ্ড। তুমি স্নান করে এস। ওখানে কোন পুরুষের যাবার অধিকার নেই। নিশ্চিন্তে যাও।

—আপনি ?

সহাস্যে মান্ধাতা বলেন—আমাদের জন্য চিন্তা করো না। আমরা সরস্বতী নদীতে অবগাহন করব। তুমি কুণ্ডে স্নান করলে সজীব হয়ে উঠবে। তোমার শরীরের গ্লানি দূর হয়ে যাবে। তোমার পরিধেয় বস্ত্র একটি প্রস্তরখণ্ডের নীচে চাপা দিয়ে রাখবে। চঞ্চল বায়ু কারও আদেশ মান্য করে না।

আর্দ্রা একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে গিয়ে পরিধেয় বস্ত্র খুলে মহারাজের নির্দেশমত প্রস্তরের নীচে রাখে। তারপর কুণ্ডের উষ্ণ বারিতে অবতরণ করে। সে আর বাসবী যখন প্রায় শিশু ছিল তখন মহারাজ স্বয়ং তাদের দুজনকে প্রাসাদের সরোবরে সন্তরণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই জলে নামতে তার অপার

আনন্দ। নগরীর বহির্দেশে যে কোনো পর্বতের দিকে যেতে হলে এমন কয়েকটি তাপ কুণ্ড দেখা যায়। সে আর বাসবী আগেই এখানে স্নান করেছে। রাণীমা নিয়মিত স্নান করেন। এতে শরীর নীরোগ থাকে। এই সব উষ্ণ বারি অন্তঃসলিলা হয়ে সরস্বতী নদীতে গিয়ে মিশেছে। পিতা কঙ্ক বলেন যে গিরিব্রজের মত নগরী পৃথিবীতে দুর্লভ। এটি দৈমাতৃক দেশ। এখানে স্বচ্ছ-সলিলা নদী প্রবাহিত, আবার এখানে নিয়মিত বারিপাত হয়।

স্নানশেষে আর্দ্রা রথের নিকট ফিরে আসে। শরীর স্নিগ্ধ হয়। তীব্র ক্ষুধার উদ্রেক হয়। মহারাজের ইঙ্গিতে একজন এসে একটি সুদৃশ্য ভৃঙ্গার থেকে একপাত্র গোদুগ্ধ তাকে দেয়। বিস্মিত আর্দ্রা সেই দুগ্ধ পান করে অশেষ তৃপ্তি পায়। ভাবে, মহারাজা মান্ধাতা তুলনাবিহীন। এইজন্য তিনি দেবতাদের এত প্রিয়।

পর্বতের পাদশেষে অরণ্যানী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দণ্ডায়মান। ইতস্তত বন্যপ্রাণী দৃষ্টিগোচর হয়। কোথাও ময়ূর পেখম মেলে রয়েছে। কোথাও সামান্য একটু উন্মুক্ত স্থানে হরিণ মাথা নীচু করে শষ্পে মুখ দিচ্ছে। হিংস্র প্রাণীও রয়েছে। তবে তারা রথের শব্দে দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীরা নির্বিশঙ্ক। তাদের অনেককে দেখা গেল নির্ঝরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিপাসা নিবারণের অপেক্ষায়।

এসব দৃশ্য আর্দ্রা যে নতুন দেখছে তা নয়। তবু যতবার দেখে ততবার নতুন করে উপভোগ করে। তার বহুদিনের সাধ একটি হরিণ শাবক নিয়ে যাবে কুটিরে। পিতা কঙ্ক তাতে রাজী হননি। মাতৃক্রোড় শূন্য করে হরিণ শিশুকে নিয়ে যাওয়া অপরাধ। যদি স্বেচ্ছায় কোন হরিণমাতা তার শাবককে দিয়ে দেয় তবে অন্য কথা। তারপর অনেক হরিণের কাছে সে চেয়েছে। তারা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। দেয়নি। মহারাজা মান্ধাতাও কোন পশুপক্ষীকে বন্দী করে রাখার পক্ষপাতী নন। তাঁর প্রাসাদে কোন পশুপক্ষীকে বন্দী করে রাখা হয় না। তবে তিনি বলেছেন, যদি তারা স্বেচ্ছায় এসে প্রাসাদে কিংবা রাজোদ্যানে বসবাস করে তবে আপত্তি নেই। রাজমহিষী গোপনে কার্তিকেয়ের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। তারপর থেকে উদ্যানে চার পাঁচটি ময়ূর-ময়ূরীকে সব সময় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। উদ্যান পরিত্যাগ করে কোথাও যায় না তারা। বাসবীর খুব আনন্দ। মহারাজা একটা কিছু অনুমান করেন, তবে কোন মন্তব্য করেন না। দেবতার ইচ্ছার ওপর তাঁর কিছু বলার নেই। সেই দেবতা আবার যুদ্ধবিশারদ। তাঁকেও তো জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহেয়

মধ্যে অতিবাহিত করতে হল। নইলে রাজ্য এবং নগরীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। আর্যরা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। তিনি জানেন, তিনিই প্রথম আর্য, যিনি ধরিত্রীতে প্রথম প্রকৃত রাজত্ব স্থাপন করেছেন। ব্রহ্মার পুত্রের সৃষ্ট নগরীর সংস্কার সাধন করে রাজধানী নির্মাণ করেছেন। তাঁর পূর্বে অনেকেই অনেক স্থানে প্রভুত্ব করেছেন। তবে ঠিক এইভাবে নয়। তাঁর পিতা যুবনাশ্বও ভূম্যধিকারী ছিলেন। কিন্তু এইভাবে রাজ্য স্থাপন করে নয়। রাজধানী বলতে তেমন কিছু ছিল না। ভূম্যধিকারীর পুত্র হয়েও তাঁর জন্মবৃত্তান্তের কথা কারও জানা নেই। নিজের জন্ম সম্বন্ধে বিচিত্র সব কাহিনী বয়স্যদের মুখে শোনেন। পিতা যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ করে নাকি তাঁর জন্ম। অদ্ভুত গল্পকথা। সকলে বিশ্বাসও করে। আর তাঁর নামকরণ নিয়ে আর এক কল্পিত কাহিনী প্রচলিত। জননী নেই তাঁর। সুতরাং জীবন রক্ষার জন্য মাতৃদুগ্ধ কোথায় পেয়েছিলেন তিনি? দেবরাজ ইন্দ্র নাকি শিশুর অসহায় অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাঁর নিজের হস্তের তর্জনী শিশুর মুখবিবরে প্রদান করে বলে উঠলেন—মাংধাস্যতি। অর্থাৎ আমার এই তর্জনীর রস পান কর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামকরণ হল মান্ধাতা।

মহারাজা মান্ধাতা একবার আকাশবিহারে গেলে ইন্দ্রের সাক্ষাৎ পেয়ে যান। তখন তাঁকে প্রশ্ন করেন এই বিষয়ে। ইন্দ্রদেব স্মিত হেসে বলেছিলেন—সব কল্পনাকে কল্পনা বলে ভাব কেন? তোমরা মর্ত্যের অধিবাসী। কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়ে তোমরা অনেক মহৎ বস্তু সৃষ্টি করবে। তাতেই তোমাদের বিকাশ। তোমাদের অমরত্ব লাভের সুযোগ তাতে নিহিত আছে।

মহারাজা মান্ধাতার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ইন্দ্রদেব না দিলেও, তিনি আর কিছু বলেননি। তাঁর ধারণা তপস্বী কণ্বের কন্যার ন্যায় তিনিও জন্মের পরমুহূর্ত থেকে মাতৃহীন। পিতা যুবনাশ্ব নিবিড় অরণ্য অঞ্চলকে কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত করার কার্যে এত বেশী ব্যস্ত থাকতেন যে শৈশবে পুত্রকে সাহচর্য দিতে পারেন নি। ফলে নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল।

তবে একথা ঠিক তাঁর রাজ্যাভিষেক ইন্দ্রের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। ইন্দ্র বলেছিলেন—এর আগে পৃথিবীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল অনেক ব্যক্তি শাসন করেছেন। বড় অঞ্চলও অনেকের অধীনে ছিল। কিন্তু তুমি হলে প্রকৃত রাজা। আমি যেমন দেবরাজ, তুমি তেমনি মর্ত্যের রাজা। তাই তোমার রাজত্বকালের কথা বহু যুগ পরেও মানুষের মুখে মুখে ফিরবে।

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন মান্ধাতা একসময় দেখেন পর্বতের পাদদেশে এসে তাঁর রথ থেমেছে। এবারে পর্বতারোহণের পালা। কঙ্ক পর্বতের প্রায় শীর্ষদেশে একটি গুহায় অবস্থান করেন। এ পথ সবার পরিচিত এবং দুরতিক্রম্যও নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই গুহাদ্বারের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন।

কঙ্ক বাইরে আসেন। শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডল প্রশান্ত হাসিতে ভরে ওঠে। মহারাজা আভূমি নত হয়ে প্রণাম করেন। আর্দ্রা প্রণাম করে। সঙ্গে যারা এসেছিল তারাও প্রণাম করে।

কঙ্ক মহারাজকে বলেন—আর্দ্রা বিপদগ্রস্থ হয়েছিল ?

বিস্মিত মহারাজা বলেন—হ্যাঁ। আপনাকে কে বললেন ?

—যজ্ঞকালে বৈশ্বানর একথা জানালেন। তিনি বললেন, এজাতীয় ঘটনা আরও ঘটবে। পূর্বদিকে আর্যরা আরও অগ্রসর হচ্ছে না বলে তিনি সন্তুষ্ট নন। পূর্বদিকে অগ্নি দেবতাকে কেউ পূজা করে না। জানেও না। যতদিন না ওদিকে যাগযজ্ঞ হবে, যতদিন আর্য যাজ্ঞিকেরা ওদিকে না যাবে, ততদিন এমন বহু ঘটনা ঘটবে। হলকর্ষণও হবে না ওদিকে। তিনি চান ওই বিস্তীর্ণ বনভূমি জয় করতে এখনি উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বনভূমি পরিষ্কার করে হলকর্ষণের অধীনে আনলে ওরা অগ্নিদেবকে আপন করে নেবে।

মান্ধাতা বলেন—প্রভু, আপনি সবই জ্ঞাত আছেন। আমরা এই ভূখণ্ডে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছি বলে পশ্চিমের আর্যদের নিকট আর্য হয়েও আমরা ব্রাত্য। তারা আমাদের হেয় জ্ঞান করে। অথচ আমরা এসেছি বলে এদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তারলাভ করতে পেরেছে। অগ্নিদেবতা স্বয়ং চান আমরা আরও অগ্রসর হই। তবে কেন পশ্চিমের আর্যরা সেটা সহ্য করতে পারে না ?

কঙ্ক বলেন—তারা অজানাকে জানার স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। তারা অল্পে পরিতুষ্ট। এটা খুব ক্ষতিকারক। এর জন্য এক সময় এই গিরিব্রজ নগরী তাদের ওপর প্রভুত্ব করবে। এই গিরিব্রজ নগরী চতুর্দিকে গিরিবেষ্টিত বলে এর একপ নামকরণ হয়েছিল। একদিন এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হবে। এখানে বহু খ্যাতিবান রাজা মহারাজা বাস করবেন যুগ যুগ ধরে। এখানে ঈশ্বর-প্রতিম মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়ে জীবজগৎকে গ্লানিময় ও দুঃখদৈন্যে বিদীর্ণ জীবন থেকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাদের দগ্ধ চিত্তে শান্তির বারিসিঞ্চন করবেন। আপনি মহারাজ, এই নগরীর প্রথম ভূপতি। চিরকাল আপনার নাম মরলোকে উচ্চারিত হবে—কীর্তিত হবে।

তপস্বী কঙ্কের বাক্য সমাপ্ত হতে না হতে দেখা গেল মহারাজ মান্ধাতার

মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হল : ‹কলে বিস্মিত হয়ে উধ্বাকাশে চেয়ে দেখে দেবগণ সেখানে তাঁদের দিব্যমূর্তি নিয়ে বিরাজমান। সবাই তাঁদের প্রণাম জানাতে ধীরে ধীরে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঋষিগিরি পর্বতের বৃক্ষরাজির কোটি কোটি পত্র নৃত্য করে উঠল। সেই সঙ্গে সুগন্ধ সমীরণ প্রবাহিত হতে থাকল। পর্বতগাত্র থেকে নিম্নাভিমুখী নিঝর্র-ধারায় সঙ্গীতের মূছর্না।

মান্ধাতা পুনরায কঙ্ককে প্রণাম করলেন।

কঙ্ক বলেন—মহারাজ, আপনি ঈশ্ববেব আশীর্বাদধন্য।

মহারাজা মান্ধাতা প্রশ্ন করেন—কিন্তু হে তপস্বী, আমার পরে কে এই গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করবে? আমি অপুত্রক। পুত্রকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলে তার হস্তে রাজত্ব দেওয়া অনেক স্বস্তির। উপযুক্ত গুণান্বিত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব হবে?

—দুঃখ করবেন না। শীঘ্রই আপনার চিন্তার নিরসন হবে। আপনার উত্তরাধিকারী কয়েকদিনের মধ্যে খুঁজে পাবেন।

—কি করে বুঝব তাকে?

—তার চন্দ্রপ্রভ কান্তি দেখে, তার বীর্য দেখে সহজে চিনবেন তাকে।

মহাবাজা নীরব হন।

আর্দ্রা আজ পিতার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় না। তবে না পেলেও মহারাজার সঙ্গে পিতার কথোপকথন সে যথেষ্ট উপভোগ করে। সে লক্ষ্য করে পিতা পূর্বের চেয়ে আরও শীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেই শীর্ণতা তাঁকে দুর্বল করে দেয়নি। ববং তাঁর জ্যোতি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গুহাভ্যন্তরে যজ্ঞাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলছে। সেই সময় আর্দ্রা দেখে একটি স্ত্রী-মৃগ তার দুই শাবককে সঙ্গে নিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার অদম্য ইচ্ছা হল একটি শাবককে নিতে। কিন্তু পিতা পছন্দ করেন না। মহারাজাও অসন্তুষ্ট হন। সে হরিণ-মাতার দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে চায়। মৃগ থেমে যায়। সে আর্দ্রার মুখের দিকে তার মায়াভরা দৃষ্টি ফেলে। তারপর তার শাবকদের নিয়ে আর্দ্রার নিকট চলে আসে। আনন্দে উত্তেজনায় আর্দ্রার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে। কি করবে ভেবে পায় না। হরিণ-মাতা আর্দ্রার বস্ত্রাঞ্চল মুখ দিয়ে স্পর্শ করে।

কঙ্ক হেসে কন্যাকে বলেন—ও যখন দিতে চাইছে, তুমি একটিকে নিতে পার।

—নেব?

—হ্যাঁ।

—কোনটি নেব ?

—যেটা খুশি। দুটোই তোমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে দেখছি।

আর্দ্রা একটিকে কোলে তুলে নেয়। বাকি শাবকটিকে নিয়ে হরিণ-মাতা ধীরে ধীরে পর্বতগাত্রে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোলের শাবকটি সেইদিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে। তারপর তার মা অদৃশ্য হতে সে আর্দ্রার মুখের দিকে তাকায়। আর্দ্রা অশ্রুসিক্ত চক্ষে আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে তাকে।

মন্ত্রী কণাদ দুদিন পরে রাজসভায় এসে মহারাজ মান্ধাতাকে বলেন—আমার একমাত্র পুত্র গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে মহারাজ। এবারে তাকে আপনার আর রাজ্যের সেবায় উৎসর্গ করতে চাই।

মহারাজা বিস্মিত হয়ে বলেন—আপনার পুত্র এত বড হয়েছে ? কখনো বলেননি তো। তাছাড়া প্রাসাদে কখনো এনেছেন বলে মনে হয় না।

—না মহারাজ, প্রাসাদে ওকে আনিনি। তবে ওকে একবার আপনি দেখেছেন। একটি ঘটনার কথা বললে আপনার স্মরণে আসতে পারে।

—কোন্ ঘটনা ?

—সে তখন ছোট। শিশুই বলা যায়। একদিন আপনি সরস্বতী নদীর তীরে গিয়েছিলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমার সঙ্গে আমার পুত্র ছিল। শৈশবে সে ধনুর্বাণ নিয়ে চলতে ফিরতে পছন্দ করত। বয়সের তুলনায় তার ধনু ছিল বেশী দীর্ঘ। আমরা রাজ্যের সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলাম। সেই সময় দেখা গেল নদীর অপর তীরে একটি মৃগ তৃষ্ণা নিবারণার্থে জলে নেবে তীরবিদ্ধ হয়ে ছটফট্ করতে লাগল। আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। মহারাজের উপস্থিতিতে কে প্রাণী বধে সাহসী হল ? আমার পুত্রটি তখন এসে বলে যে সে তীর নিক্ষেপ করেছে। হরিণটির তীর মুক্ত করে শুশ্রূষা দ্বারা নিরাময় করা হল। আপনি আমার পুত্রকে যারপরনাই তিরস্কার করলেন। শিশু বলে ক্ষমা করলেন না। বললেন, তৃষ্ণার্ত প্রাণীকে কখনো হত্যা করতে নেই। বললেন, অযথা প্রাণীহত্যা যত কম করা যায় তত ভাল। এতে শক্তির অপচয় হয়। প্রকৃত শক্তি পরীক্ষার সময় হীনবল হয়ে পড়তে হয়।

মহারাজা মান্ধাতার ততক্ষণে মনে পড়ে গিয়েছে। তিনি বলেন—ঠিক। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম ওই শিশু অত বড় ধনুতে তীর যোজনা করে কিভাবে

অপর তীরস্থ হরিণকে বিদ্ধ করল ? অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ। যদিও তার তীর হরিণের গাত্রে বেশী দূর প্রবিষ্ট হয়েছিল না। সেই পুত্র আপনার গুরুগৃহে থেকে ফিরে এসেছে ?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

—কি কি শিক্ষালাভ করেছে গুরুগৃহে ?

—তার আবাল্য বাসনা এই গিরিব্রজ পুরীকে আপনার অনুমতি নিয়ে অট্টালিকা আর উদ্যান শোভিত করে তুলবে। তাই সেখানে শিখেছে স্থাপত্য-বিদ্যা। তার গুরুগৃহ ছিল পর্বতের ওপর। সেই পর্বতের প্রস্তর কেটে সে ভাস্কর্য শিক্ষা লাভ করেছে। তার দ্বারা খোদিত প্রস্তর মূর্তি অতীব দৃষ্টিনন্দন। তাছাড়া মহারাজ সে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে এসেছে।

—খুব প্রীত হলাম। আপনার পুত্রকে দেখার ইচ্ছা রইল।

—মহারাজ, আপনি অনুগ্রহ করলে আগামীকাল তাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করতে পারি।

—আপনার পুত্রের নাম কি ?

—মহাগোবিন্দ।

—বয়স ?

—ত্রয়োবিংশতি।

—অনেকদিন গুরুগৃহে ছিল দেখছি। নিয়ে আসবেন।

মন্ত্রী কণাদ প্রস্থান করার পর মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মহিষী ও কন্যাকে ডেকে বলেন—কণাদ-পুত্র মহাগোবিন্দকে তোমরা কেউ দেখেছ ?

মহিষী মাথা নেড়ে বলেন যে তিনি দেখেননি। বাসবী হেসে বলে—একবার দেখেছি, যদি সেই মহাগোবিন্দ হয়।

—কোন্ মহাগোবিন্দ ?

—আর্দ্রার কুটিরের কাছে যে পক্ষীর সন্ধানে ঘুরত। বিরাট এক কোদণ্ড স্কন্ধে ঝুলত। সেটি ভূমি স্পর্শ করত। মাঝে মাঝে আবার জ্যা টঙ্কার দিত।

—মনে হচ্ছে, সেই মহাগোবিন্দই হবে। কারণ শিশুকালে সে ধনুর্বিদ্যায় দক্ষ ছিল।

বাসবী হেসে ফেলে। বালক মহাগোবিন্দকে শুধু একবার দেখলে কি হবে, আর্দ্রার মুখে তার সম্বন্ধে অনেক শুনেছে।

মহারাজা বলেন—মন্ত্রী কণাদের পুত্র সম্প্রতি গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আগামীকাল কণাদ তাকে রাজসভায় নিয়ে আসবেন।

বাসবী বলে ওঠে—তাহলে আর্দ্রাকে ডেকে আনতে হবে।

—কেন, আর্দ্রা কেন ?

—আর্দ্রার সঙ্গে ওর কিছুটা পরিচয় ছিল। আর্দ্রাদের কুটিরের পাশে এবং ওদের উদ্যানে অনেক বৃক্ষ। সেই সব বৃক্ষে বিচিত্র ধরনের পক্ষীর আনাগোনা। মহাগোবিন্দের তীরবিদ্ধ পক্ষী প্রায়ই আর্দ্রার উদ্যানে গিয়ে পড়ত।

মহারাজা একথা শুনে ব্যথিত হন। তিনি বুঝলেন, সরস্বতী নদীতীরে তাঁর তিরস্কার মিশ্রিত হিতোপদেশ বালকটিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—তারপর ?

—আর্দ্রা একদিন দেখে ফেলে মহাগোবিন্দকে। তাকে কাছে ডাকে। বলে, ঈশ্বরের এই সুন্দর সৃষ্টিকে নষ্ট করতে নেই। বলে, ওদেরও মৃত্যুযন্ত্রণা আছে আমাদের মত। তাব পর থেকে মহাগোবিন্দকে ওদিকে আর পক্ষী বধ করতে দেখা যায়নি। অন্যত্র করত কিনা জানা নেই। তবে ওদিক দিয়ে যাবার সময় আর্দ্রা প্রশ্ন করলে শুধু নাকি হাসত।

আর্দ্রার কথা শুনে মহারাজা ও রাজমহিষী পুলকিত নন। কক্ষের উপযুক্ত কন্যা বটে। অত শৈশবে তার চেয়ে চার, পাঁচ বছরের বড় বালককে কিছুটা সংযত করা তার পক্ষেই সম্ভব।

মহারাজা বলেন—আর্দ্রাও তাহলে অবশ্য উপস্থিত থাকবে রাজসভায়।

বাসবী সহসা অন্যমনস্ক হয়। মহাগোবিন্দ এখন আর বালক নয়। সে এখন নবীন যুবক। গৌরবর্ণ সুন্দর সেই বালকটি এখন কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে। নিশ্চয় আরও সুদর্শন হয়েছে। আরও বীরত্বব্যঞ্জক হয়েছে তার হাবভাব, তার আচার-আচরণ।

মহারাজা প্রশ্ন করেন—কি ভাবছ বাসবী ?

—মহাগোবিন্দর কথা ভাবছি। কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে। এখন তো আর বালক নেই।

—আমিও জানি না। তবে আমি বললে সে তোমাকে সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করতে পারে।

বাসবী বলে—তার আগে দেখতে হবে সে বীর্যবান কিনা। মহারাজ মান্ধাতার কন্যার উপযুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়। সে যদি বীর্যবান হয়, সে যদি অন্য গুণে গুণান্বিত হয়, তাহলেও তার প্রতি আর্দ্রার অধিকার বেশী বলে আমার বিশ্বাস।

—হুঁ, দেখা যাক। আসুক সে। চোখে না দেখে আগে থেকে সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়া সুবিবেচনার পরিচয় নয়।

পরদিন প্রভাতে আর্দ্রাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল। সে প্রথমে একটু বিস্মিত হয়েছিল। তারপর তাকে বলা হল রাজপ্রাসাদে একজন তরুণ আসবে, তাকে রাজপরিবারের সবাই দেখবে। সদ্য গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে সে। আর্দ্রা তাকে শৈশবে চিনত।

আর্দ্রার কৌতূহল তীব্র হয়। সে তরুণটির নাম জানতে চায় বাসবীর কাছে।

বাসবী হেসে বলে—দেখে চিনতে পার কিনা আগে দেখি।

আর্দ্রার কৌতূহল তীব্রতর হয়। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

যথাসময়ে রাজসভা শুরু হয়। মহারাজা ও মহারাণী সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বাসবী ও আর্দ্রা দুটি পৃথক আসনে উপবেশন করে। দ্বার উন্মুক্ত হয়। মন্ত্রী পাত্র মিত্র সবাই এসে সভাসীন হন। তাঁরা প্রতীক্ষা করেন কণাদ ও তাঁর পুত্রের জন্য। কারণ মহারাজ আজ তরুণটিকে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করবেন।

সেই সময় দ্বারপাল কণাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। সপুত্র কণাদ ভেতরে প্রবেশ করেন। দুজনে নত হয়ে প্রণাম করেন। সভা স্তব্ধ। স্বয়ং মহারাজ মুগ্ধ। মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করেন তপস্বী কঙ্কের ভবিষ্যদ্বানীর মর্মার্থ। সেই চন্দ্রপ্রভ রূপ। প্রথম দর্শনে প্রতীয়মান হয় যুবক অতীব বলশালী। মহারাজা নিশ্চিন্ত হন সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য তাঁকে আর চিন্তান্বিত হতে হবে না। উত্তরাধিকারী সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি কণাদ ও তাঁর পুত্রকে আসন গ্রহণ করতে বলেন।

আর্দ্রা আবিষ্ট। কে এই যুবক? এ যে অতি পরিচিত অথচ ঠিক চেনা যায় না। একেই বলে পুরুষের রূপ। সূর্যদেবের মত। এ নাকি তার পূর্বপরিচিত। সত্য কি তাই?

বাসবী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর্দ্রা মহা ভাগ্যবতী। আর্দ্রাকে লাভ করলে মহাগোবিন্দও হবে ভাগ্যবান। স্বামী এমনই হওয়া উচিত। তার নিজের ভাগ্যে কি লিখিত আছে কে জানে। আর্দ্রা তো সুখী হোক। ও সুখ পেলে তার তৃপ্তি কম নয়। শৈশব থেকে আর্দ্রা মাতৃহীনা। পিতা তার থেকেও সেই। অবলম্বনহীনা সে। স্বামীগৃহে শান্তি পাবে। এমন স্বামী যার সে কি সুখী না হয়ে পারে? দেবরাজ ইন্দ্রেরও কি এত কান্তি আছে?

কণাদ বলেন—মহারাজ, আমার পুত্র মহাগোবিন্দ আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী। ও নিজেকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তুলেছে।

মহাগোবিন্দ নাম আর্দ্রা কোথায় যেন শুনেছে। মনে করতে পারে না।

মহারাজা যুবককে প্রশ্ন করেন—তুমি কোন্ কাজ করতে চাও ?

মহাগোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—মহারাজ আমার সর্বপ্রথম বাসনা, এই নগরীকে ইন্দ্রপুরী অপেক্ষা অধিক রমণীয় করে গড়ে তোলা। সেই বিদ্যা আমি আয়ত্ত করেছি।

সভাস্থ ব্যক্তিগণ প্রশংসাসূচক শব্দ করে ওঠেন।

মহারাজ বলেন—উত্তম। গিরিব্রজ নগরীকে অমরাবতীতুল্য করে তুলতে তোমার যে সমস্ত উপাদান এবং যত কর্মীর প্রয়োজন হবে সব তুমি পাবে। কিন্তু নগরীকে দৃষ্টিনন্দন করে তুললেই তো হবে না, তাকে রক্ষা করতে হয়। নইলে বহিরাক্রমণে নগরী বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

—আপনি যথার্থ বলেছেন মহারাজা। আমি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি দেবসেনাদের ন্যায় একটি দুর্জয় সৈন্যদল গড়ে তুলব। নগরীকে রক্ষা করা ছাড়াও, এই সৈন্যদল রাজত্বের প্রসার ঘটাবে।

—চমৎকার। ধনুর্বিদ্যায় তুমি জন্ম থেকে দক্ষ, আমি জানি। তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। কিন্তু অসিবিদ্যায় কিংবা রথচালনায় তোমার পারদর্শিতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

—আমি পরীক্ষার জন্য সদা প্রস্তুত মহারাজ।

মহারাজা তখন তাঁর প্রধান সেনাপতিকে ডাকেন—সেনাপতি সূর্যকান্ত।

সূর্যকান্ত দণ্ডায়মাণ হয়ে বলেন—মহারাজ।

—এখনি মহাগোবিন্দের অসিবিদ্যার পরীক্ষা নিন। সবাই চলুন বাইরের প্রাঙ্গণে।

সূর্যকান্ত কেবলমাত্র সেনাপতি নন, অসিচালনায় অসাধারণ পারদর্শী। সকলে বাইরের প্রাঙ্গণে সমবেত হলে সূর্যকান্ত মহাগোবিন্দকে প্রশ্ন করেন—অসিবিদ্যায় তোমার গুরু কে ?

—আমার সর্ববিদ্যার গুরু নৈঋত মুনি।

—নৈঋত মুনি ?

শুধু সূর্যকান্ত নন, মহারাজা মান্ধাতা, এমন কি কণাদও এই নাম কখনো শোনেননি।

মহারাজা কণাদকে প্রশ্ন করেন—গুরু নির্বাচন কি আপনি করে দিয়েছিলেন ?

—না মহারাজ। ও নিজেই করেছে। একদিন সহসা এসে আমাকে বলে, গুরুগৃহে চললাম। আমি বাধা দিইনি। গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়েছিল, সে নিজেও জানে না। তবে তিনি সিদ্ধপুরুষ।

—আশ্চর্য !

সূর্যকান্ত মহাগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—তিনি কোথায় থাকেন ?

—চৈত্যক পর্বতে কয়েক বৎসরের জন্য অবস্থান করেছিলেন। আমাকে শিক্ষাদান শেষ করে চলে গিয়েছেন। তবে তিনি বলে গিয়েছেন কখনো কোন পথনির্দেশের প্রয়োজন হলে তাঁকে ধ্যান করলে তিনি আবির্ভূত হয়ে যথাযথ নির্দেশ দেবেন।

সূর্যকান্তের কৌতূহল হয়। প্রশ্ন করেন—তিনি নিজ হস্তে অসি ধারণ করতেন ?

—হ্যাঁ। তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু লৌহের ন্যায় কঠিন শরীর তাঁর। শার্দূলতুল্য তাঁর গতি। শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তাঁর দৃষ্টি। তিনি অজেয়। আমাকে তিনি অনায়াসে পরাস্ত করতেন। আমি কখনো তাঁকে পরাস্ত করতে পারিনি।

—আমাকে ? আমাকে তুমি পরাজিত করতে পারবে ?

মহাগোবিন্দ ইতস্তত করে বলে—আপনি একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। আপনার গতি শ্লথ। এখন আপনার অসিযুদ্ধ করা নিরাপদ নয়।

কণাদ তাঁর পুত্রের কথা শুনে স্তম্ভিত হল। মহারাজের মুখমণ্ডলে কোনরকম প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রতিভাত হয় না। কিন্তু সূর্যকান্ত ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠেন।

তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন—অসি ধর।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মহাগোবিন্দের ক্ষিপ্রতা সূর্যকান্তকে বিহ্বল করে তোলে। সবাই লক্ষ্য করে এইটুকু সময়ের মধ্যে অন্তত চারবার মহাগোবিন্দ সূর্যকান্তকে আঘাত করতে পারত। শেষে সূর্যকান্ত অসি নামিয়ে বলেন—তুমি যথার্থ বলেছ মহাগোবিন্দ। আমার বয়স হয়েছে বুঝতে পারছি। অসিযুদ্ধে তুমি অজেয় বলে আমার বিশ্বাস। তোমার গুরুপদে শতকোটি প্রণাম।

কণাদ পুত্রগর্বে গর্বিত হন। মহারাজা মান্ধাতা তাঁর বহুদিনের যুদ্ধসঙ্গী সূর্যকান্তের অবস্থা দেখে ব্যথিত হন। বাসবী আর আর্দ্রার মহাআনন্দ। সেই আনন্দ কোনরকমে চেপে রেখে তারা মহাগোবিন্দের পেশীবহুল অথচ কৃশ দেহের দিকে চেয়ে থাকে। আর্দ্রা ভাবে ব্রাত্য যুবকটির কঠিন হস্তের যে স্পর্শ তাকে অবশ করে দিয়েছিল, তাতে শুধু বলপ্রয়োগ ছিল। মহাগোবিন্দের এই অমিত বিক্রমের সঙ্গে প্রেমের আস্বাদন যে নারী লাভ করবে স্বর্গও তার নিকট বাঞ্ছনীয় হবে না। কিন্তু মহাগোবিন্দকে সে কবে চিনত ? কিছুতে স্মরণে আসে না।

এবারে রথচালনার পরীক্ষা। মহারাজা মান্ধাতার কয়েকটি রথ সব সময় প্রাসাদ প্রাঙ্গণে প্রস্তুত থাকে। এই রথচতুষ্টয় মহারাজা স্বয়ং পরিচালনা করেন।

অন্য কারও সাধ্য নেই এই রথগুলিকে গতিময় করা। এই রথগুলি চালনার উপযুক্ত সারথি দুর্লভ। অন্যান্য বহু রথ রয়েছে এই নগরীতে, কিন্তু সেগুলি এর তুলনায় নিম্নমানের। সারথিরা সেই রথ চালনা করে থাকে।

মহারাজা মান্ধাতা মহাগোবিন্দকে বলেন—ওই চারটির যে কোন একটি নিয়ে তুমি নগরী প্রদক্ষিণ করে এস।

মহারাজা জানতেন এই পরীক্ষায় মহাগোবিন্দ সফল হলে, গিরিব্রজের সেই-ই পরবর্তী মহারাজা।

মহাগোবিন্দ রথাভিমুখে গমন করে। তার পিতা কণাদের আশঙ্কা জন্মে এবারে পুত্র অকৃতকার্য হবে। কারণ ওই রথচতুষ্টয় মহারাজা ব্যতীত মর্ত্যবাসী কারও পক্ষে চালিত করা অসম্ভব বলে সবাই জানে। আর্দ্রা ও বাসবী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে মহাগোবিন্দ যেন এবারও কৃতকার্য হয়।

মহাগোবিন্দ রথারোহণ করে অবহেলায় সেটি চালনা করে সিংহদ্বার দিয়ে বাইরে চলে যায়।

সবাই ধন্য ধন্য করে ওঠে। আর্দ্রা আর বাসবীর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। রাজমহিষী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। মহারাজের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

প্রাঙ্গণে মহাগোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের জন্য সকলে অপেক্ষা করে। কারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি নেই। মহাবাজা মান্ধাতার মুখে প্রশান্তি বিরাজ করছে। সেনাপতি সূর্যকান্ত ভাবেন, এতদিনে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন। বহুদিন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে থেকে তিনি ক্লান্ত। অন্যেরা ভাবে কণাদপুত্র নিশ্চয় একটি খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হবে। রাজমহিষী ভাবেন, এই যুবক যদি বাসবীকে বিবাহে সম্মত হয় তাহলে তিনি কৃতার্থ হবেন। আর্দ্রা ভাবে, এই যুবক সত্যই কি তার পরিচিত ছিল কোন কালে? বাসবী ভাবে, আর্দ্রা ধন্যা।

এমন সময় ঘর্ঘর শব্দ। রথ নিয়ে ফিরে আসে মহাগোবিন্দ। যথাস্থানে রথ রেখে মহারাজের সম্মুখে এসে সে প্রণাম করে। মহারাজ উঠে গিয়ে তাকে সাদরে আলিঙ্গন করেন। হর্ষধ্বনি ওঠে।

কণাদ পুত্রকে বলেন—তুমি মহারাজকে সন্তুষ্ট করেছ পুত্র। তাঁর অধীনে কোন্ কাজ যাচ্ঞা কর, বল।

মহারাজ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলেন—আজ নয় কণাদ। আমি আগামীকাল একবার তপস্বী কঙ্কের সঙ্গে কথা বলতে যাব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব। আজ সভা এইখানে সমাপ্ত হোক।

কিন্তু সেইদিনই মধ্যাহ্নের কিছু পরে বরাহ পর্বতের সানুদেশে বসবাসকারী একদল হলধর ছুটতে ছুটতে রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তাদের।

মহারাজা সবেমাত্র মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলেন। ভোজন পরিত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে এসে কৃষকদের সামনে উপস্থিত হন।

তারা বলে—মহারাজ, যূথভ্রষ্ট দুটি হস্তী আমাদের গোধূম ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক ধনুর্বাণ, অনেক বর্শা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের আচরণ মত্তের মত।

মহারাজ বলেন—কাউকে হত্যা করেছে?

—না মহারাজ, আমরা বৃক্ষে আরোহণ করে নিজেদের রক্ষা করেছি। ওরা গ্রামে প্রবেশ করলে প্রাণহানি ঘটবে।

—গ্রামের দিকে এখনো যায়নি তো?

—না মহারাজ, এখনো ক্ষেতের সর্বনাশ করে চলেছে।

—তোমরা যাও। আমি এখনি যাচ্ছি।

—আমাদের সব গেল মহারাজ।

—বুঝতে পারছি। আমি তোমাদের আগেই পৌঁছব।

ওরা চলে গেলে মহারাজ আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন না। আজ তাঁর মধ্যাহ্নের খাদ্য ছিল ঘৃত ভৃষ্ট গোধূম পিষ্টক। অভুক্ত থেকে গেলেন। সোজা অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রথারোহণ করলেন। তারপর দ্রুত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মহারাজা রথ নিয়ে প্রথমে গেলেন সেনাধিনায়ক সূর্যকান্তের নিবাসে। সূর্যকান্ত বাতায়ন পথে অস্ত্রসজ্জিত মহারাজকে রথারূঢ় দেখে তাঁর অসি নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে রথে এসে উঠলেন। একবারও প্রশ্ন করলেন না, কেন এই অভিযান। মান্ধাতাও কিছু বললেন না। এরপর মহারাজা মন্ত্রী কণাদের গৃহের সম্মুখে রথ থামালেন। কণাদ ছুটে এলেন।

মহারাজ বলেন—মহাগোবিন্দকে পাঠিয়ে দিন। তার ধনুর্বান নিয়ে আসে যেন।

মহাগোবিন্দ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসে রথারোহণ করলে মহারাজ উভয়কে আনুপূর্বিক সব ঘটনা বললেন। রথ দ্রুত ছুটল বরাহ পর্বতের দিকে।

মহাগোবিন্দ সহসা প্রশ্ন করে বসে—হস্তীকে হত্যা করতে হবে?

—ওরা যদি গোধূম ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করতে চায় নিশ্চয় হত্যা করতে

হবে।

—মহারাজ, পিতা বলেন আপনি সাধারণত হত্যাবিরোধী।

—তিনি যথার্থ বলেছেন। অযথা আমি প্রাণী বধ চাই না। কিন্তু কারণ ঘটলে আমি কাউকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে বলি না। তখন হত্যা করা কর্তব্য। আমরা আর্যরা সুদূর পশ্চিম থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছি। আমাদের ওপর যদি কোন আর্যেতর জাতি আক্রমণ করে তবে তাদেরও বধ করতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হত্যা অনেক সময় অনিবার্য। তাছাড়া মহাগোবিন্দ, তুমি তো জান আমরা কেউই নিরামিষাশী নই। দুগ্ধ মধু ও মাংস ব্যতীত আমাদের শরীর কি করে রক্ষা পাবে? বন্যপ্রাণী না পেলে আমরা গৃহপালিত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করি। সেইজন্য কিছু নিরীহ পশুকে গৃহে পালন করা হয়। গো-হত্যা আমি নিষেধ করেছি। কারণ তাতে গোদুগ্ধ অপ্রতুল হয়ে পড়তে পারে।

মহাগোবিন্দ বলে—আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার গুরুগৃহ বলতে ছিল একটি সুবৃহৎ পর্বতকন্দর। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হলকর্ষণ হত না। ওখানে আমরা বন্যপ্রাণী না পেলে গোমাংস ও ফলমূল আহার করে জীবন ধারণ করেছি। তাই আপনি প্রাণীহত্যাবিরোধী জেনে দ্বিধায় ছিলাম। শৈশবে আমি যখন ধনুর্বাণ নিয়ে পক্ষী বধ করতাম তখন আমার চেয়েও বয়সে ছোট এক বালিকা আমাকে হত্যা করতে নিষেধ করত। আপনার মত সেও ব্যথিত হত।

মহারাজা কৌতুক বোধ করেন—তাকে চেন তুমি?

—না, তখন চিনতাম। এখন মনে নেই। তবে তার কুটিরের কথা মনে আছে।

মহারাজ মৃদু হেসে বলেন—তপস্বী কঙ্কের কন্যা সে। কদিন আগে সে একটি হরিণশাবক নিয়ে আসে কুটিরে। কুটিরের উদ্যানে আর বাইরে সেটি ছোটাছুটি করে। দেখো সেটিকে বধ করে ফেলো না।

—না না। বিনা কারণে আমিও প্রাণীহত্যা করি না।

বরাহ পর্বতের সানুদেশে সেই আক্রান্ত গোধূম ক্ষেত্রের পার্শ্বে মহারাজা মান্ধাতা সদলে এসে উপস্থিত হলেন। হস্তীদ্বয় তখনো ক্ষেতের মধ্যে বিচরণ করছে। মহারাজা তাদের বধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

মহাগোবিন্দ বলে—মহারাজ, ওদের বধ না করেও গোধূম ক্ষেত্র থেকে বাইরে নিয়ে আসা যেতে পারে।

মহারাজা ও সূর্যকান্ত বিস্মিত হন। উভয়েই বলে ওঠেন—কিভাবে?

—মহারাজ আমাকে ওই উচ্চস্থানটিতে যাবার অনুমতি দিন। ওই পিপ্পলী বৃক্ষের নীচে।

—পদব্রজে গেলে সময় লাগবে। আমার রথে চল।

তাঁরা সেই বৃক্ষটির নীচে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে কিছুটা নীচে সেই গোধূম ক্ষেত্রে বিচরণশীল হস্তীদ্বয় ক্ষুদ্রাকার দেখায়।

মহাগোবিন্দ তখন মহারাজ ও সেনাপতিকে চমকিত করে মুখে হাত রেখে অদ্ভুতভাবে হস্তীর বৃংহন অনুকরণ করল। একবার, দুবার, তিনবার। দূর থেকে সেই বন্যপশু দুটি ঘাড় ফিরিয়ে পিপ্পলী বৃক্ষের দিকে তাকাল। তারপর হন্তদন্ত হয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

সূর্যকান্ত স্তব্ধ। মহারাজ মান্ধাতা মহাগোবিন্দকে সস্নেহে কাছে টেনে নেন। বলেন—তুমি অতি দুরূহ কাজটি কত সহজে সম্পন্ন করলে। কোথায় শিখলে এই বিদ্যা?

—আমার গুরুর কাছে।

—তিনি এত বড় সিদ্ধপুরুষ, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনি না।

মহাগোবিন্দ নত মস্তকে বলে—মহারাজ, আমার কাছেও তিনি রহস্যময় পুরুষ।

—কোন ছদ্মবেশী দেবতা নন তো?

—আমি সেকথা ভেবেছি।

—এবারে তাঁর সাক্ষাৎ পেলে তাঁর পরিচয় জানার জন্য প্রার্থনা করবে কি?

—তিনি বলেছেন, প্রয়োজন হলে নিজে থেকে পরিচয় দেবেন।

হস্তীদ্বয় পাহাড়ী পথে অন্যদিকে চলে যায়। হলধররা জীবনে এমন কাণ্ড দেখেনি। তারা বুঝে উঠতে পারল না কিছু। ভাবল, পাহাড়ের কোল থেকে সত্যি কোন হস্তী ডাকছিল।

মহারাজ বলেন—আমার কত হস্তী আছে। তাদের শিক্ষা দিয়ে যেমন বৃক্ষকাণ্ড স্থানান্তরিত করা হয়, তেমনি চেষ্টা করলে বন্য হস্তীদের তাড়না করা যায়।

মহাগোবিন্দ বলে—আপনার অনুমান যথার্থ মহারাজা।

সূর্যকান্ত বলেন—হস্তী অতি উপকারী প্রাণী। অবশ্য মত্ত হলে অসুবিধা। আজ এই দুটিকে বধ না করে বিতাড়িত করতে পারায় আমি খুব তৃপ্তি পাচ্ছি।

মহারাজ বলেন—ঠিক বলেছেন সেনাপতি।

গিরিব্রজবাসী প্রত্যেকে শুনল মহাগোবিন্দের কীর্তিকথা। বাসবী এবং

আর্দ্রাও শুনল। তারা উভয়েই ভাবে মহাগোবিন্দ সম্বন্ধে কিছু কর্ণগোচর হলে দেহ মনে এত দোলা লাগে কেন? বাসবী প্রাসাদোদ্যানে ময়ূরের নিকটে গিয়ে একটির গ্রীবাদেশ দু হাতে বেষ্টন করে। আর্দ্রা তার হরিণশিশুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

মহারাজা মান্ধাতা পরদিন প্রত্যূষে একাকী চললেন ঋষিগিরি পর্বতে তপস্বী কঙ্ক সমীপে।

কঙ্ক সারারাত ধ্যানমগ্ন ছিলেন। মহারাজ প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হন গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন গুহাদ্বারে। অবশেষে দ্বিধা কাটিয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর অদূরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বহুক্ষণ কেটে গেল, কঙ্কের দেহ নিশ্চল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের উত্থানপতনও দৃশ্যমান নয়।

অবশেষে একসময় তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়। অদূরে মহারাজকে অপেক্ষারত দেখে স্মিত হেসে তিনি প্রশ্ন করেন—কতক্ষণ?

কি আর উত্তর দেবেন মহারাজা। মৃদু হাসেন শুধু।

—একা মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। কয়েকটি ঘটনা জানাতে এসেছি। একটি বিষয়ে অনুমতি নিতে এসেছি।

—বলুন।

—আপনার কথামত আমি আমার উত্তরাধিকারীর সন্ধান পেয়েছি।

—কণাদ পুত্র?

মহারাজা আশ্চর্যান্বিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়, ইনি যোগী। এঁর সঙ্গে দেবতাদের কতটুকু বা পার্থক্য। ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু এঁদের নখদর্পণে।

—আপনি যথার্থ বলেছেন।

—হ্যাঁ। সে আপনার অতীব যোগ্য উত্তরাধিকারী। ঠিক যৌবনে আপনি যেমন ছিলেন, তেমন।

—আমার মনে হয়, আমার চেয়েও মহাগোবিন্দ অধিকতর যোগ্য।

—ছেলেটির নাম মহাগোবিন্দ। সুন্দর নাম। না, আপনার চেয়ে যোগ্য, একথা আমি বলতে পারি না। আপনার নিজের যে সমুদয় গুণ রয়েছে, আপনি তা প্রকাশ করেন না। অন্যে না জানলেও আমি জানি।

মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন—আমি প্রৌঢ় হয়েছি। মহাগোবিন্দের

রাজ্যাভিষেকের পরে বাণপ্রস্থে যেতে চাই। সুতরাং যত শীঘ্র তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান করা যায় ততই ভাল। আমি মুক্তি পেতে পারি।

—রাণী ব্যতীত রাজ্যাভিষেক তো পূর্ণ হয় না। কণাদ পুত্রের দার পরিগ্রহের আশু প্রয়োজন।

—সেই বিষয়ে আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

এরপর দুজনে কিছুক্ষণ গভীর আলোচনায় রত হলেন। শেষে তপস্বীকে প্রণাম করে মহারাজ পর্বতগাত্র থেকে অবতরণ করে রথের সমীপবর্তী হলেন। তাঁর মন প্রশান্ত। তিনি যেন সুখসাগরে নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন।

সেইদিন অপরাহ্ণে নগরীতে প্রত্যাবর্তনের পর মহারাজা ঘোষণা করলেন, পরদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে অধিবেশন বসবে। তাতে প্রতিটি নগরবাসীকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালেন তিনি। শুধু সৈন্য বিভাগের একটি অংশ নগরীর প্রহরায় ব্যাপৃত থাকবে সেই সময়।

ঘোষণা মত পরদিন নগরবাসীর সমাবেশ ঘটল ওই প্রান্তরে। একদিকে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে মহারাজা ও তাঁর মহিষী সিংহাসনে সমারূঢ়। রাজ-পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেন। আর্দ্রার স্থান হয়েছে বাসবীর পাশে। অদূরে অন্য একটি চন্দ্রাতপের নীচে মন্ত্রী ও মন্ত্রণা পরিষদের অপরাপর সভ্যের স্থান হয়েছে। নগরবাসীর স্থান সম্মুখে। বৃহৎ প্রান্তর পরিপূর্ণ। তাদের মধ্য দিয়ে পর পর সারি সারি ঘোষকবৃন্দ দণ্ডায়মান। যা কিছু বলা হবে বা করা হবে ঘোষকরা পর পর সেগুলি বলে যাবে। একজন থেকে আর একজন। এইভাবে শেষ প্রান্তের মানুষেরাও সব জানতে পারবে।

মহারাজা উঠে দাঁড়াতে নগরবাসীর কোলাহল স্তিমিত হল। নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল সমস্ত প্রান্তরে।

মহারাজা বললেন—গিরিব্রজবাসীগণ, আমি বহুদিন সিংহাসনে বসে আমার সাধ্যমত আপনাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি। সব সময় সব কিছুতে সফল হয়েছি, এমন নয়। আমার অনেক ব্যর্থতা রয়েছে। তবু এটুকু বলতে পারি নিজের বিলাসিতা নিজের আলস্যকে কখনো কোন ভাবে আমি প্রশ্রয় দিইনি। তবে আমি নিজের সম্বন্ধে বললে তো হবে না, আপনাদের অভিমত জানা প্রয়োজন।

সমস্বরে প্রান্তর থেকে চিৎকার ওঠে—আপনি সার্থক ভূপতি। আমরা আপনাকে পেয়ে ভাগ্যবান।

একজন বৃদ্ধ বলে—ধরিত্রীতে আর কোন ভূপতির কথা আমরা জানি না। বোধ হয় নেই।

মন্ত্রীপরিষদ মাথা দুলিয়ে বৃদ্ধের উক্তি সমর্থন করে।

মহারাজ মান্ধাতা বলেন—হয়তো তাই। ঠিক জ্ঞাত নই আমি। অনেক ভূম্যধিকারী পূর্বেও ছিলেন বটে, কিন্তু আপনাদের প্রচেষ্টায় এত বড় রাজ্য সম্ভবত ভূতলে গিরিব্রজ প্রথম।

সেই সময় আদিদেব মহেশ্বরের দৈববাণী শ্রুতিগোচর হয়—হে মান্ধাতা, ধরাতলে তুমিই প্রথম রাজেশ্বর।

সকলে দণ্ডায়মান হয়ে উর্ধ্বাকাশে প্রণাম জানায়। সমাবেশে পুলক-গুঞ্জন শুরু হয়। তারা ভাবে, তারাই প্রথম নাগরিক। মহারাজের তারাই প্রথম প্রজা এই মেদিনীতে।

দৈববাণী অনেকক্ষণ ধরে প্রতিজনের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রান্তরের প্রতিটি শষ্পাগ্রে, বৃক্ষের প্রতিটি পত্রে অনুরণিত হতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই প্রভাব একটু প্রশমিত হলে মহারাজ বলেন—আজ আমি আপনাদের সবাইকে আসতে অনুরোধ করেছি এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি যা বলব আপনাদের সেই বিষয়ে অনুমতি রয়েছে কিনা জানতে চাই।

সবাই উৎকর্ণ।

মহারাজা বলেন—আমার বয়স হয়েছে। বাণপ্রস্থ গ্রহণের সময় এসেছে।

কয়েকজন বলে ওঠে—আপনি ব্যতিত অন্য কাউকে আমরা চাই না। আপনি আমাদের চিরকালের মহারাজা।

মহারাজা বলেন—তা হয় না। সব কিছুতে নীতি মেনে চলতে হয়। তার অন্যথা হওয়া উচিত হয়। পুরাতন সরে গিয়ে নূতনকে পথ করে দেয়। বৃদ্ধ পরলোকে যায়, নূতন শিশুর জন্ম হয়। এই হল বিধাতার নিয়ম। তাই ধরিত্রী চিরশ্যামলা।

একজন বৃদ্ধ জানতে চান—কিন্তু কে আপনার উত্তরাধিকারী ? আপনার পুত্র-সন্তান নেই। অবশ্য পুত্রসন্তান না থাকলেও উপযুক্ত কাউকে নির্বাচিত করা যায়। তেমন ব্যক্তি কে ?

মহারাজা বলেন—তেমন ব্যক্তির সন্ধান কি আপনারা পাননি ?

সবাই উৎসুক হয়ে উঠে—কে সে ? মহারাজা এভাবে বললেন কেন ?

মহারাজা মহাগোবিন্দকে আহ্বান করেন। মহাগোবিন্দের চোখেও বিস্ময়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। মহারাজা তাকে আরও কাছে ডাকেন। নিজের

পাশে দাঁড় করিয়ে তার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করে বলেন—এই সেই উত্তরাধিকারী। একে পছন্দ হয়?

প্রশংসাসূচক শব্দ শোনা যায় চারদিকে। মন্ত্রী কনাদ বিহ্বল।

পূর্বদিনে অনুপস্থিত ছিল এমন একজন বলে ওঠে—সুন্দর চেহারা। স্বাস্থ্যবান। কিন্তু এই তরুণ কোন্ গুণে গুণান্বিত আমাদের জানা নেই।

মহারাজা তখন মহাগোবিন্দের গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। পূর্বদিনে যারা মহাগোবিন্দের পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিল তারা প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠল। মহারাজা সেই সঙ্গে যোজনা করলেন মহাগোবিন্দের হস্তী বিতাড়ণের অদ্ভুত কৌশল।

একজন প্রশ্ন করে—কিন্তু মহারাজা, উনি কি বিবাহিত?

—না।

—তবে তো ওঁর রাজ্যাভিষেক পূর্ণাঙ্গের হবে না।

মহারাজা সহজ কণ্ঠে বলেন—অভিষেকের পূর্বে বিবাহ-পর্ব সমাধা করতে হবে।

একজন বলেন—উপযুক্ত কন্যার সন্ধান করতে হবে। কারণ তিনি হবেন আমাদের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী।

মহারাজ বলেন—আপনি মূল্যবান প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আমি এবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করতে গতকাল তপস্বী কঙ্কের নিকট গিয়েছিলাম।

বাসবী চঞ্চল হয়ে ওঠে একথা শুনে। ভাবে কঙ্কের নিকট পিতা নিশ্চয় তার সঙ্গে মহাগোবিন্দের বিবাহের কথা বলেছেন এবং তপস্বী তাতে সম্মত হয়েছেন।

মহারাজা বলেন—নতুন রাজার মহিষী হবেন কঙ্ক-কন্যা আর্দ্রা।

সবাই স্তম্ভিত। শুধু বাসবী ভাবে, এই তো ভাল হল। আর্দ্রার অনুভূতি কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হয়। কিন্তু সে অচেতন হয়ে পড়ে না। সে সব কিছু দেখতে পায়, শুনতে পায়। সে মহাগোবিন্দকে দেখে—যেন দেবতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সব তার কাছে স্বপ্ন।

মহারাজা বলেন—তবে জানি না, মহাগোবিন্দ এতে সম্মত হবে কিনা।

মহাগোবিন্দ ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে এবং এই মুহূর্তে দেখে ফেলেছে শৈশবে কে তাকে পক্ষী হত্যা থেকে নিবৃত্ত করত। সে বলে—আমি ওকে লাভ করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

হর্ষধ্বনি ওঠে।

মহারাজ তখন বলেন—মহাগোবিন্দের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

একথা শুনে মহাগোবিন্দ মহারাজের পদতলে নতজানু হয়ে বসে বলে—আমাকে এভাবে অপরাধী করবেন না।

—আমার অনুরোধ আমার কন্যা বাসবীকেও তুমি গ্রহণ কর একই সঙ্গে। ওরা দুটিতে এক সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত।

মহারাজের কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে একটু সময় লাগল মহাগোবিন্দের। শেষে বলে—আমি সৌভাগ্যবান।

মহারাজা তখন বলেন—তপস্বী কঙ্ক আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর্দ্রা হবে প্রধানা মহিষী। মহাগোবিন্দের মত বিরাট পুরুষের পক্ষে দুই রানী অধিক শোভনীয় হবে।

সভাস্থল থেকে আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়। সেই ধ্বনি পঞ্চপর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্‌গম্‌ করে।

নাগরিকদের কাছ থেকে দাবি ওঠে নতুন রাজার কর্মপদ্ধতি কেমন হবে সে বিষয়ে তিনি যেন কিছু বলেন।

মান্ধাতার ইঙ্গিতে ভাবী রাজা উঠে দাঁড়ান। তাঁর গাম্ভীর্য তাঁর শ্রীকে সুন্দরতর করে তোলে।

মহাগোবিন্দ বলেন—আমি সর্বপ্রথম এই নগরীকে অপূর্ব করে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। শৈশব থেকে এটাই আমার স্বপ্ন। শুনেছি ব্রহ্মার পুত্র বসু, এই নগরীর পত্তন করেন। আমি তার মর্যাদা রাখব। সেটি সমাধা হলে আমার ইচ্ছা এই নগরী যে দেশের কেন্দ্রবিন্দু, সেই মগধকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই মগধের কত গুণ। আপনারা সঙ্গীতে পারদর্শী, আপনারা ভাস্কর্যে নিপুণ, আপনারা সুযোদ্ধা। অথচ পশ্চিমের আর্যরা আমাদের হেয় জ্ঞান করে। আমি এই কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করব। তবে সবই করব আপনাদের সহায়তায়।

উপস্থিত সকলে ভাবী মহারাজের কথায় সন্তুষ্ট হয়। সভাশেষে সবার চিত্তই আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আনন্দিত তিনটি প্রাণী। কারণ তাদের আনন্দের মধ্যে স্বপ্ন মেশানো রয়েছে। মহাগোবিন্দ, আর্দ্রা আর বাসবী।

রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে বাসবী আর্দ্রাকে নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। আর্দ্রাও বাসবীকে আলিঙ্গন করে।

বাসবী বলে—বাঁচা গেল। আমরা আর কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব না। চিরকালের সখী হয়ে থাকব। উঃ ভাবতেই পারছি না।

এতক্ষণ উপর্যুপরি অবিশ্রান্ত সব ঘটনা আর উত্তেজনায় আর্দ্রার মুখমণ্ডল

রক্তিম। সে বলে—এমন দিন যে আসবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখনো মনে হচ্ছে, বুঝি স্বপ্ন।

একটু স্থির হয়ে বাসবী বলে—কেমন দেখলে তোমার রাজাকে?

—আমার রাজা? তোমার তবে কে?

—আমারও রাজা। কিন্তু তুমি রাজমহিষী। তাই তুমি রাজার দেহের দক্ষিণ দিক দেখাশোনা করবে। আমি ভার নিলাম তাঁর দেহের বাম পার্শ্বের। অত সুন্দর দেহের সযত্ন পরিচর্যার প্রয়োজন। একা কি সম্ভব?

আর্দ্রা বলে—আর মনটা? সেটা কি করে ভাগ করা হবে?

বাসবী কৃত্রিম অভিমানের স্বরে বলে—মন তো তোমাতে কবে থেকে সমর্পিত। ওতে আর ভাগ বসাতে চাই না।

দুজনে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে।

বিবাহের দিন সমাগত হল।

নগরী উৎসবমুখর। শুধু গিরিব্রজ নয়, মগধের দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম ঘটল তাদের ভাবী মহারাজের পরিণয় ও রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে।

রাজপুরীতে দুই কন্যাকে লোধ্র রেণু ইত্যাদি নানাবিধ কুসুম কিঞ্জল দ্বারা সজ্জিত করা হল। আরও বহুবিধ বিচিত্র অঙ্গরাগ ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির দ্বারা অঙ্গসজ্জা করায় রূপবতী কন্যাদ্বয়কে স্বর্গের দেবীতুল্য প্রতীয়মান হতে লাগল। এই রূপ কোনমতে দেখে ফেললে ইন্দ্রাণীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হবে এই আশঙ্কায় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ভার্যাকে নিয়ে চললেন, ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণে।

মহাগোবিন্দ জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি অশ্বারোহণে বিবাহ বাসরে এসে উপস্থিত হবেন। মান্ধাতা ভেবেছিলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রথযানটি মহাগোবিন্দের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করবেন। কিন্তু তার প্রয়োজন হল না। মহারাজা মান্ধাতার জানা ছিল না মহাগোবিন্দের ভিন্ন মনোভাবের কথা। অশ্বকে তিনি অধিক প্রাধান্য দিতে চান। গো-মেধ যজ্ঞ মহারাজ মান্ধাতার উদ্যোগে অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে অশ্বমেধ যজ্ঞ তেমনভাবে প্রচলিত হয়নি। মহাগোবিন্দের অভীপ্সা অশ্বকে খুব প্রাধান্য দেওয়া এবং ভালভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচলন করা। সেই সঙ্গে মগধের আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সেখানকার অধিবাসীদের অগ্নিপূজায় অভ্যস্ত করে তোলা। ব্রাত্য ও যাযাবরদের সভ্য করে তুলে তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে।

অশ্বারূঢ় মহাগোবিন্দ রাজপুরীতে এসে পৌছলেন। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অনেকখানি স্থানে বিরাটাকার যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত। অগ্নিদেবতা ও তাঁর পত্নী স্বাহার উপস্থিতিতে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হবে।

কন্যাদ্বয়কে আনয়ন করা হল। কঙ্ক পিতা হলেও কন্যা সম্প্রদান করবেন না। তিনি গৃহী নন। তাই তিনি আসেন নি। তাছাড়া আর্দ্রার পালনকর্তা মহারাজ মান্ধাতা। তিনি পিতৃবৎ। তিনি নানা নিয়মনিষ্ঠার মাধ্যমে উভয় কন্যাকে মহাগোবিন্দের হস্তে সমর্পণ করলেন। বললেন, জীবনে মরণে এবং পরজন্মে তোমাদের এই বন্ধন অচ্ছেদ্য হোক। স্বস্ত্রীক বৈশ্বানর এই শুভক্ষণের সাক্ষী।

পুরবালাগণের শঙ্খধ্বনিতে চতুর্দিক ধ্বনিত হল। প্রজ্বলিত হুতাশন হতে এক দিব্য মূর্তি উত্থিত হয়ে কন্যাদ্বয় ও মহাগোবিন্দকে আশীর্বাদ করে অগ্নিশিখার সঙ্গে বিলীন হয়ে গেলেন।

মান্ধাতা বললেন—বৈশ্বানর পূজা গ্রহণ করলেন। মহাগোবিন্দ এই অগ্নিতে কি তোমার কিছু আহুতি দেবার অভিপ্রায় ছিল?

মহাগোবিন্দ অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে বলেন—এই অগ্নিতে আমাদের তিনজনের যতটুকু কল্মশ ছিল সব আহুতি দিলাম। আমরা নূতন করে জীবন শুরু করব আজ থেকে।

সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি ভাবী মহারাজের দিকে। মন্ত্রী কনাদের বক্ষ পরিপূর্ণ হল পুত্রের উক্তিতে।

একজন বৃদ্ধ সহসা বলে ওঠে—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে তাতে পশু উৎসর্গ না করলে দেবতা অভুক্ত থেকে যান।

মহারাজা বিচলিত হন। মহাগোবিন্দের চিত্তেও দ্বিধার দোলা। তপস্বী কঙ্ক উপস্থিত নেই। থাকলে একটা সমাধান বলে দিতেন।

বৃদ্ধ বলে—আমি দেখেছি সকলের আহারের জন্য ভাণ্ড ভাণ্ড মধু আনা হয়েছে, মিষ্টান্নের আয়োজন হয়েছে, গোধূম পিষ্টক প্রস্তুত করা হয়েছে। ক্ষীর দধি ননী আরও অনেক কিছুর আয়োজন আছে। কিন্তু অগ্নিদেবতার সেবার জন্য চাই পশু—অশ্ব অথবা বরাহ যাই হোক না কেন। কারণ এই সব দ্রব্যে দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে না। আর অগ্নি দেবতার ক্ষুধার পরিপূর্ণ নিবৃত্তি যে দ্রব্যে না হয় সেইসব দ্রব্য সাধারণ মানুষের বলবৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে না কখনো। তাতে সুখাদ্য খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মিটতে পারে একদিনের জন্য।

মহারাজ মান্ধাতা, কনাদ, মহাগোবিন্দ এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে নিলেন। পরে তিনি বৃদ্ধকে বললেন—আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ।

আপনি যথার্থ বলেছেন। আপনার এই মহামূল্যবান উপদেশ সকলে শুনেছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পশু উৎসর্গ আগেও হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে এই রাজ্যে সেটি অবশ্য পালনীয়। কিন্তু তাই বলে রাজ্যে যেন অনর্থক প্রাণী হত্যার প্রবণতা না বৃদ্ধি পায়।

বৃদ্ধ বলে—মহারাজ মৃগয়ায় গিয়ে প্রাণীহত্যা কি অনর্থক।

—না। কারণ মৃগয়া আমাদের জীবনধারণের একটি অঙ্গ। মৃগয়ায় না গেলে আমাদের শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়। মৃগয়া আমাদের সাহসী করে তোলে, আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্নতর করে, আমাদের কৌশলী করে, দেহ সুগঠিত করে, গতিকে ক্ষিপ্র করে। সুতরাং তখন পশুবধ কখনো অনর্থক নয়। খাদ্যের জন্য আমাদের প্রতিদিন কত প্রাণীকে হত্যা করতে হয়। নইলে আমরা বাঁচতে পরি না।

বৃদ্ধ বলে—মহারাজ বিজ্ঞ। তাঁর অজানা কিছু নেই।

যজ্ঞে পশু উৎসর্গ করার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সেই রাতে প্রাসাদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি কক্ষে দুই রানীর সহিত মহাগোবিন্দের প্রথম নির্জন সাক্ষাৎ। বাতায়ন উন্মুক্ত। পুষ্প সৌরভ বাহিত মৃদু সমীরণ কক্ষে প্রবেশ করছে। চন্দ্রস্নাতা রজনী। জ্যোৎস্নার আলোয় কক্ষ আলোকিত।

মহাগোবিন্দ দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বলেন—আমার কর্তব্য কি? আমি দ্বিধাগ্রস্ত।

আর্দ্রা সঙ্কুচিত হয়। বাসবী বলে ওঠে—আর্যপুত্র, অনুমতি দিলে আমি বলে দিতে পারি।

চমকিত মহাগোবিন্দ বলেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—আর্দ্রাকে আপনি আগে থেকে চিনতেন।

—হ্যাঁ। প্রথমে বুঝিনি, পরে বুঝে ফেলেছিলাম। দেখলাম, কী পরিবর্তন। তখন ছিল ক্ষুদ্র মিষ্টি বালিকা। আর আজ—

বাসবী বলে—আজ সে আরও মিষ্টি। স্বাদ গ্রহণের সময় আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আর্যপুত্র।

আর্দ্রা বিস্মিত লোচনে চায় বাসবীর দিকে। এসব কি বলছে সে? মহাগোবিন্দ অবধি বিচলিত।

বাসবী বলে—আর্যপুত্র, অপরাধ নেবেন না। আমাদের সম্পর্ক তো শুধু এই জনমের নয়। আমাদের সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের। আমাদের মধ্যে গোপন বলে

কি কিছু থাকতে পারে ?

মহাগোবিন্দ প্রীত হয়ে বলেন—না বাসবী, কখনো নয়।

—আর্দ্রা আপনার প্রধানা মহিষী। আমাদের প্রতি আপনার প্রতিদিনের আচরণ আর্দ্রাই নির্ধারণ করে দেবে। সে আমার প্রিয় সখীও।

—সুন্দর কথা বলেছ তুমি। কিন্তু আর্দ্রা নীরব কেন ?

আর্দ্রা তখন সুমিষ্ট হাসি হেসে বলে—আর্যপুত্র আমি ভাবছিলাম, আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে কত উপদেশ দিয়েছি পক্ষী হত্যা না করার জন্য। ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলাম। তারপর বাসবীর কথায় আমি বুঝলাম, সত্যই তো, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পূর্বের কত জন্ম থেকে রয়েছে, পরবর্তী কত জন্ম এক হয়ে থাকব কে জানে। আর্যপুত্র, আপনাকে পেয়ে আমরা দুজনেই নিজেদের পরম সৌভাগ্যবতী বলে মনে করছি।

—আমি তোমাদের পেয়ে ধরিত্রীর সব চেয়ে সৌভাগ্যবান পুরুষ। তোমাদের প্রেম আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করবে। তোমাদের অনুপ্রেরণা আমাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে।

মহাগোবিন্দের রাজ্যাভিষেকও মহা ধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হল। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে দুই রাণীকে নিয়ে উপবিষ্ট হলেন। এবারে কঙ্ক নিজে এসেছেন কয়েকদিনের জন্য ঋষিগিরি পর্বতগুহা পরিত্যাগ করে। তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। স্বর্গলোকে সেই মন্ত্রোচ্চারণ-ধ্বনি গিয়ে পৌঁছল। দেবতারা সচেতন হলেন। তাঁরা স্বর্গোদ্যান থেকে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে অসংখ্য পারিজাত পুষ্প চয়ন করে তার পাপড়ি বর্ষণ করতে লাগলেন রাজা ও দুই রাণীর মস্তকে এবং সভাস্থলে। স্বর্গীয় সুবাসে আমোদিত হয়ে উঠল অভিষেক স্থল। সুঘ্রাণে ভরপুর প্রতিটি গিরিব্রজবাসীর মন ও দেহ এক অপার্থিব পুলকে রোমাঞ্চিত হতে থাকল।

ইন্দ্রপুরীতে তখন শচীদেবী উপস্থিত ছিলেন। এবারে ইন্দ্র তাঁকে নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণে বের হয় নি। সহসা পারিজাত পুষ্পের সৌরভ এসে তাঁর কক্ষ পরিপূর্ণ করে তোলে। এই অসময়ে এত সুগন্ধ ? নিশ্চয় অনেক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে। পুষ্প চয়নের সাধ হয় শচীদেবীর। স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করে ইন্দ্রাণী দূর থেকে দেবতাগণের পুষ্পবর্ষণ লক্ষ্য করে কৌতূহলান্বিত হয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন। ওভাবে নির্বিচারে পারিজাত পুষ্পের অপচয় তাঁকে ব্যথিত করে তোলে।

ওদিকে দেবরাজ ইন্দ্র সহসা তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকে অমরাবতীতে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে স্বর্গোদ্যানের দিকে ধাবিত হন। পথিমধ্যে নারদমুনি এসে তাঁকে চুপি চুপি বলেন,—রাণীকে এই মুহূর্তে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। মর্ত্যে আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় অধীশ্বরের রাজ্যাভিষেক। রাজার পার্শ্বে শোভা পাচ্ছেন তাঁর দুই অনিন্দ্যসুন্দরী রাণী। তাঁদের অসামান্য রূপ দেখে ইন্দ্রাণীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হবে।

ইন্দ্র একথা জানতেন। তাই মহাগোবিন্দের বিবাহের সময় তিনি ইন্দ্রাণীকে অন্যভাবে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আজ অতটা গুরুত্ব দেননি। নারদ মুনির সাবধানবাণী একটু দেরিতে উচ্চারিত হয়েছিল। কারণ ইন্দ্র তাঁর মহিষীর নিকট উপস্থিত হবার পূর্বেই ইন্দ্রজায়া দেবতাদের নিকট পৌঁছে গেলেন এবং তাঁদের দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্য সব কিছু উপেক্ষা করে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন আদ্রা এবং বাসবী, বাসবী এবং আর্দ্রার দিকে।

ইন্দ্রদেব সেই সময় পশ্চাৎ থেকে এসে মহিষীর পৃষ্ঠে সপ্রেম হস্ত স্থাপন করেন। অতি পরিচিত এই স্পর্শ ইন্দ্রাণীকে আরও উতলা করে তুলল। তাঁর নয়ন সজল হয়ে উঠল। দেবতারা তাই দেখে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করেন মহারাজের সম্মান রক্ষার্থে। নিরালা স্বর্গোদ্যানে রাণী তখন স্বামীর বক্ষলগ্না হয়ে অঝোরে অশ্রুপাত করতে থাকেন। আর্দ্রা ও বাসবীর রূপ দেখে দেবরাজ নিজেই তখন আত্মবিস্মৃত। ভাবেন, ধরিত্রীর এই দুই শ্রেষ্ঠা রমণীর রূপে দেবতারাও প্রলুব্ধ হবে। সুতরাং ইন্দ্রাণীর এই অশ্রুপাত অকারণ নয়। তবু সান্ত্বনা দিতে হবে জায়াকে। নইলে স্বর্গরাজ্য অন্ধকার হয়ে উঠবে। স্বর্গে তো দুঃখ কান্নার স্থান নেই। এখানে চিরআনন্দ, চিরযৌবন বিরাজ করছে। মর্ত্য এমনই একটি স্থান যেদিকে দৃষ্টিপাত করলে সেখানকার দুঃখকষ্ট এখানে ধেয়ে এসে সংক্রামিত হতে চায়। এটি কাম্য নয়।

দেবরাজ একটি বৃহদাকার স্ফটিকের ওপর উপবেশন করে ইন্দ্রাণীকে স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করেন। পত্নীর অপূর্ব বদন দু হাতে উত্তোলন করে বলেন—পৃথিবী তো নগণ্য, স্বর্গের দেবকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমি। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ, প্রেমে নিমজ্জিত। মর্ত্যের ওই দুই রমণী একটি দিনের পুষ্পের মত ফুটে উঠে সন্ধ্যায় ঝরে পড়ে যাবে। কতটুকু আর আয়ু ওদের? আর তুমি পারিজাতের মত অক্ষয়। ওদের রূপ দেখে ঈর্ষা করা তোমার শোভা পায় না প্রিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখবে ওরা লোলচর্মাবৃতা কুৎসিত দুই বৃদ্ধায় পরিণত হয়েছে। কিংবা দেখবে ওরা গতায়ু। আর তুমি প্রিয়তমে? তোমার

রূপ দেখে আমার তৃষ্ণা মেটে না, মিটবে না। তুমি চিরন্তনী।

ইন্দ্রদেব তাঁর নয়নদ্বয়ের ভেতরে এমন এক আকুতি ফুটিয়ে তুললেন যে মহিষীর সমস্ত ঈর্ষা সমস্ত শোক অন্তর্হিত হল। তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। দেবরাজ তখন ভাবেন, অথচ মর্ত্যের কোন নারীর প্রতি আমিও একদিন নাকি প্রলুব্ধ হব। এটা শুনি বিধিলিপি। ব্রহ্মা নিজে বলেছেন। আজ ওই দুই রমণীকে দেখে ইন্দ্রাণীকে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলেছিলাম একথা তো অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং বিধাতার লিখন খুব ইঙ্গিতবহ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলতে হবে, তিনি পুরুষ ও নারীর মুখের অভিব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু দিয়েছেন যে সেই মুখের আপাত সারল্যে পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। হৃদয়ের নিভৃতে প্রবেশ করে মনের প্রকৃত বাসনা জেনে নিতে পারে না।

—চল প্রাণবল্লভা, তোমার বিহনে অমরাবতী শূন্য। পুত্র জয়ন্ত তোমাকে না দেখে হয়ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

স্বামী গর্বে গর্বিতা ইন্দ্রজায়া স্বর্গোদ্যান ত্যাগ করে অমরাবতীর অঙ্গনে প্রবেশ করেন অমর্ত্য-রাজের সঙ্গে।

মর্ত্যে অভিষেক মঞ্চের ওপর দণ্ডায়মান তপস্বী কঙ্ক নিমীলিত চক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে স্বর্গের এই ক্ষণিক-নাটিকা অবলোকন করেন। তাঁর মুখমণ্ডল মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অগ্নিদেব পত্নী স্বাহাকে সেই হাসি দেখালেন। তাঁরাও জানেন, ইন্দ্রদেব স্তোকবাক্যে ভুলিয়েছেন ইন্দ্রাণীকে। কারণ আর্দ্রা ও বাসবী কেউই স্বল্পায়ু হবে না। বিগত-যৌবনা তারা হবে না কখনো। তবে শত হলেও তারা মানবী। মৃত্যু তাদের অবশ্য আসবে একদিন। আর্দ্রার মৃত্যু হবে মহাগোবিন্দের মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে। আর বাসবীও স্বামী-হারা অবস্থায় বেশী দিন ধরাতলে থাকবে না।

রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীর প্রথম অধীশ্বর মান্ধাতার রাজত্বকাল শেষ হল। গিরিব্রজবাসী এবং মগধের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী, যারা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল, এই সুখের দিনেও তাদের অন্তর বিচ্ছেদ-বেদনায় আর্ত। কারণ তাদের এতদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গী, বিপদের আশ্রয়স্থল, মহারাজা মান্ধাতা আগামীকল্য প্রত্যূষে সস্ত্রীক বাণপ্রস্থের পথে যাত্রা করবেন। তপস্বী কঙ্ক কিছুটা পথ তাদের সহযাত্রী হবেন। প্রতিটি নগরবাসীর প্রাণের ভেতর হাহুতাশ। গিরিব্রজ নগরী আজ অনিদ্র রজনী অতিবাহিত করবে। প্রাসাদেও সেই একই চিত্র। নতুন অধীশ্বর মহাগোবিন্দ বিমর্ষ। তাঁর পিতা কনাদ আজ প্রাসাদেই রয়েছেন। পরদিন তাঁর এতদিনের

প্রভুকে বিদায় দিয়ে তিনি নিজ আলয়ে ফিরে যাবেন। পুত্রের মন্ত্রণাদাতা হয়ে তিনি থাকবেন না। তিনি অভিষেকের পর থেকে মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। ওদিকে বাসবীর অশ্রু অবিরল ঝরছে। সে যেন নিশাবসানে নবার্ক উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃমাতৃহীন হয়ে পড়বে। আর্দ্রা বাসবীর অশ্রু দেখে দুঃখাভিভূত। শুধু অম্লান হাসি ফুটে রয়েছে রাজা মান্ধাতা ও তাঁর মহিষীর মুখে। তাঁরা ঘুরে ঘুরে সকলকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এ তো বিচ্ছেদ নয়—এটাই স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক তাকে মেনে নিতে হয়। তার জন্য মনকে ক্ষতবিক্ষত করতে নেই। এটা প্রকৃতির নিয়ম। তেমনি দেহ যখন অতি জীর্ণ হয়ে পড়ে সেই দেহকে তখন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়। এতে দুঃখের কি আছে?

বাসবীর নিকটে এসে তাঁরা বলেন—এ আমাদের চিরবিদায় নয়। আমরা থাকব ওই বৃষভ পর্বতের ওপাশের অরণ্যে। মন যদি তেমন উতলা হয়, চলে যেও, আর্দ্রা যেমন যায় তার পিতার কাছে।

—এই বয়সে তোমাদের কত কষ্ট হবে।

মান্ধাতা বলেন—কষ্ট হবে, আর তাতেই আনন্দ। সেই কষ্ট আমাদের সম্মুখে স্বর্গোদ্বার উন্মোচন করে দেবে। এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে। তবু দুজন কিঙ্কর আমাদের সঙ্গে যাবে। থাকবে কিছুদিন। গোদুগ্ধ দোহনের কৌশল তোমার মায়ের আয়ত্তে থাকলেও, আমাকে আয়ত্ত করতে হবে।

বাসবী বলে—আর কাষ্ঠ ছেদন?

—সব কিছুতে একে একে অভ্যস্ত হয়ে যাব বাসবী। একটুও চিন্তা কর না।

বাসবীর চিন্তা যায় না। তবে মাতাপিতার উৎসাহ দেখে সে সান্ত্বনা পায়। তাঁরা দুজনে যেন ঠিক নব-বিবাহিত দম্পতি। নতুন সংসার জীবন শুরু করতে চলেছেন। মহা উৎসাহ তাঁদের মনে। এতদিনের জঞ্জাল দু হাতে ঠেলে দিয়ে চলে যেতে পারলে যেন তাঁরা শান্তি পাবেন।

পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা শুরু হল। শত অনুরোধেও মান্ধাতা রথারূঢ় হতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, তিনি এখন আর মহারাজা নন, সাধারণ মানুষ। আজ তিনি বনবাসী হতে চলেছেন। বিনীতভাবে সেখানে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়।

গিরিব্রজ নগরীর শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তিরা ব্যতীত প্রতিটি মানুষ নগরীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত মহারাজের সঙ্গে এল বিদায়ের ক্ষণে শেষ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়।

সবার চক্ষু অশ্রুসজল। অনেকে ভূমিতে লুণ্ঠিত অবস্থায় ক্রন্দনরত।

মান্ধাতা মহারাজ মহাগোবিন্দের মস্তকে হস্ত স্থাপন করে বলেন—তুমি সার্থক অধীশ্বর হও। মনে রেখ তোমার রাজ্যের প্রতিটি মানুষ তোমার প্রভু। নগরীকে তুমি অতুলনীয় করে তুলবে বলেছিলে। এবারে বাসনা পূর্ণ কর। দেশের পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হও। সেই ভূখণ্ড গভীর অরণ্যে সমাবৃত। তুমি সেই সব অঞ্চল বাসোপযোগী করে তোল। তুমি বলেছিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচলনে গুরুত্ব দেবে। বেশ, তাই দাও। অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে যাও অজানা প্রান্তে। যেখানে থামবে সেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে। ভাববে ততটুকু তোমার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হল। এখন থেকে অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজ্যবিস্তারের প্রতীক বলে গণ্য হোক।

মহাগোবিন্দ নত মস্তকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে মান্ধাতার সকল উপদেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

তারপরই মান্ধাতা মহিষীকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যান। একবারও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করেন না। দুজন কিঙ্কর সবৎস এক গাভীকে নিয়ে তাঁদের পশ্চাতে চলতে থাকে। মান্ধাতার মস্তকে মুকুট নেই। তাঁদের উভয়ের পরিধানে বনবাসীর পরিধেয় বল্কল। একবার যদি তিনি ফিরে তাকাতেন দেখতেন তাঁদের প্রিয় কন্যা বাসবীর সঙ্গে আরও বহু গিরিব্রজবাসী ভূলুণ্ঠিত। তাই দেখে কঙ্ক একটু দাঁড়ান। সবাইকে সুমিষ্ট বাক্যে শান্ত করে এগিয়ে যান মান্ধাতার সহযাত্রী হবার জন্য। চলতে চলতে তিনি তাঁদের দুজনকে বাণপ্রস্থ জীবনের আচরণ বিধি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁরা অনভিজ্ঞ। তিনি তাঁদের বললেন যে পর্বতের গুহায় বসবাস না করে দুই কিঙ্করের সহায়তায় পর্বতের নীচে বনভূমির প্রান্তে কুটির নির্মাণ করে নিতে। বৃষভ পর্বতের পরে অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র অপর একটি পর্বত-সদৃশ উচ্চস্থানে মান্ধাতার বনবাসের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু উচ্চভূমিতে বাস করে প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজের জন্য নিয়ে অবতরণ করা অন্তত মহিষীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে নীচে থাকা সমীচীন। মহারাজা কঙ্কের যাবতীয় পরামর্শ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে শুনলেন।

গিরিব্রজবাসীরা দেখতে পেল, একসময়ে মান্ধাতা মহিষী ও কঙ্ক একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর তাঁদের দেখতে পাওয়া গেল না। সবাই জানে এর পরে আর দেখা পাওয়া যাবে না। মহাগোবিন্দ দুই রাণীকে নিয়ে সবার সঙ্গে ফিরতে থাকেন নগরীর দিকে। আজ তাঁর রথ নেই অশ্ব নেই, অন্য কোন শকট নেই। আজকের দিনটি ভূতপূর্ব মহারাজ মান্ধাতার প্রতি

উৎসর্গীকৃত। আজ মগধবাসী গিরিব্রজবাসী সবাই একাত্ম। সবার চিন্তাধারা এক, দুঃখ এক। আজ তারা ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ চিন্তার উর্ধ্বে।

এইভাবে সমাপ্ত হল পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন অধীশ্বর মান্ধাতার আমল। এরপর মহারাজ মহাগোবিন্দের রাজ্যশাসন, বিশেষ করে তাঁর দুই অনিন্দ্যসুন্দরী ভার্যার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন কিভাবে অতিবাহিত হতে লাগল, সে বিষয়ে আমাদের মনে তীব্র কৌতূহল থাকলেও তাকে নিবৃত্ত করতে হবে। কারণ সেই যুগ অতিক্রম করে আমাদের চলে আসতে হচ্ছে আরও অনেক পরের যুগে। স্থান সেই একই অদ্বিতীয় গিরিব্রজ নগরী হলেও কাল ও পাত্র একেবারে ভিন্ন। মহাগোবিন্দের রাজত্বকালে গিরিব্রজ নগরীকে সজ্জিত করে তোলার সূচনা। তাঁর সময়ে মগধরাজ্য আরও অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অনেক অহল্যা বনভূমিকে হল্য করেছিলেন মহাগোবিন্দ এবং তাঁর পরবর্তী রাজন্যবর্গ। কিন্তু বহু বৎসর পরে এবারে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখনও গিরিব্রজ নগরী এই বিশাল ভারতভূমির সমৃদ্ধতম নগরী। আর মগধ তখন শক্তি ও পরাক্রমে এদেশের অন্য সমস্ত রাজ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের আর্যদের মনোভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এখনো তারা অপেক্ষাকৃত পূর্বদিকের আর্যদের হেয় চক্ষে দেখে। এখন দলবদ্ধ হয়ে তারা মগধের অনিষ্ট চিন্তা করে, তার ক্ষতিসাধনে সতত নিরত থাকে।

জরাসন্ধের কলম

কুমদল শোভিত ছায়াসুশীতল গিরিব্রজ নগরী ধরণীতে অতুলনীয়। পঞ্চ পর্বত এই নগরীর চতুর্দিকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দণ্ডায়মান। যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। চিরহরিৎ এই পুরীর অসংখ্য সুরম্য হর্ম্য অমরাবতীকে লজ্জা দেয়। তাই অন্যের ঈর্ষা দৃষ্টি এখানে অহরহ নিক্ষিপ্ত হয়। পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের নৃপতিগণ মগধরাজ্য ও তার রাজধানী গিরিব্রজ নগরীর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে কখনও কখনও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মগধের ভূপতিগণ সচরাচর শক্তিশালী হন। তাই উত্তরভাগের ক্ষিতিপগণ অধিকাংশ সময় তাদের ক্রোধ হিংসা সংযত করে রাখে। প্রতিটি মুহূর্ত তারা দুর্বলতার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুপ্রাচীনকাল থেকে তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা তারাই প্রকৃত আর্য। এরা ব্রাত্য। এদের ধনবান হতে নেই, জ্ঞানবান হতে নেই, বলবান তো কখনই নয়। এদের মাথা নত করে থাকা উচিত। কারণ এরা বসবাস করে ভারত ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চলে। তাই উত্তর ও পশ্চিমের ওরা মগধের দুর্বলতার সুযোগ খোঁজে। সেই রকম এক সুযোগে বিচিত্রবীর্যের পুত্র মহারাজ পাণ্ডু এক অপেক্ষাকৃত দুর্বল মগধের রাজা দীর্গকে আক্রমণ করেন এবং রাজধানী গিরিব্রজতেই তাঁকে হত্যা করেন। পাণ্ডুর অজুহাত ছিল রাজা দীর্গ নাকি ক্ষমতায় মত্ত হয়ে উত্তর ভারতের নৃপতিবর্গকে হেয় জ্ঞান করতেন। কিন্তু এমন দুর্দিন সব রাজ্যেরই আসতে পারে। দীর্গের রাজত্বকালে মগধেরও এসেছিল। তারপর সেই দুর্দিন কেটে গেলে আবার মগধ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে। আবার গিরিব্রজনগরী উত্তর ভারতের নরপতিগণের চক্ষুশূল হয়ে বিরাজ করেছে। এখন তো মগধের সৌভাগ্যসূর্য মধ্যাহ্ন গগনে জ্যোতিষ্মান। এখন মগধাধিপতি হলেন মহারাজাধিরাজ জরাসন্ধ। ভূভারতে তিনি তুলনাহীন। তাঁর ভয়ে ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের মহীপতিগণ কম্পিত।

মগধবাসীরা চিরকাল ভগবদ্দত্ত বিবিধ সূক্ষ্ম প্রতিভার অধিকারী। ভাস্কর্যে অনেকে শৈশব থেকে সুদক্ষ হয়ে ওঠে। একটা জন্মগত ক্ষমতা রয়েছে তাদের মধ্যে। নৃত্যগীত সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এ ছাড়াও বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত নানা সামগ্রী তৈরী করতে মগধবাসীরা সুনিপুণ। একথা তারা সবাই জানে যে তাদের পূর্বপুরুষের হস্তশিল্প ক্রয় করে নিয়ে গিয়ে অযোধ্যারাজ দশরথ তাঁর প্রিয়তমা পত্নী কৈকেয়ীর মানভঞ্জন করতেন। এতে তারা গর্ববোধ করে। এই গর্ববোধ তাদের উৎসাহদান করে, প্রেরণা যোগায়।

গিরিব্রজকে বলা যায় প্রাসাদপুরী। তেমনি আবার তাকে বলা যায় তপোবন। কারণ নগরীর পথিপার্শ্বস্থ তরুশ্রেণী বিচিত্রবর্ণের পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত

থাকে। সেই সব বৃক্ষে কত বর্ণের পক্ষীর কলকাকলী। অন্য রাজ্যের পথিক এসে মুগ্ধ হয়। ভাবে, এ বুঝি স্বর্গপুরী। পথের ধারে বিপণীশ্রেণী নানা দ্রব্য-সামগ্রীতে সজ্জিত। সত্যই দর্শনীয়। নগরীতে সাধারণ কুটিরও রয়েছে অনেক। সবাই ধনবান নয়। তবে কুটিরগুলিও পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিনন্দন।

এমনি একটি কুটিরের অলিন্দে বসে যুবক শুচিব্রত সম্মুখে একটি নাতি-উচ্চ কাষ্ঠাসনের ওপর ভূর্জপত্র রেখে দক্ষিণ হস্তে লেখনী ধারণ করে কল্পনাসাগরে নিমগ্ন। ভূর্জপত্রে গোটা গোটা অক্ষরে কবিতার পদ ফুটে উঠেছে। পাশের নাগকেশর গাছের আড়াল থেকে প্রতিবেশী কন্যা বিনতা কবি শুচিব্রতের তরুণ মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছে। অতি রূপবতী সে। তার কুঞ্চিত কেশদাম নাগের মত পৃষ্ঠদেশে লুন্ঠিত। তার শঙ্খবর্ণা কপোলে এখন রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে। তার বক্ষের ঘন ঘন উত্থানপতনে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে এক দুর্নিবার আকর্ষণকে সংযত করার প্রয়াসে নাগকেশর বৃক্ষের কাণ্ডকে প্রাণপণে দু হাতে চেপে ধরেছে। শেষে সে ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে এগিয়ে শুচিব্রতের সামনে এসে দাঁড়ায়। কবি প্রথমে ভাবে, কাব্যলক্ষ্মী স্বয়ং বুঝি আবির্ভূতা হলেন তাকে কৃপা করতে। পরক্ষণে চমক ভাঙে। মুখে তার হাসি ফুটে ওঠে।

সে বলে—ভেবেছিলাম কাব্যলক্ষ্মী কৃপা করে আবির্ভূতা হয়েছেন।

—এখন কি ভাবছ!

কবিবর একটু চিন্তা করে বলে—কাব্যলক্ষ্মীই বটে। তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাক। আমি শ্লোকের পর শ্লোক লিখে যাব।

বিনতা বলে—কবিরা কি শুধু কল্পনার জগতে ভাসে? বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না?

—একথা বললে কেন? এমন তো বল না।

—তুমি যখন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় মগ্ন তখন এই নগরীতে অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে, তার সংবাদ কি তুমি রাখ?

—কোন্ ঘটনার কথা বলছ বিনতা?

—মহাবল বলে কারও নাম তুমি শুনেছ?

একটু ভ্রূকুঞ্চিত হয় শুচিব্রতের। তারপর বলে—রাজকুমার ধৃষ্টকেতুর বয়স্য রয়েছে এক মহাবল। আর কারও কথা মনে পড়ছে না।

বিনতা গম্ভীর হয়ে বলে—হ্যাঁ, তার কথা বলছি। সে আমার পাণিপ্রার্থী।

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কবি বলে ওঠে—তাই হয় নাকি? তুমি তো আমার।

—কে বলল?

কবিবর বিস্ময় প্রকাশ করে বলে—বিনতা, তুমি জান না?

—আমি জানলে কি এসে যায়? তুমি পুরুষ। তুমি পিতার কাছে গিয়ে দাবি জানাবে সবাইকে বলবে। তবে তো। আমি যে তোমার একথা মনে মনে জানলে হবে?

—অতটা ভাবিনি বিনতা।

—ভাবনি বলে মহাবল আমার পিতার কাছে গিয়ে আবেদন করার সুযোগ পেয়েছে।

—তোমার পিতা কি বললেন?

—মোটামুটি রাজী হয়েছেন। তাঁর মতে পাত্র সুদর্শন। অস্ত্রবিত্থায় পারদর্শী। রাজপুত্রের বয়স্য। মহারাজা এবং রাজপুরীর অন্যান্যদের পরিচিত। এর চেয়ে অধিকগুণের অধিকারী পাত্র পিতার কল্পনাতীত।

শুচিব্রত বলে ওঠে—আর, তুমি বাধা দিলে না?

—বাধা কি করে দেব? আমি বললাম, এই একই প্রস্তাব নিয়ে শুচিব্রত আপনার কাছে আসবে। পিতা ক্রোধান্বিত হয়ে বলে উঠলেন—কে বলেছে? আর বললেই বা কি এসে যায়? শুচিব্রত আমার প্রতিবেশী। ওকে ভালভাবে চিনি। ও তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার মত রূপসী ভার্যাকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা ওর নেই।

আহত শুচিব্রত বলে—এই কথা বললেন উনি। আমাকে কত স্নেহ করেন।

—স্নেহ করলে যে কন্যার উপযুক্ত স্বামী বলে ভাবতে হবে এমন কথা নেই।

—আমাকে উপযুক্ত ভাবেন না কেন?

—আমার মনে হয় উনি ভাবেন না যে তুমি বীর, তুমি সাহসী।

শুচিব্রত ভূর্জপত্রগুলি সযত্নে বেঁধে ফেলে। তারপর বলে—আমি তোমার পিতার কাছে চললাম। তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে মনে মনে আমাকে পতিত্বে বরণ করেছ। তা কি মিথ্যা?

—না। মিথ্যা হবে কেন?

—তবে পিতাকে কেন বললে না সেকথা। কেন বললে না, তুমি অসতী নও?

—বলেছিলাম। শুনে পিতা হেসে উঠলেন।

শুচিব্রত বলে—কেন?

—আমি বলেছিলাম কৈশোরে তোমাকে একথা আমি বলেছি। তাঁই হাসলেন। বললেন, নারীত্বের বিকাশ যে সময়ে ঘটেনি তখনকার কথার কোন

গুরুত্ব নেই।

—এখন কি তোমার মনের পরিবর্তন ঘটেছে বিনতা? এখন তুমি পূর্ণ বিকশিত নারী।

বিনতা একথার উত্তর দেয় না। যদিও সে জানে, মহাবল কখনো তার দেহমনকে অধিকার করতে পারবে না। শুচিব্রততে সে উৎসর্গীকৃতা। তার কল্পনা, তার স্বপ্ন সবই শুচিব্রতকে ঘিরে। তবু সে কঠিন স্বরে বলে—আমি চাই যিনি আমার প্রভু হবেন পিতার সম্মুখে গিয়ে তিনি নিজেকে প্রমাণ করুন।

বিনতার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি হেনে শুচিব্রত দৃঢ়পদে এগিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী কুটিরের দিকে। বিনতা তার পশ্চাতে গমন করে। তার মনে আশঙ্কা, পিতা কি বলবেন ভেবে। শুচিব্রত কি তার পিতাকে সম্মত করতে পারবে? না পারলে!

পিতা পুণ্ড তখন আঙিনায় একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। শুচিব্রত সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—এই যে শুচিব্রত, তোমার কাব্যচর্চা কেমন হচ্ছে?

—ভাল। আমি এখন অন্য কারণে এসেছি।

যুবকের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুণ্ড বলে—অন্য কারণ? কি কারণ?

—আমি অনেকদিন থেকে বিনতাকে আমার সহধর্মিণী বলে মনে মনে জানি। এবারে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওকে পেতে চাই।

পুণ্ডের ব্যস্ত হস্তদ্বয় থেমে যায়। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুচিব্রতের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এই অতিপরিচিত তরুণের স্বরে এক আশ্চর্য দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ তাকে এমন ভাবেনি সে কখনো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে পুণ্ড বলে—তোমার যোগ্যতা কি? কাব্য রচনা?

—সেটা অবশ্যই একটা যোগ্যতা। আমার মনে হয় সর্বোত্তম যোগ্যতা।

পুণ্ড ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—আর অসিধারণ? যুদ্ধযাত্রা? মৃগয়া? এসব কি অযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট?

—না, এসবের রীতিমত গুরুত্ব রয়েছে। তবু আমার মনে হয় মগধ দেশে কাব্যরচয়িতার প্রয়োজন খুব বেশী। এই দেশ প্রতিভার দেশ। এখানে বহু ধরনের শিল্পী রয়েছেন। কিন্তু সার্থক কাব্যরচয়িতার অভাব এখনো মেটেনি।

—তোমার এই ধারণার হেতু?

—এটা আমার ধারণা নয়। এটা পরম সত্য। মগধ রাজ্য বহুদিন থেকে

সমৃদ্ধশালী। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন রাজ্যগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এখানে মহারাজা মান্ধাতা থেকে শুরু করে কত বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজত্ব করে গিয়েছেন। অথচ আজ তাঁরা প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছেন। কত সঙ্গীতজ্ঞ, কত নৃত্যবিশারদ এই দেশের ভূমিকে ধন্য করে গিয়েছেন। অথচ তাঁদের কথা কারও মনে নেই।

পুণ্ড বৃক্ষটির শাখা-পত্রাদি একপাশে সরিয়ে রেখে হেসে বলে—এর মধ্যে কাব্য আসে কি করে?

—সেই সমস্ত রাজা মহারাজা আর শিল্পীরা অমর হয়ে থাকতেন যদি সেই সময় কোন কবি জন্ম নিতেন। তাঁরা তাঁদের গাথার মধ্যে এদের বাঁচিয়ে রাখতেন। শত্রু দেশের কবির মাধ্যমে কেউ বাঁচেন না। বাঁচলে বিকৃতভাবে বাঁচেন।

বিনতা সেই সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে শুনছিল শুচিব্রতের কথা। নতুন নতুন লাগছিল। পুণ্ডের মুখের অবহেলার হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। তবু সে বলে—তুমি কি বলতে চাও, আমাদের মহারাজা জরাসন্ধ, যিনি অনায়াসে পৃথিবী জয় করতে পারেন, তিনিও বিস্মৃত হবেন?

শুচিব্রত চিন্তা করে বলে—এত যাঁর শক্তি, এত যাঁর প্রসিদ্ধি তিনি হয়ত বিস্মৃত হবেন না। কিন্তু যে ভাবে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যেত, সেভাবে নাও বাঁচতে পারেন। তিনি যদি বাঁচেন শত্রুপক্ষীয় কোন কবির লেখনীর মাধ্যমে বাঁচবেন।

—ক্ষতি কি? তাতে মহারাজের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

—সমূহ ক্ষতি হতে পারে। হয়ত তাঁর গুণাবলীকে দেখানো হবে না। তাঁর সদ্‌গুণগুলি গুপ্ত রেখে বিকৃতভাবে তাঁকে দেখানো হবে। ওদের কাব্যে হয়ত তিনি দুরাত্মা বলে বর্ণিত হবেন। কিছুই বলা যায় না।

পুণ্ডের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে—চুপ কর। এসব হল কবির উদ্ভট কল্পনা। যারা শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ, যাদের দেহ, যাদের ললাট কখনো স্বেদসিক্ত হয় না তাদের মস্তিষ্কে এই সব কল্পনার জন্ম হয়। বিনতাকে তোমার হস্তে অর্পণ করা এক কথায় বাতুলতা।

বিনতা দু পা এগিয়ে এসে বলে—কিন্তু পিতা, এখন আমার সর্বদেহে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ। এখনো আমি বলছি শুচিব্রত আমার দেহ মনের একমাত্র অধীশ্বর।

পুণ্ড ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে—আমি মানি না। মহাবল তোমার স্বামী।

শুচিব্রত সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—আমি সেটা মানি না। বিনতা আমার স্ত্রী।

—তুমি মহাবলের সঙ্গে অসিযুদ্ধে সম্মত আছ?

—না।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয় পুণ্ডের মুখমণ্ডল। সে বলে—তুমি কাপুরুষ।

—সেজন্য নয়। বিনতা আমার পত্নী। ওকে যদি মহাবল শক্তিপ্রয়োগে অধিকার করতে চায় তবে নিশ্চয় আমি ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াব। নইলে নয়।

—তুমি উন্মাদ।

—আমি উন্মাদ কিনা জানি না। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, বিনতাকে স্পর্শ করার ধৃষ্টতা মহাবল যেন না দেখায়। তার মৃত্যু হতে পারে। আপনি বরং আপনার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করুন।

পুণ্ড তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা। প্রতিবেশী তরুণটি তাকে রীতিমত অপমানিত করল। সে সিদ্ধান্ত নেয় পরদিনই মহাবলের সঙ্গে বিনতার বিবাহের দিন স্থির করবে। সেকথা শুচিব্রতের সামনে ঘোষণা করে।

পরদিন কবি শুচিব্রতের আর এক রূপ। সে অসিহস্তে পুণ্ডের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

পুণ্ড বলে—সরে যাও শুচিব্রত। মহাবল কবি নয়। এভাবে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না।

শুচিব্রত নির্বাক কিন্তু অনড়।

বিচলিত পুণ্ড একটু পরে এসে আবার বলে—শুচিব্রত সময় হয়ে আসছে। ওই শোন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। ওরা আসছে। তুমি সরে দাঁড়াও। তোমাকে বিনতার স্বামী বলে গ্রহণ করতে না পারলেও যথেষ্ট স্নেহ করি। তোমার কিছু ঘটলে আমি আঘাত পাব।

শুচিব্রত একটু হাসে।

—তুমি হাসছ। মহাবলকে চেন না তুমি। সে তোমাকে হত্যা করবে। তাছাড়া বিনতা তো আজ একটি কথাও বলছে না।

—নারী হয়ে একথা সে কতবার বলবে। সে এখন তার স্বামীর বীরত্ব দেখতে চায়। সে দেখতে চায় আমি তাকে কিভাবে রক্ষা করি। তাতেই তার গর্ব তার আনন্দ।

গৃহপ্রাঙ্গণে বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিনতা মাতৃহারা। প্রতিবেশী

কুলবধূগণ দুরু দুরু বক্ষে আয়োজন করে চলেছে। তারা সব কিছু জানে, সব কিছু শুনেছে তারা। বিনতার মনোভাব তাদের অজানা নয়। তাদের শুভেচ্ছা, তাদের আশীর্বাদ সবটুকু শুচিব্রতের ওপর। তাদের স্বামীরা বহুবার অনুরোধ করেছে পুণ্ডকে মতের পরিবর্তন করতে। কিন্তু পুণ্ড শোনেনি তাদের কথা। এক বর্ষীয়সী মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন পুণ্ডকে—তুমি কি তোমার নিজ কন্যাকে অসতী হতে দিতে চাও? নিজে আমাদের বলেছে সে শুচিব্রতগতপ্রাণা।

পুণ্ড কর্ণপাত করেনি। তার বিশ্বাস কোন রকমে বিবাহপর্ব সমাপ্ত হলে বিনতার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে। মহাবলের ঐশ্বর্য, রাজপুরীর স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পরিচয়, শুচিব্রতের কথা ভুলিয়ে দেবে।

মহাবল তার সঙ্গীদের নিয়ে আরও এগিয়ে আসে। একজন ছুটে এসে জানায় যে মহাবল অশ্বারূঢ় হয়ে আসছে। তার সঙ্গে আছেন স্বয়ং রাজকুমার ধৃষ্টকেতু। তিনিও রয়েছেন অশ্বপৃষ্ঠে।

একজন রমণী শুচিব্রতের কাছে গিয়ে বলেন—তুমি কি পারবে? রাজকুমার সঙ্গে আছেন।

—আমি পারব এমন কথা বলিনি। না পারলে মরতে পারব। বিনতা দেখবে তার জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছি, আত্মসমর্পণ করিনি। সে কি তাতে সুখী হবে না?

রমণী একদৃষ্টে শুচিব্রতের দিকে চেয়ে বলেন—নিশ্চয় হবে শুচিব্রত। এমন স্বামী পাওয়া যে কোন নারীর মহাপুণ্যের ফল। বিনতা যেন তোমার মর্যাদা রাখতে পারে।

অশ্বারূঢ় মহাবল শোভাযাত্রা সহকারে পুণ্ডের কুটিরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়। অপর একটি অশ্বে স্বয়ং রাজকুমার ধৃষ্টকেতু। তারা প্রবেশপথে সশস্ত্র শুচিব্রতকে দণ্ডায়মান দেখে বিস্মিত হয়। এদিকে রাজকুমারকে একজন সাধারণ গিরিব্রজবাসীর কুটিরে সমুপস্থিত দেখে জনসমাবেশ ঘটে। বিনতা যে অনিন্দ্যসুন্দরী একথা অনেকে জানে। তার যোগ্য শ্বশুরালয় যে কোন ধনীর অট্টালিকা কিংবা রাজপ্রাসাদ এ বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এত দ্রুত তার বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে একথা কেউ জানতে পারেনি। তারা বিস্মিত। অনেক যুবক তার রূপের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েও অগ্রসর হতে সাহস পায়নি। তারা জানত ওই রত্ন ধারণ করার উপযুক্ত তারা নয়। আজ অশ্বারূঢ় মহাবলকে বরবেশে নগরীর পথে দেখে তারা যখন জানল কোথায় তার গন্তব্যস্থল, তখন বুঝল তাদের অনুমান যথার্থ ছিল।

কিন্তু এ কি দেখছে সকলে! অসিহস্তে শুচিব্রত অনড়। সবাই ভাবে, ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন কবিবর? অভ্যর্থনা জানাতে? কিন্তু সে যে পথ অবরোধ করে রয়েছে। তারা দেখল বিনতার পিতা পুণ্ড অন্য পথে ঘুরে গিয়ে ধৃষ্টকেতু ও মহাবলকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার অসহায়তার কথা ব্যক্ত করে।

ক্রোধোন্মত্ত মহাবল অশ্বপৃষ্ঠ থেকে এক লাফে অবতীর্ণ হয়ে এসে দাঁড়ায় শুচিব্রতের সামনে। তারপর চিৎকার করে বলে ওঠে—তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়েছে। তুমি বাধা দিতে এসেছ এই মহাবলকে?

শুচিব্রতের শান্ত উত্তর—স্পর্ধা আমার নয় মহাবল স্পর্ধা তোমার। বিনতা আমার পত্নী। অন্যের পত্নীকে স্পর্শ করার ধৃষ্টতা দেখিও না। চলে যাও। আর সেই ধৃষ্টতা দেখাতে হলে আমার শবদেহকে অতিক্রম করে যেতে হবে—যেটা একা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

—কী, এতদূর! বেশ, মৃত্যুর কোলে যাওয়ার যখন এত ইচ্ছা তখন তাই হোক!

রাজপুরীর যে সমস্ত রক্ষীরা ধৃষ্টকেতুব সঙ্গে এসেছিল মহাবল তাদের আদেশ দেয় শুচিব্রতকে আক্রমণ করতে। শুচিব্রত বিস্মিত হয়। ধৃষ্টকেতু হাত তুলে বাধা দেন সঙ্গে সঙ্গে।

রাজকুমার বলেন—একজন মাত্র ব্যক্তিকে অনেকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে নিহত করা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তাতে তুমি কাপুরুষ বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে মহাবল। কারণ তুমি হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হবে। আর হত্যার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। তোমাদের যে কোন একজন ওর বিরুদ্ধে অসি ধরতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি যোগ্যতম ব্যক্তি। যুবকটির প্রতি অন্য কারও ততটা তিক্ততা নেই, যতটা তোমার আছে। হত্যা কর আর আহত কর সেটা বিনা কারণে না হওয়া বিধেয়।

পুণ্ড বলে—রাজকুমারও শুধু কবিতা লেখে। ওর হস্তে লেখনী শোভা পায়, অসি নয়। মহাবল ওকে সহজে পরাস্ত করতে সক্ষম। তবে ওর প্রাণ সংহার যেন না করা হয়। শৈশব থেকে ওকে চিনি। ও আমার স্নেহভাজন।

শুচিব্রত বলে—দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমি সরে দাঁড়াব না। আমাকে শুধু আহত করে মহাবলের কার্যসিদ্ধি হবে না। আমাকে বধ করতে ও বাধ্য। তবে পারবে না। ওর দেহ অসি যুদ্ধের উপযোগী নয়।

সবাই ভাবল মহাবলকে উত্তেজিত করার জন্য শুচিব্রতের এ একটি কৌশল মাত্র। রমণীরা অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। বিনতা শুচিব্রতের সাহস

দেখে মুগ্ধ।

আর মহাবল? শুচিব্রতের মন্তব্যে তার সর্ব শরীরের শোণিত মস্তকে গিয়ে প্রতিহত হয়। নগরবাসীর সম্মুখে তাকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে এই যুবক। এই শুভলগ্ন একটিমাত্র প্রাণীর জন্য সবার নিকট হাস্যকর হয়ে উঠেছে। এখন এ আবার তার অসি ধারণের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অসহ্য।

ক্ষিপ্ত হয়ে সে অসি নিষ্কাষণ করে চিৎকার করে ওঠে—তবে প্রস্তুত হ পামর।

স্তম্ভিত হয়ে সকলে দেখল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধৃষ্টকেতুর প্রিয়তম বয়স্যর অসি দ্বিখণ্ডিত। অসির একটি অংশ ভূতলে পতিত। অপর অংশ শিথিলভাবে মহাবলের হস্তে ধৃত।

পুণ্ড বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বিনতার দু নয়ন অশ্রুপ্লাবিত। শুচিব্রত বলে—অন্য অসি নিয়ে এস মহাবল। তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম।

কিন্তু তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদের ভেতর থেকে চারজন আচম্বিতে ছুটে 'এসে একযোগে শুচিব্রতকে আক্রমণ করে। মারাত্মক আহত অবস্থায় সে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।

ধৃষ্টকেতুর চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে গেল তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগে। অন্যান্য সৈন্যদের কঠোর স্বরে আদেশ দেন, ওই চারজনকে নিরস্ত্র ও বন্দী করতে। তাদের বন্দী করা হলে ধৃষ্টকেতু শুচিব্রতের কাছে গিয়ে ভূমিতে বসে পড়েন। দেখেন, একটি বল্লম তার বক্ষের পার্শ্বদেশ ভেদ করে চলে গিয়েছে। কোন আশা নেই।

ধৃষ্টকেতু ডাকেন—শুচিব্রত!

অতি কষ্টে শুচিব্রত বলে—মহাবলের বাধা দূর হল রাজকুমার। আমার বাসনা ছিল আপনার পিতাকে কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে জগদ্বিখ্যাত করে তুলব। হল না। উত্তর ভারতে কবি আছে, মগধে নেই।

শুচিব্রতের চক্ষুদ্বয় ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে আসে। আর সেই সময় বিদ্যুৎশিখার মত এক নারী ছুটে এসে শুচিব্রতের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে। বলে—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা হাতে নিয়ে নিজের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে দেয় বিনতা। তারপর ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ার মত ধীরে ধীরে তার নয়নদ্বয় বন্ধ হল। চিরতরে নিদ্রিত হল সাধ্বী বিনতা।

পুণ্ডের বক্ষবিদীর্ণ আর্তধ্বনি নির্গত হয়—এ আমি কি করলাম। বিনতা

ফিরে আয় মা।

ধৃষ্টকেতু সব দেখেন। কিছু বলার নেই। কিছু করার নেই। মহাবলের মস্তক আনত। হস্তে তার তখনো ধৃত রয়েছে দ্বিখণ্ডিত অসির এক প্রান্ত। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল তার। পুণ্ডের আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেতে থাকে।

রক্ষীদের একজন অপর একজনকে নিম্নকণ্ঠে বলে—শুচিব্রত যে অসি চালনায় পারদর্শী, আর কেউ না জানুক আমি জানতাম।

—কেমন করে ?

—সরস্বতী নদীর তীরে আম্রকাননে সে অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করত।

—কার কাছে ?

—চিনি না। প্রবীণ ব্যক্তি। মনে হয় কোন নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন।

পুণ্ডের হাহুতাশ বৃদ্ধি পায়।

ধৃষ্টকেতু পুণ্ডকে বলেন—এদের দুজনের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনি স্থির হন।

কিন্তু ততক্ষণে বিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত রমণীকুলের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। ধৃষ্টকেতু এক প্রতিবেশীকে সমস্ত কাজের ভার দিয়ে মহাবলকে নিয়ে প্রস্থান করেন। যাবার পথে বাদ্যধ্বনি শোনা যায় না। অশ্ব দুটি আরোহীবিহীন অবস্থায় চলতে থাকে। রাজকুমাব মহাবলের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলেন। সমস্ত নগরীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রটে যায় এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা। দলে দলে রমণীরা এসে উপস্থিত হয় সতীসাধ্বী বিনতাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ না হয়েও এই পরমা সুন্দরী কন্যাটি সমস্ত সতীকে হার মানিয়ে আজ নারীহৃদয়ের উজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত হল।

মগধেশ্বর জরাসন্ধের রাজসভায় আড়ম্বরের সীমা-পরিসীমা নেই। বিরাট সভাকক্ষ অতি মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত। মহারাজা স্বর্ণসিংহাসনে আসীন। তাঁর সম্মুখে হীরক ও নানাবিধ মহার্ঘ্য রত্নখচিত রাজদণ্ড। বহুমূল্য ধাতুনির্মিত সুদর্শন ছত্র শোভা পাচ্ছে সিংহাসনের পশ্চাতে তাঁর মাথার ওপর। রাজমুকুটের অতুলনীয় শোভা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করতে হয়। স্বর্ণরৌপ্যের ঝল্লরী শোভিত ব্যজনী হস্তে দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মানা দুই সুন্দরী সতত ব্যজনী আন্দোলিত করে চলেছে। পশ্চাতে অপর এক তন্বীর হস্তে দোলায়মান চামর।

সভাসদ্‌গণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। মহারাজার মত সবাই গম্ভীর। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ধৃষ্টকেতু। তাঁর অদূরে বয়স্য মহাবল।

জরাসন্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—ঘটনাটা খুবই পরিতাপের পুত্র। বিশেষ করে তোমার বয়স্য মহাবল এতে জড়িত। তবে যা শুনলাম, তোমাদের কারও কিছু করার ছিল না। যে সব রক্ষী যুবকটিকে হত্যা করেছে তাদের মৃত্যুদণ্ড হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নগরীর মধ্যে এ ধরনের রক্তপাত শুভ নয়। কখনো শুভ নয়।

ধৃষ্টকেতু একটু দ্বিধা করে বলেন—ওই যুবকের একটি কথা আমি বিস্মৃত হতে পারছি না।

—কি কথা? নির্দ্বিধায় বল।

—যুবক মৃত্যুর পূর্বে একটি মন্তব্য করেছিল যা আমার মনের মধ্যে গ্রথিত হয়ে রয়েছে।

—কি বলেছিল সে?

—বলেছিল, তার ইচ্ছা ছিল কাব্যের মাধ্যমে সে আপনাকে অমর করে রাখবে। সেই ইচ্ছা তার অপূর্ণ রয়ে গেল। আরও বলেছিল উত্তর ভারতে অনেক কবি আছেন, মগধে আপাতত নেই।

নৃপতি জরাসন্ধ নড়েচড়ে বসেন। তারপর তাঁর প্রধান মন্ত্রণাদাতার দিকে চেয়ে বলেন—কৃতবন্ধু, আপনার কি মনে হয়?

কৃতবন্ধু বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি একটু চিন্তা করে বলেন—যুবকটি এখন আর নেই। তাকে কখনো দেখিনি। তবু বুঝতে পারছি আপনার রাজ্য একজন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তিকে হারাল। সেই সঙ্গে সে ছিল কবি। বড় অনুশোচনার বিষয় মহারাজ।

মহারাজা মনে করিয়ে দেন—সে অস্ত্রবিদ্‌ও বটে। মহাবলকে মুহূর্তের মধ্যে সে পরাজিত করেছে। কিন্তু কৃতবন্ধু তার কথার মর্মার্থ কি?

—মহারাজ, নৃপতিগণ যত যোগ্যই হোন না কেন মৃত্যুর পরে কোন এক সময়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। এই তো এই নগরীতে এককালে মান্ধাতার মত মহান নৃপতি রাজত্ব করে গিয়েছিলেন, কজন মনে রেখেছে তাঁর কথা! ভূপতি বৃহদ্রথের কথা ধরুন। বেশী দিন হয়নি। তবু তাঁর কীর্তিকলাপ তাঁর স্মৃতি সাধারণ মানুষের মন থেকে অনেকখানি অপসৃত হয়েছে। অন্যান্য নরপতিদের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তাঁদের যে কোন একজনের সময়ে যদি কোন প্রতিভাবান কবি থাকতেন, তিনি পারতেন তাঁর রাজাকে অমর করে রাখতে।

—কিভাবে ?

—তাঁর স্বরচিত কাব্যের মাধ্যমে। তাঁর গুণের জয়গান গেয়ে। বাঁচাতে পারতেন আবেগ-মথিত ছন্দোবদ্ধ শ্লোকরচনা করে। মহর্ষি বাল্মীকির কথা ভাবুন। আজ শ্রীরামচন্দ্র আমাদের পূজ্য। সেই সময়ে যদি বাল্মীকি না থাকতেন ? কথাটা ভেবে দেখুন একবার মহারাজ। রামচন্দ্রকে কোথায় পেতাম ? তাঁর কীর্তির চিহ্ন এভাবে কি খুঁজে পাওয়া যেত আজ ?

—মানুষের হৃদয়ে তিনি আছেন। লোকের মুখে মুখে তিনি আছেন।

—আছেন, শুধু আদি কবির জন্য। নইলে ঠিক এভাবে থাকতেন না। শ্রীরামচন্দ্রের ঘরের কথাও আমরা জানি। তাঁর সুখ দুঃখ হাসি কান্না যেন আমাদেরই হাসি কান্না। তিনি আমাদের হৃদয় আর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। শুধু বাল্মীকির জন্য এটা সম্ভব হয়েছে।

সভাস্থল স্তব্ধ। সবাই প্রতিবাদ করতে চায় কৃতবন্ধুর কথায়। মহারাজা জরাসন্ধ নিজেও চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি নীরব রইলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে প্রবল ঝড়। মন্ত্রীমহোদয়ের আর কি বলায় আছে শুনতে চান তিনি।

—মহারাজা, আপনি একটি দুর্লভ সুযোগ হারালেন। এটা আপনার দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কীর্তির মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে, সেই কীর্তিই শুধু সব সময় যথেষ্ট নয়। তাকে যুগের পর যুগ বাঙ্ময় করে রাখার প্রয়োজন। আর সেটি পারে অগাধ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিভাবান কোন কবি। জানিনা এই মগধরাজ্যে শুচিব্রতের মত আর কেউ আছে কিনা। সবচেয়ে দুঃখের হবে মহারাজ আপনার কোন শত্রু যদি আপনার চেয়ে দুর্বল হন, আপনার অজস্র সদগুণের একদশমাংশও যদি না থাকে তাঁর, অথচ তিনি যদি তেমন কোন কবি পান, তাহলে সহস্র বৎসর পরে দেখা যাবে আপামর জনসাধারণ জানবে তাঁর মত কীর্তিবান বীর্যবান রাজা ভূভারতে খুব কমই জন্মেছে। সেখানে হয়ত আপনাকে অঙ্কিত করা হবে বীর্যহীন, দৈত্যসদৃশ কোন নৃপতি রূপে।

চমকিত জরাসন্ধ বলে ওঠেন—এমন হয় ? এমন কি হতে পারে কৃতবন্ধু ?

—হতে পারে। অবশ্যই হতে পারে মহারাজ। তবে প্রকৃত কীর্তিবানের সব কীর্তি সব পরাক্রমকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না এই যা ভরসা।

কিছুক্ষণ পরে সেদিনের সভা ভঙ্গ হল। মহারাজ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাসদগণ দণ্ডায়মান হয়। তারপর মহারাজা অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হলে সকলে রাজসভাগৃহ ত্যাগ করে। তাদের মুখ গম্ভীর।

তারাও অনুভব করেছে শুচিব্রত একটি অর্থবহ কথা বলে গিয়েছে। তাকে এভাবে হারিয়ে সবার মনে একটা শূন্যতাবোধ বিরাজ করে। অথচ শুচিব্রতের সঙ্গে অধিকাংশের চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত ঘটেনি কখনো।

কিন্তু গিরিব্রজনগরী ঠিক যেন চিরপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর মত। কোন ঘটনা তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। বদ্ধ জলাশয়ে ভেসে থাকার মত কোন ঘটনার প্রভাব একই জায়গায় ভাসমান থাকে না। মুহূর্তে চলে যায় দূরে স্রোতের টানে। বিনত-শুচিব্রতের পরেও দ্রুত পটপরিবর্তন হয়ে যায়।

গিরিব্রজনগরী আজ উৎসবের সাজে সজ্জিত। পথিপার্শ্বের বিপণি শ্রেণী বিচিত্র দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। নগরীর রাজপথ চিরকাল পরিচ্ছন্ন থাকে। এখন আরও শোভনীয়। সারি সারি প্রাসাদ শ্রেণীতে রঙের প্রলেপ পড়েছে। নগরী যেন হাস্যময়ী। নগরবাসীদের মনেও উৎসবের স্পর্শ। তাদের যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন মগধ রাজ্যের অন্যত্র বসবাস করে তারাও অনেকে এসেছে উৎসবে যোগ দিতে। আত্মীয়দের গৃহে এ কদিন তারা থাকবে। প্রিয়জনদের সান্নিধ্য পেয়ে গৃহগুলি আনন্দমুখর।

এত যে উৎসব, এত আনন্দ আয়োজন এর কারণ মহারাজ জরাসন্ধের জামাতা তাঁর দুই পত্নী সহদেবা ও অনুজাকে নিয়ে কদিন পরে এ রাজ্যে পদার্পণ করবেন। শ্বশুরালয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করে আমোদ-আহ্লাদ করবেন, মৃগয়ায় যাবেন, নগর পরিদর্শন করবেন, তারপর আবার নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করবেন। তাঁর দুই পত্নীই হলেন মহারাজ জরাসন্ধের দুই আদরের কন্যা। সাধারণত বিবাহের পরে রাজমহিষী হয়ে একবার অন্য রাজ্যের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কোন নারীরই পিত্রালয়ে পুনরাগমনের সুযোগ আর জীবনে হয়ে ওঠে না। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ জরাসন্ধ সাধারণ নৃপতি নন। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত। তাঁর জামাতাও যথেষ্ট পরাক্রমশালী নরপতি। তিনি হলেন মথুরাধিপতি কংস। প্রথমত তিনি উত্তরখণ্ডের নৃপতি, যারা মগধকে হেয় চক্ষে দেখতে অভ্যস্ত। তার ওপর তিনি যথেষ্ট ঐশ্বর্যবান এবং তাঁর নানান শ্রেণীর সৈন্য আছে ভূ-ভারতে যা খুব স্বল্পসংখ্যক নৃপতির রয়েছে। এই সব কারণে মহারাজ জরাসন্ধ কংসকে তাঁর দুই কন্যার স্বামী হিসাবে নির্বাচিত করেন। আর তাঁদের বিবাহ উপলক্ষে যে আনন্দোৎসব হয়েছিল মগধবাসী জীবনে কখনো সেই সুখস্মৃতি ভুলবে না। সেই উৎসবে মগধ রাজ্যের

প্রতিটি পরিবার কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়েছিল। সেই সব দিনের কথা মনে রেখে নাগরিকরা আনন্দ করছে। দুই রাজকন্যা ও তাঁদের স্বামী কংস মহারাজ তাদের কাছে সুখের প্রতীক।

মথুরারাজ এসে পৌছলেন। তিনি এলেন অশ্বচালিত রথে। সঙ্গে এল গজ ও অশ্বসমৃদ্ধ বৃহৎ একদল সৈন্য। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ অসংখ্য ঘৃতের প্রদীপের আলোকসজ্জায় মনোরম হয়ে উঠল। নগরবাসীরা দলে দলে এসে সেই অপূর্ব শোভা দেখে প্রশংসা করতে লাগল। এই উপলক্ষে তারা সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করল। মহারাজের জামাতা হলে কি হবে, কংস হলেন অন্য রাজ্যের অধিপতি। এদেশের প্রজাদের দৈন্য তাঁকে দেখানো ঠিক নয়। তাছাড়া মগধ এখন অদ্বিতীয়। তার রাজধানীর নাগরিকদের একটা সম্মান রয়েছে। সেই সম্মানের সঙ্গে মহারাজ জরাসন্ধের সম্মান বিজড়িত। এখানে কত রাজা মহারাজা এসে সভাকক্ষে দাঁড়িয়ে মহারাজ জরাসন্ধের আনুগত্য স্বীকার করে যান। নইলে তাঁদের রাজ্য আক্রান্ত হবার ভয় থাকে। মগধরাজ অন্য রাজার ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারেন না। তারা তাঁকে অগ্রাহ্য করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের পরাস্ত করে বন্দী করে নিয়ে আসেন। এই গিরিব্রজনগরীর একটি বৃহৎ প্রাসাদে তেমন অনেক রাজা বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, রাজ্য যাদের অনেক দূরে—সেখানে তাদের রানী রয়েছে, তাদের পুত্র কন্যারা রয়েছে। তারা দিন গোনে রাজার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায়। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে যায় তারা আর ফেরে না আপন আপন রাজ্যে। মহারাজা জরাসন্ধ এবিষয়ে কঠোর।

মথুরারাজ কংস গিরিব্রজের অধিবাসীদের অনুরোধে তাঁর দুই রানীসহ প্রাসাদের অলিন্দে এসে সবাইকে দর্শন দিলেন। পরদিন তিনি সদলবলে গেলেন মৃগয়ায়। পাঁচটি পর্বত দূর থেকে দেখতে অতি মনোহর। সেই পঞ্চ-পর্বত সংলগ্ন অঞ্চলে অরণ্যের শেষ নেই। সেখানে বনচর প্রাণীরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। তাদের সেই নিশ্চিন্ত জীবনে মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটে দুটি করণে। পর্বতের দাবানল যখন বিস্তার লাভ করে, তখন এই সমস্ত প্রাণীরা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। তবু তারা সকলে বাঁচতে পারে না। কিছু জীবনহানি ঘটে। অন্য যে কারণে তারা অস্থির হয়, সেটি হল রাজপুরুষদের মৃগয়া। বৃহৎ দল নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তারা এসে এদের অতিষ্ঠ করে তোলে। কিরাতরাও প্রাণীবধ করে

কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে ত্রাসের সঞ্চার করে না।

মথুরারাজ কংস মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনাঞ্চলে পদার্পণ করলে পশুদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। মথুরারাজের সঙ্গী হয়ে এসেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ শ্যালক সহদেব। সহদেবের পরের ভগিনী সহদেবা।

সহদেবকে ডেকে কংস বলেন—আমি নিরীহ কোন প্রাণী বধ করতে চাই না। আমার লক্ষ্য হবে আজ শুধু হিংস্র প্রাণী।

সহদেব মৃদু হেসে বলেন—মৃগ নিরীহ প্রাণী। মৃগরা কি তবে এবারের যাত্রায় নিস্তার পাবে?

কংস হেসে বলেন—আপনি বুদ্ধিমান। কয়েকটি মৃগকে বধ না করে উপায় নেই। সঙ্গে অন্তত পনেরোজন রয়েছে। তাদের দু-তিনটি মৃগয়া বধের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। সেই মৃগের মাংস তারা ভাগ করে নেবে।

সহদেব বলেন—উত্তম প্রস্তাব। আমরা তবে কোন্ প্রাণী বধে প্রবৃত্ত হব?

—কেন? বন্য বরাহ। ব্যাঘ্র নেই এই অরণ্যে?

—অবশ্যই আছে। ব্যাঘ্র আছে, হস্তী আছে। আরও অনেক হিংস্র প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলবে।

এরপর সকলে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে বনের ভেতরে প্রবেশ করে। এদিকে ওদিকে বন্য প্রাণীদের চাপা গর্জন, বৃক্ষে বৃক্ষে ভয়ার্ত পক্ষীদের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে স্তব্ধ অরণ্যের প্রায়ান্ধকার অঞ্চল। কত প্রাণীকে দ্রুত ধাবিত হতে দেখা যায়। তারা জানে না কোথায় চলেছে তারা। সম্মুখে কোথাও নিরাপদ আশ্রয় আছে কিনা তাও তারা জানে না। শুধু জানে এই অঞ্চল এখন নিরাপদ নয়, এই অঞ্চল পরিত্যাগ করতে হবে।

মহারাজ কংসের দল শীঘ্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তবে সহদেব সব সময় ভগিনীপতির সঙ্গে থাকেন। তিনি জানেন, অন্তত আজকের দিনে তাঁর মুখ্য ভূমিকা মৃগয়া নয়, কংসের সহায়তা করা। তিনি কোন বিপদের মুখে পড়লে তাঁকে রক্ষা করা। সুতরাং শত প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি মৃগয়ায় অংশ গ্রহণ করেন না। কংস তাঁকে বহুবার অনুরোধ করে শেষে ক্ষান্ত হন।

মৃগয়ায় কংস খুবই পারদর্শী। সহদেব মনে মনে স্বীকার করেন কংসের দক্ষতা চোখ মেলে দেখার মত। যেভাবে দুটি বরাহকে তিনি নিহত করলেন বলতে গেলে, অবিশ্বাস্য। ভগিনীপতিকে বাহবা দিয়ে তিনি উৎসাহিত করেন। এইভাবে উভয়ে চারজন অনুচর নিয়ে কোন এক সময়ে ঋষিগিরি পর্বতের প্রায় শিখর দেশে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে অরণ্যের নিবিড়তা একটুও

নেই। সেখানে একটি ঝরণার তীরে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে তাঁরা মধ্যাহ্নের আহার সমাধা করেন। তারপর পর্বতগাত্র বেয়ে মথুরাধিপতি সদলে আরও ওপরের দিকে আরোহণ করতে থাকেন। সেখানে একটি গিরিকন্দরের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে বিকট ব্যাঘ্র গর্জন কর্ণগোচর হয়।

কংস মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। তাঁর অনুচরেরা প্রথমে রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে। তারপর মহারাজকে প্রস্তুত হতে দেখে তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কোথায় ব্যাঘ্র? কোথা থেকে ভেসে এল এই ভয়াবহ গর্জন? সহদেব কিছুটা অনুমান করেন। তিনি চুপ করে থাকেন। কংস চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে থাকেন খুব সতর্কভাবে। কোথা থেকে ব্যাঘ্র এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন ঠিক নেই। ঠিক সেই সময় আবার গর্জন—আরও একটু নিকটে। এবারে সকলে বুঝতে পারে। গর্জন ভেসে আসছে সম্মুখের গুহাভ্যন্তর থেকে। তারপর দেখা গেল ব্যাঘ্রটি ভেতর থেকে মন্থর গতিতে বেরিয়ে এসে গুহাদ্বারে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কংস এবং তাঁর অনুচরেরা ব্যাঘ্রটিকে বধের উপক্রম করতে সহদেব চিৎকার করে বলে ওঠেন—বধ করবেন না, বধ করবেন না। এ ব্যাঘ্র সাধারণ নয়।

উত্তেজিত কংস বলে ওঠেন—উন্মাদ হলেন। এখনি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, দেখছেন না?

সহদেব ততোধিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন—না না। এ ব্যাঘ্র কাউকে আক্রমণ করে না। শুধু গুহাটির প্রহরায় থাকে। দেখছেন না এখনো দাঁড়িয়ে শুধু ভয় দেখাচ্ছে! সাধারণ ব্যাঘ্র হলে প্রথমেই আক্রমণ করত। বহুদিন আগে মহারাজ মান্ধাতার সময়ে এই গুহায় কঙ্ক নামে এক তপস্বী তপস্যা করতেন। তার পর থেকে ব্যাঘ্রটির কোন পূর্বপুরুষ এখানে আসে তার ব্যাঘ্রীকে নিয়ে। সেই থেকে একটি করে শার্দূল পরিবার সব সময় এখানে থাকে। এরা কাউকে আক্রমণ করে না। শুধু গুহাটি প্রহরা দেয়। কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। শোনা যায়, তপস্বী নাকি এখনো ধ্যানমগ্ন রয়েছেন ভেতরে। কেউ বলে ওরা তাঁর শবদেহ পাহারা দেয়। দেহটি অবিনশ্বর।

বিরক্ত ব্যাঘ্র তাঁদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে দেখে মুখ ব্যাদান করে এগিয়ে আসে। আর মহারাজ কংস রাজকুমার সহদেবের সমস্ত উপদেশ অগ্রাহ্য করে চিৎকার করে অনুচরদের ডেকে ভল্ল নিয়ে তাকে আক্রমণ করেন। ব্যাঘ্রটি প্রথমে সম্ভবত বিস্মিত হয়। তার প্রতি কেউ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে, এ ধারণা তার ছিল না। কিন্তু সত্যি যখন সে বুঝতে পারে তাকে ওরা আক্রমণ

করা হচ্ছে, ততক্ষণে চার-পাঁচটি ভল্ল তার দেহ ভেদ করে গিয়েছে। সে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে চাইতে চাইতে মৃত্যুমুখে পতিত হল। ব্যাঘ্রী সম্ভবত গুহায় ছিল না। খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র গিয়েছিল। তাই ব্যাঘ্রকে ভূমিতে পতিত হতে দেখেও ব্যাঘ্রী এল না। কংস এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ রইল অক্ষত।

সহদেবের সর্বদেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে। তিনি নতজানু হয়ে বসে পড়ে তপস্বী কঙ্কের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠেন।

তাঁর এই ক্রন্দন দেখে কংস বিস্মিত হন। বলেন—একি! আপনি কাঁদছেন? একটা ব্যাঘ্রকে নিপাতিত করলাম, এ যে কত আনন্দের—

সহদেব ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন—মহারাজ কংস, আপনি জানেন না আপনি কি করলেন। কত অশুভ কাজ যে আপনি করেছেন, পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে আপনার ধারণা নেই।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। তবে মহারাজা জরাসন্ধ এই ঘটনার কথা শুনে শিহরিত হবেন। তাঁর আহারে রুচি থাকবে না, বহুদিন তিনি অনিদ্র রজনী অতিবাহিত করবেন, যতদিন না এই দুষ্কর্মের কুফল কি হল তিনি জানতে পারেন।

কংস হেসে উঠে বলেন—আপনারা বড় বেশী উদ্ভট চিন্তা করেন। পশুবধ মৃগয়ার অঙ্গ। তাতে কোন পাপ স্পর্শ করেনা। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিধনে যেমন পাপ নয়, পুণ্য অর্জিত হয়, এখানেও তেমন।

সহদেবের বাক্য রোধ হয়ে গিয়েছিল। কোন যুক্তি দেখানোর স্পৃহা তাঁর অবশিষ্ট ছিল না।

দিবাবসানের পর রজনীর প্রথম প্রহরে প্রত্যাবর্তন করে প্রাসাদসংলগ্ন উন্মুক্ত স্থান থেকে কংস ও সহদেব উভয়ে লক্ষ্য করেন রাজাধিরাজ জরাসন্ধ উত্তেজিত অবস্থায় অলিন্দে পদচারণ করছেন। আশেপাশের রক্ষীরা সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সহদেবের মনে আশঙ্কা জন্মে। তিনি স্থিরনিশ্চিত ব্যাঘ্রবধের কুফল ফলতে শুরু করেছে।

জামাতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেখে মহারাজ জরাসন্ধ থেমে যান। তারপর রক্ষীদের বলে যান, তিনি মন্ত্রণা কক্ষে অপেক্ষা করছেন, সহদেব এবং জামাতা যেন এই মুহূর্তে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

রক্ষীর মুখে মহারাজের নির্দেশ শুনে কংস একটু অসন্তুষ্ট হন। বলে ওঠেন—

এখন মন্ত্রণাকক্ষে কেন ? এই তো মৃগয়া করে ফিরলাম। মৃগয়ার কাহিনী শোনার জন্য আপনার মাতা ও ভগিনীরা উদগ্রীব হয়ে আছেন।

সহদেব দমিত কণ্ঠে বলেন—গুরুতর কিছু না ঘটলে পিতা এভাবে ডেকে পাঠাতেন না। আপনি দেখেছেন কি রকম অস্থিরভাবে উনি ঘোরাফেরা করছিলেন। মৃগয়ায় উনিও কম উৎসাহী নন।

কংস হেসে বলেন—প্রতিটি রাজ্যের অধিপতি যাঁর ভয়ে কম্পিত সেই মহারাজা জরাসন্ধ বিচলিত হবেন ? বিশ্বাস হয় না।

সহদেব কিছু উত্তর দেন না। তাঁর কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। উভয়ে মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করেন, যেখানে জরাসন্ধ উপবিষ্ট ছিলেন।

কোনরকম ভনিতা না করে তিনি কংসকে বলেন—অশুভ সংবাদ আছে।

সহদেব বলে ওঠেন—জানি।

—তুমি কি করে জানবে ? তুমি মৃগয়ায় ছিলে।

—তবু জানি। কারণ ইনি ঋষিগিরির ব্যাঘ্রটিকে স্বহস্তে হত্যা করেছেন।

জরাসন্ধের দুই চক্ষে আতঙ্ক ফুটে ওঠে—কি বললে ? কংস তুমি শেষে এই পাপ কার্য করলে ?

—ব্যাঘ্র হত্যাকে পাপ বলে ভাবি না।

—তুমি জান না কংস এ ব্যাঘ্র সাধারণ নয়। তুমি জান না এ ব্যাঘ্র কখনো কারও কিছুমাত্র ক্ষতিসাধন করে না। তুমি জান না এই কাজ করে নিজের কতখানি সর্বনাশ ডেকে এনেছ। জানি না সেই সঙ্গে মগধের ভাগ্যে কি লেখা রয়েছে।

সংযত কণ্ঠে কংস বলেন—কোন অশুভ সংবাদের কথা বলার জন্য মন্ত্রণাকক্ষে ডেকেছিলেন।

—হ্যাঁ। তোমার রাজ্য অতি সত্বর আক্রান্ত হতে চলেছে। মধ্যাহ্নকালে গুপ্তচর এই সংবাদ এনেছে। তখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

—কে আক্রমণ করবে ?

—কৃষ্ণ আর বলরাম।

—কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আত্মীয়রাই পরম শত্রু হয় চিরকাল। ছেলেটি শক্তিও ধরে। তবে আর ক্ষমা নয়। এবারে ওদের আমি একেবারে শেষ করে দেব।

—শত্রুকে অত সহজভাবে নিও না। বলরাম সম্পর্কে সঠিক জানা নেই আমার। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত চতুর, ক্ষুরধার বুদ্ধি তার, যুদ্ধেও সে সুনিপুণ। তাকে ওখানকার অনেকে অবতারের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

—আমিও জানি সে কথা। এবারে ওসব অবতারত্ব ঘুচিয়ে দেব। আমি কাল প্রত্যুষে রওনা হচ্ছি। ভেবেছিলাম এখানে কদিন আনন্দ করে কাটাব। এই নগরীতে বাস করা সৌভাগ্যের। তবু যেতে হবে। উপায় নেই। তেমন সুযোগ হলে আবার আসব। মগধবাসীদের জানাবেন চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।

—যদি প্রয়োজন মনে কর, কয়েক অক্ষৌহিণী তোমার সঙ্গে দিয়ে দিতে পারি।

—না, এখন তার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না।

মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বাইরে এসে অন্তঃপুরে গিয়ে যখন জরাসন্ধ বললেন যে জামাতাকে পরদিন প্রত্যুষে চলে যেতে হচ্ছে, তখন রাজপুরীতে বিষাদের ছায়া নেমে এল। জামাতা একা যাবেন না। সঙ্গে তাঁর রাণীরাও যাবেন। মাত্র কদিন হল পিতৃগৃহে এসেছে, এর মধ্যে চলে যেতে হবে? জীবনে আর কখনো পিত্রালয়ে আসা সম্ভব হবে কিনা কে জানে। আর কি কখনো এই নগরী ওই পঞ্চপর্বতকে দুনয়ন ভরে দেখতে পাওয়া যাবে?

সেই সময় সহদেব বিষণ্ণ কণ্ঠে পুরবালাগণকে ঋষিগিরির ব্যাঘ্রের কথা বলেন। শুনে সবাই কেঁদে ওঠেন। জরাসন্ধ অনেক বুঝিয়েও শান্ত করতে পারেন না। কংস সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনে অপ্রস্তুত। তিনি সত্বর নিজ কক্ষে চলে গেলেন। কিন্তু সহদেব ও অনুজা তাঁর কক্ষে ছুটে এসে বলে—এ তুমি কি করলে শেষে?

—কি আবার করব? মৃগয়ায় গিয়ে ব্যাঘ্র বধ করেছি। কোন অন্যায় করেছি?

—এ সাধারণ ব্যাঘ্র নয়। এটুকু বুঝলে না!

—না বুঝিনি। মুখ ব্যাদান করে অত বড় হিংস্র পশুটা এগিয়ে এসে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আমি জানতাম না।

—ভ্রাতা সহদেব নিষেধ করেনি?

—করেছিল। তবু হিংস্র প্রাণীকে বিশ্বাস নেই।

—এখন যদি কোন অমঙ্গল ঘটে?

—কিছু ঘটবে না। তোমাদের স্বামী বীর্যহীন নয়, এটুকু তোমাদের জানা উচিত।

দুজনে অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়। এর বেশী স্বামীকে তার শ্বশুরালয়ে কিছু বলা যায় না। অপমানিত বোধ করতে পারেন।

পরদিন নিশাবসানে কংস রওনা হলেন মথুরা অভিমুখে। তাঁর দুই রাণী অশ্রুসিক্ত নয়নে শকটারোহণ করে। তাদের মনে নিদারুণ শঙ্কা—এই যাত্রা বুঝি শেষ যাত্রা। একটা ঘোর অমঙ্গল বোধহয় ঘনিয়ে আসছে। মৃগয়ায় গিয়ে যে ব্যাঘ্রকে সবাই মৃগয়ালব্ধ একটি প্রাণী আহারের জন্য দিয়ে আসে সেই ঋষিগিরির ব্যাঘ্রকে তাদের স্বামী বধ করেছেন। উঃ ঈশ্বর ওঁকে ক্ষমা করে দাও।

সূর্যদেব তখনো তাঁর সপ্তাশ্ব নিয়ে পর্বত অতিক্রম করেননি। তবু নগরীর পরিচ্ছন্ন রাজপথের দু পাশে নাগরিকবৃন্দের ভীড়। কত আশা নিয়ে তারা তাদের স্ব স্ব গৃহ সজ্জিত করে তুলেছিল। মথুরাধিপতিকে এত শীঘ্র চলে যেতে হবে কে জানত। তারা মস্তক অবনত করে প্রণাম জানায়। কেউ কেউ যাত্রাপথে পুষ্প বিছিয়ে দেয়—যাত্রা শুভ হোক। শত হলেও মহারাজ কংসের মঙ্গল তাদের দুই রাজকুমারীর মঙ্গল। তাঁর অমঙ্গল তাদের অমঙ্গল। অনেকে জেনে ফেলেছে কৃষ্ণ বলরাম মথুরাপুরী আক্রমণের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের বলার ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা ভাল। কারণ তারা শুনেছে কৃষ্ণ অসাধারণ প্রতিভাবান এক তরুণ। বুদ্ধিবলে তিনি নাকি অনেক অসাধ্য সাধন করেন। কিন্তু তারা সাধারণ নাগরিক। রাজা মহারাজাদের এই সব উপদেশ দেওয়া তাদের পক্ষে শোভা পায় না। সেটা ধৃষ্টতা। নিজের দেশ সম্বন্ধে নিজেদের মহারাজকে পরামর্শ দেওয়া যায়। কিন্তু যে দেশ তারা দেখেনি, যার সম্বন্ধে কিছু জানে না সে দেশ সম্বন্ধে না বলাই ভাল।

গিরিব্রজ শূন্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিপণী শ্রেণীর চাকচিক্য হ্রাস পেল। সেখানকার অতিরিক্ত দ্রব্যসম্ভার পণ্যদ্রব্যের ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে রাখা হল আবার।

কংস বিদায় নেবার পর কয়েক মাস কেটে গেল, কোন সংবাদ নেই। পুরনারী-গণ বারংবার জরাসন্ধকে অনুরোধ করেন কংস ও দুই কন্যার সংবাদ আনার জন্য। জরাসন্ধের নিজেরও অস্বস্তি হচ্ছিল, কংস নীরব থাকায়। কিন্তু পরে ভেবেছিলেন, তেমন কিছু ঘটলে নিশ্চয় কংস দূত পাঠাতেন। কিছু ঘটেনি, তাই কাউকে পাঠাননি। কৃষ্ণ মনে হয় শেষ পর্যন্ত মথুরাপুরী আক্রমণের পরিকল্পনা বর্জন করেছেন। তবু সকলের আগ্রহাতিশয্যে চর পাঠালেন তিনি। মাসখানেক পরে সে ফিরে এসে বলে মথুরাপুরীতে তাকে যেতে হয়নি।

মহারাজ কংস একজনকে পাঠিয়েছিলেন গিরিব্রজ নগরীতে। তার সঙ্গে মধ্য-পথে সাক্ষাৎ ঘটে যায়। সে বলে, সব ঠিক আছে। মথুরাপুরীতে শান্তি বিরাজ করছে।

জরাসন্ধ বিরক্ত হয়ে চরকে বলেন—আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম মহারাজ কংসের সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর মুখ থেকে সেখানকার সংবাদ এনে আমাকে জানাতে।

সে ভয়ে কম্পিত হয়। বলে—আমি এই মুহূর্তে আবার যাচ্ছি।

—থাক।

চরের কথা শুনে মহিষী শান্ত হন না। তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। জরাসন্ধকে বলেন—অনুজা ওখানে পৌঁছে আমাকে পত্র দেবে বলেছিল। কিন্তু পত্রও দিল না। আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। তুমি ভালভাবে জানার ব্যবস্থা কর। তুমি বলছ ওরা শান্তিতে আছে। এ শান্তি কেমন শান্তি যে একটা পত্রও দিতে পারে না? আমার মন অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত। তুমি আবার লোক পাঠাও। আমি মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি।

কংসের ওপর জরাসন্ধের ক্রোধ হয়। কাণ্ডজ্ঞানহীনের পরিচয় দিচ্ছেন তাঁর জামাতা। যুদ্ধ হোক আর শান্তি থাকুক, সংবাদ প্রেরণ করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিল। এবারে তিনি সংবাদ পাঠালেন না। ঋষিগিরির ব্যাঘ্রবধে রাজপুরীর সকলে তাঁর ওপর বিরক্ত হয়েছে একথা তিনি বুঝেছেন। আত্মসম্মানে আঘাত লাগা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই বলে এভাবে একেবারে সম্পর্কছিন্ন অবস্থায় থাকা উচিত হয়নি।

জরাসন্ধ যোগ্যতর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন মথুরায়। তিনি বলেছেন, কংসের সঙ্গে নিজে দেখা না করে এবং তাঁর মুখ থেকে সংবাদ না জেনে যেন সে না ফেরে। আর রাজকুমারী অনুজার স্বহস্তে লিখিত একটি পত্রও নিয়ে আসতে হবে তাকে। মথুরাপতিকে বলতে হবে অনুজার মাতা এই পত্র চেয়েছেন।

লোকটি চলে গেল। কিন্তু দু মাস অতিবাহিত হল সে আর ফিরল না। তখন মহারাজার মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। তিনি স্থির করলেন দুদিনের মধ্যে হর্ষ কিংবা ডিম্বককে সসৈন্যে পাঠাবেন মথুরাপুরীতে সঠিক সংবাদ আনয়নের জন্য।

আর তখনই ভয়ঙ্কর এক দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল রাজধানীতে। নিঃসঙ্গ এক অশ্বারোহী সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করে।

তার সর্বাঙ্গ ধূলিধুসরিত। সে ক্লান্ত। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে ছুটে এসেছে। অতিক্রম করেছে গভীর অরণ্য, দুর্গম পর্বত, নদী প্রান্তর। অশ্বকে যতটুকু বিশ্রাম দিতে বাধ্য হয়েছে ততটুকু দিয়েছে। অবশিষ্ট সময় অবিশ্রান্ত ছুটে এসেছে সে। প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব ভূতলশায়ী হল। তার দেহ কয়েকবার কেঁপে উঠল। তারপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

কিন্তু এই মৃত্যুর চেয়েও সর্বনাশা মৃত্যু ঘটে গিয়েছে মথুরায়। বহুদিন পূর্বেই কৃষ্ণের হস্তে মহারাজ কংস নিহত। এখানে সংবাদ প্রেরণের সমস্ত প্রচেষ্টা কৃষ্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অন্তঃপুরের আর্ত ক্রন্দন সমগ্র নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। মহিষী জ্ঞান হারালেন। সহদেব উন্মাদের মত বলতে থাকেন—আমি এর জন্য দায়ী। সেদিন আমার উচিত ছিল কংস ও ব্যাঘ্রের মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়া। আমি কাপুরুষ। ব্যাঘ্রকে বিশ্বাস করতে পারিনি। ভেবেছিলাম বুঝি আক্রান্ত হব। আমি নিজে ভগিনীদ্বয়ের বৈধব্যের জন্য দায়ী। ভাই ধৃষ্টকেতু, তুমি আমাকে এই মুহূর্তে বধ করে তোমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক কর।

শোকাহত ধৃষ্টকেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গায়ে হাত রেখে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

মহারাজ জরাসন্ধ স্তব্ধ। অশ্বারোহী একটি পত্র মহারাজের হস্তে দিয়েছিল সেটি তাঁর হস্তেই ধৃত ছিল। তিনি বিমূঢ়। তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষে এই বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। তবু একবার তাঁর মনে হল, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পুরুষও এক এক সময় কত অসহায়।

ধীরে ধীরে তিনি পত্রটি খুললেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা অনুজার হস্তাক্ষর:

পিতা কতদিন হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আমাদের সংবাদ না পেয়ে আপনি খোঁজ নেবেন। নিলেন না। শত চেষ্টা করেও আমি কোন সংবাদ প্রেরণ করতে পারিনি। এই পত্র পাবেন কিনা নিশ্চয়তা নেই। আপনার দুই কন্যা স্বামীহারা। এই অল্প বয়সে বৈধব্যের নিদারুণ জ্বালায় আমরা উভয়ে দগ্ধ হচ্ছি। আজীবন এই জ্বালা সহ্য করতে হবে। অদৃষ্টের লিখন। তবু তার মধ্যে আপনি পারেন আমাদের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে। হ্যাঁ, আপনিই শুধু পারেন। প্রতিশোধ—আমাদের স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নিন। ওই কৃষ্ণ আর বলরামকে পরাজিত করুন। হত্যা করুন। আপনি এই বিশাল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। পারবেন না আপনি প্রতিশোধ নিতে? পারবেন না? আপনার কন্যাদ্বয়ের মুখ চেয়েও পারবেন না? আপনি যদি না পারেন আমরা যমুনার জলে জীবন বিসর্জন দিয়ে শান্তির পথ খুঁজে নেব।...

জরাসন্ধ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন পত্রখানির দিকে। পার্শ্বে ভূলুণ্ঠিত তাঁর মহিষীর অচেতন দেহ। দুই পুত্রবধূ তাদের শ্বশ্রূমাতার শুশ্রূষায় রত। তারাও ক্রন্দনরত। এসব কিছুই জরাসন্ধের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিছুই তাঁর কর্ণগোচর হচ্ছে না। পত্রখানির ভেতরে তাঁর দুই কন্যার মুখ ভেসে ওঠে। এই তো কিছুদিন পূর্বেও তাদের কোলে করেছেন।

জরাসন্ধ শোকে ক্রোধে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। সমস্ত রাজপুরী কম্পিত হল সেই হুঙ্কারে। সেই ধ্বনি বাইরে ভেসে গেল।

জরাসন্ধ মহিষীর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বলে উঠলেন—প্রতিশোধ। আমার দুই কন্যার বৈধব্যের প্রতিশোধ চাই। ধৃষ্টকেতু তুমি হর্ষ আর ডিম্বককে অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণ কর। তারা যেন দুদিনের মধ্যে তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে এসে পৌছয়। তারা একাই কৃষ্ণ বলরামকে সংহারে সক্ষম। আর সহদেব, তুমি তেইশ অক্ষৌহিণীর ব্যবস্থা কর। ঠিক সাতদিনের দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। হস্তী, অশ্ব, রথ সমস্ত কিছুর সমাবেশ যেন হয় গিরিব্রজ নগরী থেকে বহির্গমনের পঞ্চম দ্বারের বহির্ভাগে বিশাল প্রান্তরে। ইতিমধ্যে পদাতিকবাহিনী সংগ্রহ করার জন্য ঘোষণা করে দাও। আমি কৃষ্ণ বলরামের ধ্বংস চাই।

এই কথা বলে তিনি অন্তঃপুরের বাইরে এসে মথুরা থেকে আগত অশ্বারোহীকে তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে পাঠালেন। এমন একজন সাধারণ মানুষকে এর আগে কখনো এই কক্ষে আনা হয়নি। অশ্বারোহী ক্লান্ত কিন্তু সংযত। তার চেহারা গাম্ভীর্যপূর্ণ। তার দেহ-সৌষ্ঠব প্রশংসার যোগ্য। তবু তার গাম্ভীর্য সামান্য একটু টলে ওঠে। শত হলেও সে একাকী এসে দাঁড়িয়েছে পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী মহারাজ জরাসন্ধের সম্মুখে।

—তুমি কি সাধারণ সৈনিক মাত্র?

—আমি মথুরারাজ কংসের গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান ছিলাম।

এত শোকের মধ্যেও জরাসন্ধ বিস্মিত না হয়ে পারেন না। অশ্বারোহী তরুণ। এই বয়সে এত গুরুত্বপূর্ণ পদে যখন অধিষ্ঠিত ছিল, নিশ্চয় সে সামান্য নয়।

তিনি অশ্বারোহীকে বলেন—তুমি ক্লান্ত। প্রাসাদের যা অবস্থা, তোমার কাছে কখন খাদ্য পৌছবে বলতে পারছি না। হয়ত অভুক্ত রয়েছ বহুক্ষণ। তুমি আসন গ্রহণ কর। আমি তোমার কাছ থেকে সবটুকু জেনে নিতে চাই।

অশ্বারোহী নিঃসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করে। তারপর সে বলে—যাদবগণ যে মথুরাপুরী আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে সেই আভাস মহারাজ কংস আপনার এখানে আগমনের পুর্বে আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিত ছিলাম না তখনো।

—তবে কেন তাঁকে বললে না ?

—বলেছিলাম মহারাজ। কিন্তু এখানে আসার প্রস্তুতিপর্ব বহুদিন থেকে শুরু হয়েছিল। মহারাজা এবং মহিষীরা অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। উনি যাদবগণকে সব সময় হেয় চোখে দেখতেন।

—তারপর ?

—প্রকৃতপক্ষে যাদবগণের মথুরাপুরী অধিকারের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মহারাজকে বিনাশ করা। তাই এমন উদ্যোগ আয়োজন শুরু করল, যাতে মহারাজ এখানে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ওদের আয়োজন দেখে আমি সংবাদ না পাঠিয়ে পারলাম না।

—অর্থাৎ কংস এখান থেকে না গেলে মথুরাপুরী আক্রান্ত হত না।

—হয়ত হতো, আবার নাও হতে পারত।

জরাসন্ধ খেদোক্তি করলেন—আর তুমি হলে গুপ্তচর বাহিনীর অধিনায়ক !

অশ্বারোহী নীরব থাকে।

শেষে জরাসন্ধ নিজেই বলেন—তোমার প্রতি দোষারোপ করে কোন লাভ নেই জানি। সবই বিধিলিপি। তাছাড়া ওদেরও লোক রয়েছে যাতে তোমরা বিভ্রান্ত হও।

—হ্যাঁ আছে। তবে আপনি যথার্থ বলেছেন। আমার অপদার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। অন্য কেউ আমার স্থলে থাকলে মহারাজকে দীর্ঘদিন এই গিরিব্রজে থেকে যাবার পরামর্শ দিতে পারত হয়ত। কৃষ্ণ মথুরাপুরী অধিকার নাও করতে পারতেন।

—তুমি অপদার্থ নও। আমার ধারণা, কৃষ্ণ অত্যন্ত কৌশলী। তুমি তার কূটকৌশলের কাছে পরাস্ত হয়েছ।

সদ্য বিধবা দুই কন্যার মুখচ্ছবি তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠলেও জরাসন্ধ এখন ধীর স্থির সংযত। অশ্বারোহীকে তিনি বিশ্রামাগারে যেতে বললেন। বললেন সে যেন কদিন রাজধানীতে অপেক্ষা করে। তিনি মথুরানগরী আক্রমণে যাত্রা করবেন কদিন পরে। তখন সে তাঁর সঙ্গী হবে। ইতিমধ্যে সে যেন তাঁর

সেনাপতিদ্বয় হর্ষ ও ডিম্বককে ওখানকার পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলে।

অশ্বারোহী আনত হয়ে মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে মন্ত্রণাকক্ষ পরিত্যাগ করে।

সারা মগধরাজ্যে সাজসাজ রব পড়ে গেল। পদাতিক সৈন্য সংগৃহীত হতে লাগল। ওদিকে মেঘবর্ণের বিশালাকায় হস্তীদল এবং শত শত স্বাস্থ্যসম্পন্ন অশ্বের গাত্র মার্জন শুরু হল। পদাতিক সৈন্যদের বর্ম তরবারি বল্লম ইত্যাদি সরবরাহ করা হল। তারা সেগুলি স্ব স্ব গৃহে কিংবা আবাসস্থলে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করল।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা শুরু হল। সর্বপ্রথমে অতি মনোরম রথারূঢ় অবস্থায় মহারাজাধিরাজ জরাসন্ধ। অন্য দুটি রথে রয়েছেন হর্ষ ও ডিম্বক। দুই রাজকুমার সহদেব ও ধৃষ্টকেতু দুটি পিঙ্গলবর্ণের অশ্বে চলেছেন রথের পাশে পাশে। তাঁদের একজনের অধীনে রয়েছে অশ্ববাহিনী। এঁদের পশ্চাতে সর্বপ্রথম হস্তী; তারপর অশ্ব এবং সর্বশেষে পদাতিকবাহিনী। হস্তীদের সুন্দর সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। মগধবাসীরা দু নয়ন ভরে দেখল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাল, তাদের রাজার অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়। দুই রাজকন্যার ভাগ্যের কথা ভেবে তাদের নয়ন সিক্ত হয়।

ওদিকে এই বিশাল সৈন্যদলের অগ্রগমনের সংবাদ কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় বসে পেলেন। কৃষ্ণকে রীতিমত চিন্তান্বিত বলে মনে হল। তিনি ভালভাবে জানেন, এবারে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম করতে হবে। ওদের তুলনায় তাঁরা অকিঞ্চিৎকর। জরাসন্ধ এসে নিশ্চয় মথুরা অবরোধ করে বসে থাকবেন। নগরীতে খাদ্যাভাব দেখা দেবে। তখন?

বলরামকে অতটা চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হল না। তিনি বললেন, ওরা অবরোধ করার আগেই ওদের যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনতে হবে। প্রথমেই প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে ওদের বিচলিত করে দিতে হবে। শত্রুসৈন্যের মনে প্রথমে ভীতির সঞ্চার করতে পারলে ওরা তেমন কিছু করতে পারবে না।

কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের যুদ্ধকৌশল ঠিক করে নিয়ে সেইভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন। আর মথুরার রাজপ্রাসাদের বাতায়ন পথে সদ্য দুই বিধবা কৃষ্ণের ক্রিয়াকৌশল অবলোকন করতে লাগল। তাদের মুখ কঠোর হল। পিতার ওপর তাদের অগাধ আস্থা। পিতার আক্রমণের প্রচণ্ডতা প্রতিহত করার সাধ্য এই

দুই অর্বাচীনের হবে কিনা সন্দেহ।

ওদিকে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারার মত এগিয়ে আসতে থাকে মগধরাজের অক্ষৌহিণী। যমুনা নদীর খেয়া পারাপার বন্ধ। মগধরাজের অগ্রগমনের পথে যত নদ নদী রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির সমুদয় নৌকাকে টেনে টেনে ডাঙায় তুলে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। শত্রু সৈন্য যাতে নৌযানের কোনরকম সহায়তা না পায়।

কিন্তু জরাসন্ধের নিকট কোন বাধাই বাধা নয়। তিনি একই গতিতে মথুরার নিকটবর্তী হতে থাকেন। গুপ্তচরেরা ঘন ঘন কৃষ্ণ বলরামের কাছে সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে শত্রুসৈন্যের অগ্রগতি জানাবার জন্য। তাদের মুখে ভীতিভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট। তারা এতবড় সেনাবাহিনী স্বচক্ষে দেখা তো দূরের কথা, কল্পনাতেও কখনো আনতে পারেনি। আর ওই হস্তীযূথ? যেন এক একটি সচল পর্বত। সেই সব হস্তীর বৃংহন আর অসংখ্য অশ্বের হ্রেষারব দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করছে। গুপ্তচরেরা দূর থেকে দেখেই দুরু দুরু বক্ষে বারবার কৃষ্ণ বলরামের কাছে ছুটে ছুটে এসে বলছে কি কি দেখল।

কৃষ্ণ হেসে তাদের বলেন—তোমরা ভীত হয়ো না। নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমাদের কর্তব্য করে যাও।

তারা তরুণ অধিনায়কের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়। তবু মনে শঙ্কা থেকে যায়। কৃষ্ণের গুণাবলীর কথা তাদের অজানা নয়। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ছুটে আসছে যে চমু, তাদের একটি মাত্র তরুণের নৈপুণ্য কি রোধ করতে পারবে? মনে হয় না।

কৃষ্ণ তখন অপেক্ষা করছিলেন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজন্যবর্গের আগমনের জন্য। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছেন, তাঁরা যেন তাঁদের সৈন্য নিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়ে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন। তিনি তাঁদের পুরুষানুক্রমিক মনোভাব জানতেন। তাই তাঁদের প্ররোচিত করার জন্য বলে পাঠিয়েছিলেন যে এই যুদ্ধ—সম্মানের যুদ্ধ—উত্তর ভারতের সম্মান। কংস ছিলেন উত্তর ভারতের কলঙ্ক। তাই তিনি মগধরাজের জামাতা হতে সম্মত হয়েছিলেন, যে মগধবাসীদের আর্যত্বে অনেক খাদ আছে। ওরা বলতে গেলে ব্রাত্য। এমন কি মগধের অতি সন্নিকটে গঙ্গার তীরস্থ মিথিলার ব্রাহ্মণগণও নদী অতিক্রম করতে চায় না ব্রাহ্মণত্বের …ারাবার আশঙ্কায়।

এখন ধীর

বললেন সে

যাত্রা করবেন

উদ্দেশ্য মোটামুটি সিদ্ধ হল। সকলে না এলেও অধিকাংশ রাজা

সসৈন্যে এসে উপস্থিত হলেন জরাসন্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিলাষে। মনে তাঁদেরও যে শঙ্কা না ছিল তা নয়। তবু সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারায় সেই শঙ্কা অতটা উগ্রভাবে প্রকাশ পেল না।

ওদিকে জরাসন্ধ মথুরার প্রায় নিকটবর্তী হয়েছেন। আর মাত্র একদিনের পথ। আকাশে মেঘের সঞ্চার মাঝে মাঝে হলেও বর্ষণ এখনো শুরু হয়নি। তবে বর্ষা আগতপ্রায়। কারণ নদীগুলি এরই মধ্যে স্ফীত হয়ে উঠেছে। এমনকি যমুনার জলও আর স্বচ্ছ নেই। বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেলে যথেষ্ট অসুবিধা হত।

রাত্রি যাপনের জন্য যমুনার তীরে একটি নির্বাচিত স্থানে শিবির স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন জরাসন্ধ। পরদিন এখান থেকে প্রত্যুষে যাত্রা করলে মধ্যাহ্নের পরে মথুরাপুরীতে পৌছে যাবার কথা। শিবির শ্রেণীর পার্শ্বে কদম্ব বন। সেখানে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। তার সুঘ্রাণে চতুর্দিক আমোদিত। যেন বর্ষার আগমন বার্তা ঘোষণা করছে।

হর্ষ ও ডিম্বক এসে শিবিরে প্রবেশ করেন। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁদের উপবেশন করতে বলে প্রশ্ন করেন—কেমন মনে হচ্ছে? সর্বশেষ সন্দেশ কি?

হর্ষ বলেন—কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণ অনেক রাজাকে একত্রিত করেছেন শুনলাম।

—হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।

ডিম্বক বলেন—তাতে কিছু এসে যায় না। আমাদের সৈন্য সংখ্যা তবুও অনেক গুণ বেশী।

জরাসন্ধ হেসে প্রশ্ন করেন—বুদ্ধিবল?

ডিম্বক একটু উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন—বুদ্ধিবলের প্রমাণ পাওয়া যাবে যুদ্ধক্ষেত্রে।

এরপর যুদ্ধের পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। কারণ আলোচনার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। চরেরা ঘন ঘন সংবাদ নিয়ে আসছে। তারা সবিস্তারে বলে কোন্ কোন্ রাজা কোথায় তাঁদের সৈন্য সমাবেশ করেছেন। তারা বলে বলরাম সবার আগে রয়েছেন। তিনি এক অদ্ভুত ধরনের ব্যূহ রচনা করেছেন। দেখতে ত্রিশূলাকৃতি।

হংস একথা শুনে প্রশ্ন করেন—ডিম্বক, এই ব্যূহের অর্থ কি?

ডিম্বক একটু চিন্তা করে বলেন—মনে হয়, বলরাম মরিয়া হয়ে আক্রমণ করবেন। সাধারণ রণে ওই ধরনের ব্যূহ অবশ্যই কার্যকরী হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনী বিশাল। এখানে শেষ পর্যন্ত উনি ব্যর্থ হবেন এবং হতাশায় ভুগবেন।

জরাসন্ধ জানতেন, শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে যে তিনি সোজা এসে মথুরাপুরী অবরোধ করবেন। সেই ধরনের কিছু ইঙ্গিত তিনি শত্রুদের দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমাবধি তিনি স্থির করে ফেলেছিলেন, অবরোধ নয়, যুদ্ধ। ফলে তৃতীয় দিবসে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

শিঙার উচ্চ নিনাদ ও ভেরী নির্ঘোষে রণস্থল প্রকম্পিত হতে থাকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আহত সৈন্যদের আর্তনাদে সেই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ ও রক্তাক্ত রূপ ধারণ করে। হস্তী অশ্ব ও পদাতিকের পদভরে মেদিনী কাঁপাতে থাকে।

সেই সময় জরাসন্ধ ও তাঁর সেনানায়কগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন যে বলরাম তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মগধ বাহিনীর একটি অংশ ভেদ করে ভেতরে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বচালিত রথে আরূঢ়, তাঁর পশ্চাতে অশ্বারোহীরা বিদ্যুৎগতিতে উন্মুক্ত অসিহস্তে বীভৎস চিৎকার করতে করতে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মগধ-বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হল। তারা দিশাহারা হয়ে পশ্চাদপসরণ শুরু করে। ধৃষ্টকেতু আর ডিম্বক তাদের মধ্যে ছোটাছুটি করে অভয় দান করায় শৃঙ্খলা কিছুটা ফিরে আসে। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই এই দশা দেখে জরাসন্ধ অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। বুঝলেন দোষ তাঁরই। বলরামের ত্রিশূলাকৃতি ব্যূহ রচনার কথা শ্রবণ করেও তিনি গুরুত্ব দেননি। শত্রু যত ক্ষুদ্রশক্তিরই হোক না কেন, তাকে হেয় চোখে দেখতে নেই একথা তাঁর অজ্ঞাত নয়, কিন্তু মর্মে মর্মে এভাবে পূর্বে কখনো অনুভব করেননি।

দ্বিপ্রহরের পরে যুদ্ধের গতি ধীরে ধীরে জরাসন্ধের স্বপক্ষে ঘুরে এল। বলরাম মগধবাহিনীর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বিধ্বস্ত করে দিয়ে ফিরে গিয়েছেন পুনরায় সৈন্যবাহিনীকে সজ্জিত করে নিতে। কিন্তু অন্যান্য নরপতিগণ খুব সুবিধা করে উঠতে পারেন না। দু-একজনের পতনও ঘটেছে।

মথুরার প্রাসাদ থেকে রণস্থল অনেকদূর। তবু অস্পষ্ট রণধ্বনি ভেসে আসে। কংসের পত্নীদ্বয় উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। তারা তাদের পিতার জন্য আকুল প্রতীক্ষারত। পিতার সৈন্যদলকে প্রতিহত করতে পারে এমন শক্তি ত্রিভুবনে আছে বলে তারা বিশ্বাস করে না। তবু যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি জানার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কে এনে দেবে সঠিক সংবাদ? কেউ মুখে তাদের কিছু না বললেও, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা

বন্দিনী।

এদিকে কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছুটা দূরে একটু সুউচ্চ প্রস্তরের ওপরে উপবেশন করে সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। বলরামের সাহস আর বীরত্বে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এক সময় মনে হয়েছিল, বলরামের অনুমানই সঠিক। প্রথমেই আকস্মিক আঘাতে মগধসৈন্য বুঝি হতচকিত অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু শত্রুপক্ষে রয়েছেন হংস আর ডিম্বকের মত ভারতবিখ্যাত যুদ্ধবিশারদ। আর তারাও ব্যর্থ হলে সবার ওপরে রয়েছেন স্বয়ং জরাসন্ধ। সুতরাং যা আশঙ্কা করেছিলেন কৃষ্ণ, তাই ঘটতে চলেছে। তাঁর পক্ষ পরাজয়ের সম্মুখীন। বলরাম তাঁর কর্তব্য সুন্দরভাবে সমাধা করে এলেও, শত্রুসৈন্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে এল ধীরে ধীরে।

সেই সময় কৃষ্ণের নিকট সংবাদ এল জরাসন্ধের সঙ্গে সেনাপতি হংস ছাড়াও, হংস নামে আর এক যে নৃপতি এসেছিলেন তিনি বলরামকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন একটু আশার আলো দেখা গিয়েছে। নৃপতি হংসের মৃত্যুকে যদি জরাসন্ধের সেনাপতি হংসের মৃত্যু বলে রটনা করে দেওয়া যায়, তাহলে তাঁর সৈন্যদল হতোদ্যম হয়ে পড়বে। ফলে শত্রুবাহিনীর সবাই মনোবল হারাবে। তিনি তাঁর অসম সাহসী একশত সৈন্যকে ডেকে বললেন যে শত্রুসেনার ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তারপর তাদের মধ্যে প্রচার করতে হবে যে হংস নিহত। কৃষ্ণের নির্দেশ পেয়ে এরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ছদ্মবেশ ধারণের জন্য। তারপর রণাঙ্গনে প্রবেশ করে শত্রুসৈন্যদের মধ্যে গিয়ে চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল যে হংস আর নেই, তাঁর পতন হয়েছে।

কৃষ্ণ সেই উচ্চাসন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হল। যুদ্ধ আগের মত চলতে থাকে। শত্রুরা নিশ্চিত ভাবে এগিয়ে আসছে। আর বিশেষ বিলম্ব নেই। তবে কি হংসের মৃত্যুসংবাদ প্রচারে ওরা ব্যর্থ হল?

ঠিক সেই সময়—

একজন অশ্বারোহী ছুটে এসে বলে—ওদের সেনাপতি হংসের পতন হয়েছে। ওদের সৈন্যরা বলাবলি করছে, তারা খুব ভয় পেয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল সেনাপতি হংস অজেয়।

কৃষ্ণ মৃদু হেসে বলেন—ঠিক আছে।

অশ্বারোহী কৃষ্ণকে সসম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেয়। কৃষ্ণ চেয়ে

রইলেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। একটু যেন পরিবর্তন ঘটছে। শত্রুপক্ষীয়রা আগের মত আর আক্রমণাত্মক নয়। তাদের অগ্রগমনের গতি আগের মত আর নেই, একটু যেন শিথিল হয়েছে। একটা বিশৃঙ্খলার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে দূর থেকে।

যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগে একটি শিবিরে জরাসন্ধ শোকস্তব্ধ। হংসের এত সহজে পতন ঘটল! বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে হংসকে এভাবে নিহত করা কারও সাধ্যায়ত্ত নয়। মৃত্যু এত সহজে তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু কি সেই দুর্ঘটনা!

পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্ফীত যমুনার বারিধারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন জরাসন্ধ। হংস তাঁর শক্তির অন্যতম উৎসস্থল। শক্তির অনেকখানি আজ চলে গেল। মনের মধ্যে একটা শূন্যতাবোধ অনুভূত হয়। একটা অঙ্গহানি ঘটে গিয়েছে যেন। একটা হাহাকার।

সেই সময় সেনানায়ক ডিম্বক ছুটে আসেন। তাঁর মত স্থিতধী ব্যক্তিও নিজের ওপর আয়ত্ত হারিয়ে ফেলেছেন। উন্মাদের মত আচরণ করছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখেই জরাসন্ধ বুঝেছিলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনে ডিম্বক আসছে তাঁর কাছে। হংস আর ডিম্বক উভয়ে উভয়ের প্রিয়তম সুহৃদ। তারা জানত জীবনে ও মরণে তাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন অটুট থাকবে। সুতরাং হংসের মৃত্যুজনিত আঘাত প্রচণ্ডভাবে বেজেছে ডিম্বকের হৃদয়ে।

উন্মাদের মত এসে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—মহারাজ, এ সংবাদ কি সত্য?

জরাসন্ধ অত্যন্ত স্তিমিত কণ্ঠে বলেন—আমি চাক্ষুষ দেখিনি। তোমার মত আমিও শুনেছি। সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য লোক পাঠিয়েছি।

—মহারাজ, আমি চললাম।

জরাসন্ধ ডিম্বকের দৃষ্টির অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—কোথায় যাবে? একটু অপেক্ষা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু রটনা করা হয়। সব কিন্তু সত্য হয় না। তুমি গেলে মগধ সৈন্যের ভার কে নেবে?

—মহারাজ, হংসের মৃত্যুসংবাদ অসত্য হলে এতক্ষণে সে নিজেই আসত। আমি চললাম।

—কোথায়?

—হংসের কাছে। সে আর আমি সারা জীবন পাশাপাশি থেকেছি, মৃত্যুর

পরেও থাকব। ওকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই মহারাজ। বিদায়।

জরাসন্ধ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন—ডিম্বক অবুঝ হয়ো না। আমি তোমার রাজা, আদেশ দিচ্ছি। সঠিক খবর আসতে দাও।

ডিম্বক ততক্ষণে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন যমুনার তীরে এবং কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ ও বর্মপরিহিত দেহে যমুনার জলে লাফ দেন। ওই ভারযুক্ত দেহে নিমেষে তলিয়ে যান। অতি নিপুণ সন্তরণকারীও ওই বর্মপরিহিত অবস্থায় ভাসমান থাকতে পারে না। তাছাড়া যমুনা এখন বর্ষার প্রাক্কালে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্তা। তার বারিরাশিও অন্য সময়ের মত স্বচ্ছ নয়। অসংখ্য নৌযান নিযুক্ত করা হল, যাতে তাঁর দেহটির অন্তত সন্ধান মেলে।

দুজনেই চলে গেল। একেই বলে বোধ হয় নিয়তি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পট পরিবর্তন হয়ে গেল। বিজয়লক্ষ্মী আজকের মত মুখ ফিরিয়ে নিলেন। জরাসন্ধ অদূরে দণ্ডায়মান সহদেবকে ডেকে বললেন—সৈন্যদের সংহত কর। ওদের ছত্রভঙ্গ হতে দিও না। নইলে, আগামীকাল আবার আক্রমণ করতে বিলম্ব হয়ে যাবে। অসুবিধাও হবে। আজ ওরা এত মুহ্যমান যে আমি নিজে গিয়ে দাঁড়ালেও কিছু হবে না। এর মধ্যে ডিম্বকের সংবাদ জানলে কি হবে বুঝতেই পারছ।

সহদেব অশ্ব ছুটিয়ে চলে গেলেন। আর ঠিক সেই সময় জরাসন্ধ এবং উপস্থিত সৈন্যদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে ছুটে আসেন স্বয়ং হংস।

উত্তেজিত কণ্ঠে হংস জরাসন্ধকে প্রশ্ন করেন—মহারাজ ডিম্বক কোথায়?

জরাসন্ধ বোধ হয় জীবনে এই প্রথম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না। শেষে কোন রকমে বলেন—হংস, তুমি জীবিত?

—হ্যাঁ। এই তো দেখছেন মহারাজ আমাকে। আমিও শুনেছি আমার মৃত্যুসংবাদ। শুনেই সমস্ত সমরক্ষেত্র খুঁজে ফিরেছি ডিম্বককে। সে আমার মৃত্যুসংবাদ পেলে কি করবে জানি না। এখনেও নেই। কোথায় গেল? ও কি আমার অলীক মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে? পেলে ওকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আত্মহননের পথ বেছে নেবে। মহারাজ, আপনি কি জানেন ডিম্বক কোথায়?

—তুমি একটু স্থির হও হংস। আমি বলছি সব।

—আমাকে ক্ষমা করবেন মহারাজ। শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্থির হতে পারছি না।

জরাসন্ধের অন্তরে হা-হুতাশের ঝড় উঠেছে। অথচ বাইরে তিনি শান্ত। তিনি বুঝলেন সত্যকে বেশীক্ষণ গোপন রাখা যাবে না। আর গোপন রেখেই বা কি হবে? যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোন ভাবে হোক মৃত্যু ঘটতে পারে যে কোন ব্যক্তির!

ডিম্বকের দুর্ভাগ্য, তার মৃত্যু ঘটেছে অন্য ভাবে। যুদ্ধে অসাধারণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও শেষ সময়ে সে বীরত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নারীসুলভ আবেগকে সে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে। শত্রুসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করেও সে গৌরবের মৃত্যু বরণ করতে পারত। সেটা হত তার উপযুক্ত মৃত্যু। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে যেন পৃথিবী থেকে পালিয়ে গেল।

সেই সময় এক গুপ্তচর ছুটে এসে হংসকে উপস্থিত দেখে থমকে যায়। তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

জরাসন্ধ তার অবস্থা অনুমান করেন। তবু বলেন—কি সংবাদ এনেছ?

হংসকে দেখিয়ে সে বলে—মহারাজ আপনি জেনে গিয়েছেন যে উনি জীবিত। আমি এঁর সংবাদই এনেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে হত হয়েছেন আমাদের পক্ষের নৃপতি হংস।

জরাসন্ধ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন—হংস, আজ প্রমাণিত হল কৃষ্ণের বুদ্ধিবলের কাছে আজ, অন্তত যুদ্ধের প্রথম দিনে, আমরা পরাজিত। সে কৌশলে রটনা করেছিল, যাতে সবাই ভেবে নেয় তুমি মৃত। আগামীকাল আমাদের দ্বিগুণভাবে আক্রমণ করতে হবে। তোমাকে কাল আমার বড় প্রয়োজন।

—কিন্তু ডিম্বক কোথায় মহারাজ?

জরাসন্ধ বুঝতে পারেন, ডিম্বকের কথা গোপন রেখে লাভ নেই। বলে ফেলা শ্রেয়। তিনি বলেন—জান হংস, একজন বীরের যদি আত্মবিসর্জনের সাধ হয়, তাহলে তার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে রণভূমি। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মত মৃত্যু বরণ করা। তোমাকেও বলি, তেমন সময় এলে যুদ্ধক্ষেত্রকে মৃত্যুর জন্য বেছে নিও।

—মহারাজ, ডিম্বক কোথায়?

—সে নেই।

—নেই?

—না। সে পালিয়েছে।

—পালিয়েছে! ডিম্বক পালিয়েছে একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

—হ্যাঁ, তাই বলি। কারণ আমি স্বচক্ষে তাকে ভীরুর মত পালিয়ে যেতে দেখেছি।

—মহারাজ!

জরাসন্ধ ধরা গলায় বলেন—তাছাড়া কি বলব হংস? তোমার মৃত্যুসংবাদ শুনে তার উচিত ছিল শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। পরিবর্তে

কি করল সে ? ছুটে গিয়ে ওই যমুনার জলে ঝাঁপ দিল। জল অস্বচ্ছ। পাওয়া গেল না ওকে। তুমি যদি কয়েক মুহূর্তে আগে আসতে পারতে, এমন হত না তাহলে।

হংস নিম্নকণ্ঠে আপন মনে বলে চলেন—ডিম্বক যমুনায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে ! আমার জন্য ? আমি জানতাম একটা কিছু করবে। ও মূর্খ। এতটুকু ধৈর্য ধরতে পারল না। কি করে ও ভাবল, যুদ্ধ শুরু না হতে আমি নিহত হব ?

হংস এক পা এক পা করে যমুনার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ান। বলেন—এই যমুনায় ও আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

জরাসন্ধ সহদেবকে পাঠিয়েছিলেন হংসের সঙ্গে। তিনি বলেন—আপনি ফিরে চলুন। উনি চলে গেলেন। আজ আপনাকে মগধবাসীর বড় প্রয়োজন।

—আমাকে ? না না। মহারাজ জরাসন্ধের বিশাল বাহিনী এমনিতে অজেয়। এখানে সেনাপতির অভাব হবে না কখনো। কেউ এখানে অপরিহার্য নয়, রাজকুমার।

—আপনি শান্ত হন।

—শান্ত ! না না, ওই দেখুন ডিম্বক আমাকে ডাকছে। ডিম্বক আমি আসছি।

কিনারা থেকে সহসা হংস ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে। সহদেব অপ্রস্তুত। পাশে অনেকেই ছিল, কিন্তু সবাই বর্মপরিহিত। জীবন রক্ষা করার মত কেউ ছিল না। ডিম্বকের. দেহের অনুসন্ধানের জন্য নৌকোগুলো একটু নীচের দিকে চলে গিয়েছিল। হংসও মিলিয়ে গেলেন। ভারতভূমির দুই শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে যমুনার জলে আত্মঘাতী হলেন, শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে।

জরাসন্ধের মনে হল, তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তবে তিনি বুঝলেন ওঁদের এই আবেগ কোন না কোন সময়ে তাঁকে আরও কঠিন সমস্যায় মধ্যে ফেলতে পারত—আজ যেমন কিছুটা ফেলেছে। এঁরা দুজনে আদৌ নির্ভরযোগ্য ছিলেন না সেই প্রমাণ দিয়ে গেলেন। দেশের সম্মানের চেয়ে ব্যক্তিগত সম্বন্ধটা বড় হয়ে উঠল এঁদের কাছে। শোকে মুহ্যমান হয়েও জরাসন্ধ ভাবলেন, এ হয়ত ভালই হল একপক্ষে। তবে কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের নিশ্চেষ্টতা। তারপরেই জাগ্রত হলেন জরাসন্ধ। স্বীয় দুর্বলতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলেন। তিনি না ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ নরপতি ? এ

দৌর্বল্য তাঁর শোভা পায় না। অন্তরের ভেতরে কে যেন বলে উঠল, দুই কন্যাকে তুমি ভুলে গেলে জরাসন্ধ? তারা তাদের সর্বাঙ্গে সদ্যবৈধব্যের রিক্ততা নিয়ে তোমার জয়ের অপেক্ষায় কাল গুণছে, সেকথা কি মনে নেই? ওই অর্বাচীন কৃষ্ণের একটি চালে এত হতোদ্যম তুমি? ধিক্ তোমাকে। ওদের এক সভাকবি যেভাবে তোমার উদ্ভট জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করেছে তার কাব্যে, তুমি দেখছি ঠিক সেইভাবেই আজ দেহমনে দ্বিখণ্ডিত। তবে কি সত্যই তুমি দুই মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলে? তবে কি সত্যই জরা নামে নর-খাদক রাক্ষসী পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত তোমার মাতৃদ্বয়ের গর্ভজাত দেহের দুই অংশ খাওয়ার লালসায় হাতে তুলে নিতে, সেই অংশদ্বয় যুক্ত হয়ে যায়? তাই কি রাক্ষসী জরার নাম অনুযায়ী তোমার নাম হয়েছিল জরাসন্ধ? হায়, কত কৌশলেই না ওদের কবি কত বিকৃতভাবে তোমার জীবনেতিহাস তোমার জন্ম থেকে অঙ্কিত করতে শুরু করেছে। কোথায় যে এর শেষ হবে কে জানে। এ এক নাম না জানা কবির বিক্ষিপ্ত রচনা হতে পারে। কিন্তু এই সব অপবাদ যদি কোন প্রতিভাবান কবির সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে? তাহলে যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

মুহূর্তের জন্য জরাসন্ধের মনে পড়ে যায় সেই কবির কথা, প্রাসাদের কয়েকজন রক্ষীর হঠকারিতায় যে প্রাণ হারিয়েছিল ধৃষ্টকেতু আর মহাবলের সম্মুখে। সেই কবির নাম মনে পড়ে না। সে হয়ত উত্তর ভাগের কবিদের চেয়ে অনেক বেশী প্রতিভাধর ছিল। সে জীবিত থাকলে কৃষ্ণ বলরামকে যথেচ্ছভাবে চিত্রিত করতে পারত। যুদ্ধে যদি শেষ পর্যন্ত জয় হয়, এবং তা হবে, তাহলে বৃহৎ এক কাব্য রচনা করে ফেলত যাতে তিনি সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন। কিন্তু যা হবার নয় তা নিয়ে অনুশোচনা করে লাভ নেই। আজ বড় দুর্দিন তাঁর জীবনে। হংস আর ডিম্বক কেউই জীবিত রইল না। কৃষ্ণ একই সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ ও বাম হস্ত কেটে দিয়েছেন।

সহদেব, ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য সেনাপতিদের আপ্রাণ প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত পদাতিক বাহিনীকে সংহত করা সম্ভব হল। নইলে এতক্ষণে তারা শত্রুসেনাদের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হত।

দিবাবসানে মথুরাপুরীর সর্বত্র বিজয়োল্লাস পরিলক্ষিত হয়। আর এদিকে ধরণীর সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ভূপতির শিবির স্তব্ধ। যুদ্ধে সুনিপুণ দুই বৃহৎ সৈন্যদল তাদের স্ব স্ব দলপতিকে হারিয়ে অশ্রু ফেলছে। কে তাঁদের সান্ত্বনা দেবে? সান্ত্বনা দেবার ভাষা কোথায়?

মথুরার প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে অভাগিনী দুই ভগিনী ভূলুণ্ঠিতা। তাদের দেহ ক্রন্দনে কম্পমান। তাদের সহানুভূতি জানাতে কেউ উপস্থিত নেই। পুরাতন পরিচারিকারা দূর থেকে তাদের দেখছে। রাণীদের শোক দেখে তাদের মন বিগলিত। কিন্তু নিকটে যাবার সাহস নেই। প্রাসাদের নতুন অধিপতির মনোভাব তাদের জানা নেই। পূর্বতন দুই মহিষীকে সহানুভূতি দেখাতে গেলে তারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়? মন তাদের বেদনায় কাতর। কারণ এই দুই রাণী তাদের অনেক দিয়েছেন। এঁদের দুজনের ব্যবহারও ছিল বড়ই মধুর। কিন্তু তারা সামান্য দাসী। তাদের বিপদ পদে পদে। যে কোন অজুহাতে অতি সহজে তাদের নিশ্চিহ্ন করা যায়।

সৈন্যদের আনন্দ কোলাহল স্তিমিত হলে, সায়াহ্নে নিভৃতে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে বলভদ্র বলেন—আমরা আজকের রণে জয়ী। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বসেছিল। দুই রাজকুমার আর কয়েকজন সেনাপতি সেটা হতে দেয়নি। সহদেব আর ধৃষ্টকেতু তাদের পিতার মত না হলেও খুবই সুন্দর পরিচালন পদ্ধতি দেখাল।

কৃষ্ণ মাথা হেলিয়ে স্বীকার করেন সেকথা।

—কিন্তু কৃষ্ণ, প্রকৃত কারণটি এবারে বল তো।

—এর মূল কারণ, তো তুমি নিজে হলধর। তোমার ওই ভীষণ মারণাস্ত্র হলায়ুধ নিয়ে দিবসের প্রথম পর্বেই তুমি আমাদের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করে দিয়েছিলে। তারা বুঝে ফেলল, জরাসন্ধও অজেয় নয়।

বলভদ্র একটু ভেবে নিয়ে বলেন—না, একথা মানতে পারছি না। বীরবিক্রমে ধাবিত হয়ে মথুরাকে প্লাবিত করার উপক্রম করেছিল যে বাহিনী তারা হঠাৎ কিসের মন্ত্রে অমন নির্বিষ হয়ে গেল? একসঙ্গে তাদের সবার সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে কোন্ নিদারুণ আঘাত লাগল? কি করে? বল তো এবারে ভাই, আর কেউ না চিনুক, আমি তোমাকে বিলক্ষণ চিনি। শত হলেও তুমি আমার অনুজ।

কৃষ্ণ হাস্য সংবরণ করতে পারেন না। তিনি তখন এই জয়ের নেপথ্য কাহিনী বলরামের কাছে বিবৃত করে বলেন—তোমার হস্তে নৃপতি হংসের মৃত্যু হয়েছিল বলে আমরা জয়ী।

নীরবে বলরাম সব শোনেন। মনে মনে কৃষ্ণের প্রশংসা করেন। তারপর বলেন—আগামীকালের যুদ্ধের জন্যও একটা পন্থা চিন্তা করে রেখ। আমার ধারণা এই যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

—আমি অতটা স্থিরনিশ্চয় নই। আমি বরং অন্য চিন্তা করছি।

—কি চিন্তা ?

—আমি ভাবছি, পিতাকে বলব আমাদের পরিবার এবং সমস্ত যাদবকুলকে এখান থেকে দূরে, বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে—জরাসন্ধের হাত যেখানে পৌছবে না।

—তুমি এতটা ভীত ?

—একে ভয় বললে ভুল হবে। এটা বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া। আমরা কোনমতেই জরাসন্ধের সমকক্ষ নই। পিতার বয়স হয়েছে। তাঁকে এবং যদুবংশকে নিরুপদ্রবে থাকতে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

—সেই অতি আকাঙ্ক্ষিত স্থানটি কোথায় ?

—দ্বারকা।

বিস্মিত বলরাম বলে ওঠেন—দ্বারকা? সে কি এখানে? সে যে ভারত-ভূমির শেষ প্রান্তে।

—হ্যাঁ, বহুদূরে।

—অর্থাৎ যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র আশাবাদী নও।

কৃষ্ণ কোন উত্তর দেন না।

পরদিন উষালগ্ন অতিক্রান্ত হতে না হতে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কৃষ্ণ বলরামকে পরামর্শ দিয়েছিলেন গতকালের সেই একই কৌশল থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু বলভদ্র পূর্বদিনের বিজয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। একইভাবে তিনি শত্রুসৈন্যের দিকে ধেয়ে গেলেন। দেখা গেল, তাঁর গতি দেখে শত্রুসৈন্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। বলরাম হৃষ্টচিত্তে দেখলেন ওরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে পথ করে দিয়েছে। একটু ভেতরে ঢুকতেই প্রমাদ গনলেন তিনি। দেখলেন, তাঁর সামান্য সংখ্যক সৈন্য ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র দ্বিধাবিভক্ত শত্রুবাহিনী আবার এক হয়ে গেল। অর্থাৎ পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। অধিকাংশ সৈন্য তাঁর বাইরে পড়ে রইল এবং তিনি শত্রুবেষ্টিত। দেখলেন, তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ সম্রাট জরাসন্ধ।

বলরামের রথের সারথির হস্তদ্বয় কম্পিত হল। রথের অশ্ব শত্রুর অস্ত্রের ক্রমাগত আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। একটু পরে ভূতলশায়ী হবে। বলরাম অনন্যোপায় হয়ে হলায়ুধ হস্তে রথের পশ্চাতে লম্ফপ্রদান করলেন এবং তাঁর সামান্যসংখক সৈন্য নিয়ে কোনরকমে শত্রুব্যূহের বাইরে এসে একজন সৈন্যের অশ্ব নিয়ে দ্রুত

পলায়ন করলেন। জরাসন্ধ সব দেখেও নিশ্চেষ্ট। হয়ত বলরামের অবস্থা অবলোকন করে তাঁর চিত্তে অনুকম্পার উদ্রেক হল। কিংবা তিনি নিজ হস্তে শুধু একজনকেই বধ করতে চান যে তাঁর জামাতার প্রকৃত হত্যাকারী। কিংবা কোন অদৃশ্য শক্তি বলরামকে ওই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করল। প্রকৃত ঘটনা জরাসন্ধ কিংবা অদৃষ্ট ব্যতীত কেউ জানল না।

কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হয়ে ঘটনার কথা জানালে তিনি বললেন—আমি এই রকম অনুমান করেছিলাম। কিন্তু জরাসন্ধ কেন তোমাকে নিষ্কৃতি দিল ?

—বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে তোমার আবার কোন কৌশল আছে নাকি ?

কৃষ্ণ মৃদু হেসে বলেন—মূল্যবান কথা বলেছ দেখছি।

বলরামের মুখে কিন্তু হাসি নেই। সদ্য পরাজিত হয়ে তিনি এক ধরনের জ্বালায় জ্বলতে থাকেন। এ পরাজয় সামান্য নয়। সারথী এবং রথকে শত্রুপক্ষের হস্তে এভাবে উৎসর্গ করে দিয়ে আসা কাপুরুষতার চূড়ান্ত নিদর্শন। রথের অশ্ব হত হয়েছে। সারথীও নিহত হয়েছে কিনা জানা নেই। বহুদিনের বিশ্বস্ত সারথী—সুখদুঃখের সাথী। সৈন্যদলের অধিকাংশ হতাহত। তাঁর পক্ষে নবোদ্যমে আক্রমণের উপায় নেই আজ। নিজেকে মূর্খ ভাবেন বলরাম। জরাসন্ধ কংস নয়।

কৃষ্ণের হাসি তাঁর সহ্য হয় না। গম্ভীর হয়ে বলেন—এবারে করণীয় কি ?

—ওপক্ষে আজ হংস আর ডিম্বক নেই।

—জানি। তাই বলে জরাসন্ধকে এতটুকু হতাশ দেখলাম না।

—আমি জানি, তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বলছ। যাব আমি। তুমি আমার অগ্রজ। তোমার কথা অমান্য করার সাধ্য আমার নেই। তবে তুমি পিতার কাছে যাও। তাঁকে এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে আজ দিবাবসানের মধ্যে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রার ব্যবস্থা কর। আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

বিস্মিত বলরাম কৃষ্ণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন—তবে কি আমাকে ধরে নিতে হবে যে তুমিও জরাসন্ধের হস্তে পরাজিত হবে ?

—আমি জয়পরাজয়ের কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি, আজ সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যাতারা উদয়ের কিছুক্ষণের মধ্যে যাদবগণের যাত্রা শুরু করতে হবে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

—আর জরাসন্ধ ?

—জরাসন্ধ যা করে করুক। সে মথুরাপুরীতে প্রবেশ করে কন্যাদ্বয়কে উদ্ধার করুক। সেখানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক। তারপর মগধ রাজ্যে ফিরে যাক। ততক্ষণে পিতা বাসুদেব সমস্ত যাদবকুলকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকার পথে বহুদূর চলে যাবেন।

হতাশায়, অনুশোচনায়, বিরক্তিতে বলরাম বলে ওঠেন—তুমি কৃষ্ণ, তোমার মুখে শেষে একথা শুনতে হল? তোমাকে বৃন্দাবনবাসী ও মথুরাবাসীরা তাদের হৃদয়ের কোথায় স্থান দিয়েছে তুমি জান না? এভাবে তুমি ওই পূর্ব দেশের নৃপতির হস্তে পরাজয় স্বীকার করে নেবে? আর একবার ভেবে দেখ কৃষ্ণ। আমাদের সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে এতে।

—সম্মান? কথাটা ঠিক বলেছ। জীবিত থাকলে সম্মান পুনরুদ্ধারের একাধিক সুযোগ পাওয়া যায়, মরলে নয়। আগে যাদবদের বাঁচতে দাও, তারপর সম্মানের কথা চিন্তা করা যাবে। অনেক সময় রয়েছে ওসব ভাবার।

বলরাম স্তব্ধ। তাঁর কথা বলার প্রবৃত্তি চলে যায়।

—দুঃখ কর না হলায়ুধ। আমি প্রাণপণে মগধরাজকে নিবৃত্ত রাখব যাতে তার মথুরায় প্রবেশ বিলম্বিত হয়। তুমি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করে ফেল।

পরাজিত সেনানায়কের ন্যায় বলভদ্র অধোবদনে স্থানত্যাগ করেন। কৃষ্ণের চেয়ে তিনি বয়সে বড়, কিন্তু মনেপ্রাণে জানেন, বুদ্ধিবলে, রণবিদ্যায় কূট-নীতিতে কৃষ্ণ অনেক এগিয়ে। সে তুলনাহীন।

কৃষ্ণ সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়ে জরাসন্ধের সৈন্যদলের অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করে চললেন। যেখানেই শত্রুপক্ষ তীক্ষ্ণ ফলার মত এগিয়ে আসে, সেখানে ছুটে গিয়ে তীক্ষ্ণ অংশটি ছিন্ন করে দেন তিনি। জরাসন্ধ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। শত শত শত্রুকে নিধন করেও প্রত্যাশিত অগ্রগমন কেন হচ্ছে না? কৃষ্ণের কৌশল অনেকটাই তিনি ধরতে পারেননি। তারপর এক সময় মনে জাগে সন্দেহ। তিনি স্বীয় সৈন্যদল থেকে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। আর তখনি তিনি বুঝতে পারেন, কী অসাধারণ চাতুর্যের পথ অবলম্বন করেছেন কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণের উদ্দেশ্য কি? এভাবে তিনি কতক্ষণ মগধবাহিনীকে প্রতিহত করে রাখতে পারবেন? তারপর? একসময় তো তাঁকে পথ ছেড়ে দিতেই হবে।

জরাসন্ধকে দূরে সরে যেতে দেখে, কৃষ্ণ বুঝলেন, তাঁর কৌশল ধরা পড়ে

গিয়েছে। তবে দিবা অবসানের আর বিলম্ব নেই বিশেষ। বলরাম নিশ্চয় এতক্ষণে দলবল নিয়ে যাত্রার প্রস্তুতিপর্বের আয়োজন শেষ করেছে। কৃষ্ণ, জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান জ্যা-এর দিকে একবার দৃষ্টি ফেললেন তারপর আরও কিছুটা দূরে সরে গেলেন, যেখানে জ্যা নিক্ষিপ্ত তীর এসে পৌছবে না। তিনি জানেন, জরাসন্ধ প্রথম সুযোগে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করবেন।

জরাসন্ধ লক্ষ্য করেন, কৃষ্ণ এমনভাবে যুদ্ধ করছেন যে তাঁকে ঘিরে ফেলা সম্ভব নয়। তবে কৃষ্ণের বিন্দুমাত্র সাধ্য নেই মগধবাহিনীর গতিরোধ করা। আর মগধবাহিনীকে পরাজিত করা সমগ্র ভারতের রাজাদের সম্মিলিত শক্তির পক্ষেও অসাধ্য। তিনি সৈন্যদলের সামনে ফিরে এসে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন।

কিছুক্ষণের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ হয়ে যায়। দেখা যায় তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়েছেন। তাঁর পক্ষের অন্যান্য রাজারাও তাঁদের সৈন্য নিয়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করছেন। জয়োল্লাসে মত্ত জরাসন্ধের সুবিশাল বাহিনী ছুটে চলে মথুরাপুরীর দিকে। আর জরাসন্ধ কৃষ্ণকে হারিয়ে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না তাঁকে। তখন কৃষ্ণকে সাহায্য করার জন্য যে সমস্ত রাজা মহারাজারা এসেছিলেন, যাঁরা এখন পালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে বন্দী করার আদেশ দেন। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে গিরিব্রজ নগরীতে। সেখানে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে বন্দীজীবন যাপন করার সময় বুঝতে পারবেন, মগধরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ফল কি।

এরপর তিনি মথুরাপুরীতে গিয়ে প্রবেশ করেন। আজকের জয়োল্লাস মথুরার রাজপ্রাসাদের পাষান প্রাকারে প্রতিহত হয়। এই জয়ধ্বনির ভিন্ন সুর কংসের দুই পত্নীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। তারা ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় বাতায়নের কাছে। তাদের পরিচারিকারা, যারা এতদিন দূর থেকে তাদের দিকে দৃষ্টি রাখছিল তারা ছুটে এসে দাঁড়ায় দুই রাণীর পাশে, আদেশের প্রতীক্ষায়। কারণ তারাও জেনে ফেলেছে এই জয়ধ্বনির অর্থ কি।

সন্ধ্যাতারা অনেক আগে উঠেছিল। তারপরে আরও কত শত সহস্র তারা আকাশের বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে। যামিনীর প্রথম যাম শুরু হয়েছে। বাসুদেবকে নিয়ে বলরাম যমুনা অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। সেই সময় কৃষ্ণ গিয়ে যোগ দিলেন দলের সঙ্গে। বাসুদেবকে কৃষ্ণের আগমন বার্তা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল। এতক্ষণ তাঁর চিত্ত ছিল বিক্ষিপ্ত, এখন

নিশ্চিন্ত হলেন। কৃষ্ণ হাসতে হাসতে অশ্বারূঢ় বলরামের পাশে এলেন। বলরাম একটিও কথা বললেন না। তাঁর মুখ গম্ভীর।

কৃষ্ণ বলেন—অত গম্ভীর হয়ে না থেকে তোমার ওই হলায়ুধ দিয়ে আমার মস্তক ছিন্ন কর।

বলরাম বলেন—দরকার নেই।

কৃষ্ণ বুঝলেন, যুদ্ধের ফলাফলে বলরাম খুবই বিষণ্ণ। তাই আর কোন কথা বললেন না।

এই একই সময়ে মগধরাজ জরাসন্ধ গিয়ে প্রবেশ করলেন প্রয়াত কংসের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। তাঁর কন্যাদ্বয় এক সময়ে ছিল এই প্রাসাদের বহু সম্মানিতা দুই মহিষী। এখন সম্মান ধুলায় লুন্ঠিত। কৃষ্ণের অধীনে কয়েক মাস বন্দীজীবন যাপন করে সম্মানবোধও অতটা তীব্র নেই আর। তাই পিতার আগমন বার্তা পেয়ে তারা উভয়ে পাগলিনীর মত ছুটে এসে প্রাঙ্গণের মধ্যেই পিতার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য জরাসন্ধের মনে হল পৃথিবীতে তাঁর জীবিত থাকার আর কোন অর্থ নেই। তারপর মনের এই অবস্থাকে সংযত করে তিনি কন্যাদ্বয়কে প্রবোধ দিতে দিতে তাদের নিয়ে ভেতরে যান।

প্রাসাদ কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুই কন্যা সহসা ঘুরে দাঁড়ায়। পিতাকে তারা প্রশ্ন করে—কৃষ্ণ কোথায়? কোথায় তাকে বন্দী করে রেখে এলে?

কন্যাদ্বয়ের চোখ থেকে যেন অগ্নি বর্ষিত হতে থাকে। জরাসন্ধের মনে হল, এরা বুঝি তাঁর কন্যা নয়। এরা অপরিচিতা শোকাহতা দুই নারী। তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন না কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর ধীরে ধীরে বলেন—তাকে বন্দী করতে ব্যর্থ হয়েছি। সে পালিয়েছে।

অনুজা তীব্র স্বরে বলে ওঠে—তুমি স্পর্ধা দেখাও যে সসাগরা ধরিত্রীকে তুমি পদানত করবে? তুমি সগর্বে ঘোষণা কর যে রাজসূয় যজ্ঞ করে তুমি প্রমাণিত করবে যে ভূতলে তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোথায় তোমার সেই গর্ব? কোথায় সেই বিক্রম? যাদবকুলের সামান্য এক নাবালককে বন্দী করার ক্ষমতাও তোমার নেই। অথচ বলে বেড়াও দন্তবক্র, করুক, মেঘবাহনের মত নৃপতিরা তোমার আজ্ঞাবাহী। বলে বেড়াও পৌণ্ড্রক এমন কি যবনাধিপতি ভগদত্ত তোমার শুভার্থী। কোথায় তারা? কি করছে তারা তোমার জন্য? তোমার গিরিব্রজেও শুনি অনেক নৃপতি আশ্রয় প্রার্থনা করে! তারাই বা কোথায়?

জরাসন্ধ অনুজার মস্তকে হাত রেখে নম্র কণ্ঠে বলেন—যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু ঘটে যায়। কৃষ্ণ যেখানেই থাকুক, তার নিষ্কৃতি নেই। তুমি শান্ত হও। তোমার মনোবাঞ্ছা যাতে অপূর্ণ না থাকে, সেই চেষ্টা আমি করব।

অনুজা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে—জান, তোমার জামাতাকে নিয়ে ওরা বিকৃত শ্লোক রচনা করেছে? সে নাকি পাপিষ্ঠ, সে নাকি ঘোর অত্যাচারী, সে নাকি দৈত্য-সদৃশ। যারা একটু পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে তাদের ওরা দেখতে পারে না। লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে। ওরা চায় ভারতভূমিতে ওরা একাই প্রভুত্ব করবে। সবাইকে পদানত রাখবে। কাউকে উঠতে দেবে না।

কন্যার কথা শুনে জরাসন্ধের আবার মনে পড়ে গেল সেই তরুণটির কথা, যার বাসনা ছিল তাঁকে নিয়ে কাব্য রচনা করবে, যাতে তাঁর জয়গান কীর্তিত হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাঁর।

ওদিকে দ্বারকায় গিয়ে সব রকম ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় চলে গেল। কিন্তু তার মধ্যে একটি চিন্তা কৃষ্ণকে সব সময় চিন্তিত রাখল—জরাসন্ধের বিনাশ কিভাবে সম্ভব। তাঁর যা সৈন্যবল জীবনভর চেষ্টা করেও তাদের ধ্বংস করা সম্ভব নয়। জরাসন্ধ অমিতবিক্রম। সম্মুখ সমরে তিনি অপরাজেয়। তাঁকে পরাজিত ও ধ্বংস করার সোজাসুজি কোন পথ নেই। কৌশলে তাঁকে হয়ত বধ করা সম্ভব। কিন্তু কি সেই কৌশল যাকে ক্ষাত্র-ধর্মোচিত রূপ দেওয়া যায়? সব রকমের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই চিন্তা থেকে কৃষ্ণ মুক্তি পেলেন না।

ইতিমধ্যে সংবাদ এল মহারাজ জরাসন্ধ গিরিব্রজ নগরীতে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেখানে এই বিশাল দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের নৃপতিগণ ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সম্মুখে ঋষিগণ কর্তৃক মূর্ধাভিষিক্ত জরাসন্ধ নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করেছেন। কৃষ্ণ ধৈর্যের সঙ্গে সবকিছু শুনলেন। মনে মনে তিনি জরাসন্ধকে সম্রাটরূপে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তাঁর তুল্য পরাক্রমশালী দ্বিতীয় কেউ নেই। থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার সাহস দেখাতেন এতদিনে।

এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল। একদিন এক বার্তাবাহক হস্তিনাপুর থেকে এসে উপস্থিত হল কৃষ্ণের দর্শনপ্রার্থী হয়ে। তাকে সাদরে নিয়ে যাওয়া হল কৃষ্ণ সকাশে। কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাঁকে প্রেরণ করেছেন।

বার্তাবাহক প্রণাম করে কৃষ্ণকে বলে—মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে শতকোটি প্রণাম জানিয়েছেন। তিনি এক ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন। সেই সমস্যার সমাধান একমাত্র আপনি করতে পারেন বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন, আপনার পক্ষে যদি হস্তিনাপুরে যাওয়া সম্ভব হয়, তিনি কৃতার্থ হবেন।

কৃষ্ণের মনোবাসনা অনুরূপ ছিল। একবার পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার কথা তিনিও ভাবছিলেন। তাছাড়া হস্তিনাপুর ভারতভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ওখানে গেলে সব রাজ্যের সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। মগধের সংবাদও পাওয়া যাবে। তিনি বার্তাবাহককে বললেন হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলতে যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করবেন।

বার্তাবাহক বিদায় নেয়।

হস্তিনাপুরে যাত্রার আয়োজন পরদিন থেকে শুরু হয়ে যাবে। বসুদেব বৃদ্ধ হলেও এখনো সক্ষম। তাঁর সাহায্যার্থে দ্বারাবতীতে উপস্থিত থাকবেন বলভদ্র। কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যাবেন। বিপদসঙ্কুল পথ, আক্রান্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে। পথে দুর্বৃত্তেরও অভাব নেই। সৈন্যরা রীতিমত অস্ত্রসজ্জিত হল। তিনি নিজেও তাঁর রথে বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রে সজ্জিত রাখলেন। আর রাখলেন অপূর্বদর্শন সেই চক্র যেটি বহুদিবসের অনুশীলনের ফলে তিনি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। বলরামও তাঁর হলায়ুধ প্রয়োগে ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে এইভাবে কুশালী হয়েছেন। শৈশব থেকে কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে করতে হলকে তিনি তাঁর শরীরের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ রথারোহন করলেন। বাতায়ন পথে তাঁর ভার্যা বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর মুখ চকিতে অদৃশ্য হল। কৃষ্ণ মৃদু হাসলেন। রুক্মিণী তাঁকে তাঁর অঙ্গসজ্জার জন্য কয়েকটি দ্রব্য নিয়ে আসার জন্য বলেছেন। কৃষ্ণ সম্মত হয়েছেন।

ভগিনী সুভদ্রা রথের সন্নিকটে এসে প্রশ্ন করেন—শুনলাম তুমি অনেকের জন্য অনেক কিছু আনবে। আমার জন্য কি আনছ?

কৃষ্ণ হেসে বলেন—সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্য আনব।

—সেটি কি দ্রব্য?

—নারীর ভূষণ।

—অলঙ্কার?

—অলঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তোমার কাছে ? তার চেয়েও বহুগুণ শ্রেয় দ্রব্য আছে। চিন্তা কর। হয়ত সেই দ্রব্য নিজেই চলে আসবে। তুমি যা মূর্খ, শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগ না করতে হয় বুঝিয়ে দিতে।

সুভদ্রা কিছুটা অনুমান করেও না বোঝার মত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকেন। কৃষ্ণ তাঁর মস্তকে লঘু চপেটাঘাত করে রথ চালিয়ে দেন।

সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ।

মথুরা বৃন্দাবনে বর্ষা আসত এক অপূর্ব রূপ নিয়ে। দ্বারাবতীতে ঠিক তেমনভাবে আসে না। এখানে বর্ষা যখন আসে প্রবলভাবে এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। অধিবাসীরা অশেষ দুর্গতির মধ্যে পড়ে। আবার কোন কোন বৎসর বর্ষা বড় বেশী কৃপণ। এটি কৃপণতার বৎসর। এবারে শ্রাবণ শেষ হতে না হতে বর্ষা প্রায় বিদায় নিয়েছে। অথচ বৃন্দাবন মথুরায় ভাদ্র মাসেও ভরা বাদল থাকত কোন কোন বৎসর। সেইসব দিনের কত কথা মনে পড়ে যায় কৃষ্ণের পথ চলতে চলতে। কত সুখস্মৃতি। মথুরা অধিকার করে বেশীদিন থাকা যায়নি। তবু বেশ কিছুদিন ওখানে থাকা গিয়েছিল। জরাসন্ধের কন্যারা পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণে বিলম্ব করেছিলেন। ভেবেছিলেন কংসের কোন হিতৈষী স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে জরাসন্ধকে এই ঘটনার কথা জানাবে। তাঁদের ধারণা ছিল না সেইসব পথ যতটা সম্ভব বন্ধ করা ছিল। শেষে নিশ্চয় এমন কোন ব্যক্তির সহায়তা তাঁরা পেয়েছিলেন যে কোন উপকার পেয়ে সাধারণ মানুষের মত কৃতঘ্ন হতে জানে না। সে উপকারের কথা স্মরণে রেখে মনে মনে প্রত্যুপকার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

বর্ষা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ায় আবহাওয়া আবার উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল। সেই মরুস্থলীর তপ্ত বালুকারাশি অতিক্রম করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। অথচ এই পথ হ্রস্বতম পথ। নইলে অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হয়।

যুধিষ্ঠির কেন তাঁকে স্মরণ করেছেন কিছুটা অনুমান করতে পারেন কৃষ্ণ। সম্ভবত রাজচক্রবর্তী হতে চান তিনি। খুব স্বাভাবিক। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই সাধ হওয়া অযৌক্তিক নয়, আছেও। বরং মঙ্গলজনক। তাই যদি হয়, তাহলে জরাসন্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। এটাই সমস্যা। দেখা যাক, যুধিষ্ঠিরের মনোবাসনা কি। অন্য কোন কারণেও তিনি ডাকতে পারেন।

মরুভূমি অতিক্রমের সময় দ্রব্যসামগ্রী বহনের জন্য উষ্ট্রের সহায়তা নিতে হল। তবু কয়েকটি অশ্বের জীবনহানি ঘটে জলকষ্ট ও অত্যধিক তাপে। তার মধ্যে একটি অশ্ব কৃষ্ণের রথের। অশ্ব পরিবর্তন করা হয়। মৃত্যু হল দুজন সেনানীরও। কৃষ্ণ ব্যথিত হলেন।

অনেক নদ নদী পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে তিনি অবশেষে হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে তাঁকে আর তাঁর সেনাদলকে অভ্যর্থনা জানানো হল, তাতে সকলের পথশ্রম, ক্লান্তি গ্লানি সব এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হল। তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পরম পরিতৃপ্তিতে।

দুদিন পরে যুধিষ্ঠির যখন লক্ষ্য করলেন কৃষ্ণের লোকজন সম্পূর্ণ সতেজ হয়ে উঠেছে, তখন তিনি একদিন কৃষ্ণকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—হস্তিনাপুরের একদিকে যমুনা, অন্যদিকে গঙ্গা। আপনার অভিরুচি হলে একদিন যে কোন নদীতে নৌবিহারের বন্দোবস্ত করতে পারি।

কৃষ্ণ রহস্যময় হাসি হেসে বলেন—সহসা নৌবিহারের বাসনা কেন মহারাজ?

—আপনার সঙ্গে যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটি সুন্দর পরিবেশে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তার গুরুত্ব অপরিসীম। উভয় পার্শ্বে অপস্রয়মান হরিৎ তটরেখা, নীচে বীচিভঙ্গ নদী আর আমরা থাকব বৃহৎ ময়ূরপঙ্খীতে। হস্তিনাপুরের অদূরে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পরিবেশের কথা এই মুহূর্তে চিন্তা করতে পারছি না।

—বর্ষার নদী কি ময়ূরপঙ্খীর পক্ষে উপযুক্ত হবে?

—এবারে বর্ষণ খুব কম হয়েছে। নদী এবারে সেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেনি। ময়ূরপঙ্খীর গতি স্বচ্ছন্দ থাকবে।

—বেশ, তবে যমুনাই ভাল। যমুনায় ভাসমান থাকার সময় ভাবতে পারব আর একটু নীচের দিকে গেলে মধুপুরী কিংবা বৃন্দাবনে পৌঁছে যাব।

যুধিষ্ঠির হেসে বলেন—অতীতকে ভোলা বড় কঠিন।

পরদিন তাঁরা দিবসের প্রথম ভাগে শকটে করে যমুনাকূলে এসে পৌঁছলেন। তারপর ময়ূরপঙ্খীতে আরোহণ করলেন। নৌযানটি অতি বৃহৎ। তাতে মধ্যস্থলে সুসজ্জিত সুবিশাল একটি কক্ষ। কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব সেই কক্ষে গিয়ে উপবেশন করলেন।

যুধিষ্ঠির কোন রকম ভূমিকা না করেই বলেন—আমি কিছুদিন হল মনস্থ করেছি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করব। মন্ত্রীদের মত নিয়েছি। তাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন। ঋষি ও ঋত্বিকগণের পরামর্শ যাচ্ঞা করেছি। তাঁরা সম্মতি জানিয়েছেন। ভ্রাতাদের মতামত জানতে চেয়েছি। তাঁরা প্রেরণা দিয়েছেন। আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজসূয়র অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। তবু আজ

আমি আপনার শরণাপন্ন। আমি জানি, পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে সঠিক পথনির্দেশ করতে পারেন শুধু আপনি। অধিকাংশ মানুষ বন্ধুত্বের বশে প্রিয় বাক্য বলে। কেউ নিজের স্বার্থ চিন্তা করে মতামত দেয়। সঠিক পরামর্শ কোথায় পাব? তাই আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আজ আমরা আপনার উপদেশ পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

এরপরে বহুক্ষণ ধরে তাঁরা আলোচনারত থাকেন। ময়ূরপঙ্খী স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে চলে। কক্ষটির বাতায়ন উন্মুক্ত। বাতায়নপথে উভয় তীর স্পষ্ট দৃশ্যমান। উভয় তীরে অনেক নরনারীর সমাবেশ। তারা এই অতি মনোরম নৌযানটির দিকে চেয়ে রয়েছে। তারা জানে, এটি তাদের মহারাজের ময়ূরপঙ্খী। এতে তাদের রাজা রয়েছেন। তাই নমস্কার জানায় নৌযানের অভ্যন্তরে অদৃশ্য যুধিষ্ঠিরকে।

কৃষ্ণ সর্বশেষে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন—রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের এটাই আপনার সর্বোৎকৃষ্ট সময়। তবে এই যজ্ঞানুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হবে। আধিদৈবিক বা অন্যান্য বিঘ্নের কথা এখানে বলছি না। আপনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে মগধেশ্বর জরাসন্ধ। আর সে যদি একবার আপনার রাজসূয় যজ্ঞের পথরোধ করে দাঁড়ায় তবে আপনার পরাজয় অনিবার্য।

কথাটা শুনে যুধিষ্ঠিরের ললাট রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন—জরাসন্ধ কি অজেয়? তাকে কি কোনমতেই পরাজিত করা যায় না?

—এক রকম তাই। আমরা যাদবেরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, আমরা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যদি শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা অবিরাম তিনশত বৎসর জরাসন্ধের সেনানী বধ করে চলি, তবু তাদের শেষ করতে পারব না।

পঞ্চপাণ্ডবের চোখের আশার আলো যেন একসঙ্গে নির্বাপিত হয়। তারা বলে—খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

কৃষ্ণ তখন বলেন—না। তবু আমি হতাশ হতে বলি না আপনাদের।

সবার চোখে আবার একটু আলো দেখা দেয়। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন—আপনি জরাসন্ধের প্রকৃত শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করার পরমুহূর্তে কি করে আবার নিরাশ হতে নিষেধ করছেন?

কৃষ্ণ বলেন—বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞদের অভিমত এই যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং যে অতীব বলবান, তার সঙ্গে যুদ্ধ করা অনুচিত। আমরা যুদ্ধ

করব না। মগধ সৈন্যের সম্মুখীন কখনো হব না। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশ করব এবং তাকে আক্রমণ করে আমাদের কার্যসিদ্ধি করব।

—একথা প্রচারিত হলে ক্ষত্রিয়রা কি ধিক্কার দেবে না?

—না। কারণ আমরা জরাসন্ধকে বিনা যুদ্ধে হত্যা করব না। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বধ করতে হবে। সেটাও দুঃসাধ্য। তাই সে যখন শারীরিক দিকে একটু দুর্বল থাকবে, তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। তাছাড়া তার বয়স হয়েছে। নইলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের প্রশ্ন উঠত না। সুখের কথা শত অসুবিধার মধ্যেও তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কেউ আহবান করলে সে প্রত্যাখ্যান করে না। আপনার লোকমুখে কি শোনেন জানি না, সে প্রকৃতই বীর। ভীম যদি তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানান সে এগিয়ে আসবে। পিছিয়ে যেতে সে শেখেনি কখনো। তার এই পৌরুষের জন্য তার প্রতি দেবাদিদেব ইন্দ্রমৌলী তুষ্ট বলে লোকে জানে। আবার একথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সে যদি ভীমের সমবয়সী হত, তাহলে তিনজন ভীমকেও অনায়াসে সে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত। কিন্তু আজ সে প্রৌঢ়, তার দেহ ভারী, গতি শ্লথ। এই সুযোগ ভীমকে নিতে হবে। তবু সাবধান করে দিচ্ছি, যদি ভীম এক পলকের জন্য অসতর্ক হন তাহলে জরাসন্ধের হস্তে মৃত্যু অবধারিত।

যুধিষ্ঠির বলে ওঠেন—তাহলে না হয় রাজসূয় যজ্ঞ স্থগিত থাক।

অন্যান্য ভ্রাতারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠেন। অর্জুন বলেন—স্বয়ং কৃষ্ণ যখন আমাদের সহায়, তখন অত বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। আমরা গিরিব্রজ অভিমুখে যাত্রা করব। আপনি দিনক্ষণ দেখুন।

যমুনা বক্ষে সেদিনের দীর্ঘ আলোচনা একসময়ে সমাপ্ত হয়। দিনান্তের রবি রক্তবর্ণ ধারণ করে। যাত্রীবাহী আর ভারবাহী নৌকাগুলি সশ্রদ্ধ দূরত্ব রক্ষা করে ময়ূরপঙ্খীকে অতিক্রম করছে। তাদের মহারাজা ওতে রয়েছেন। তারা জানে না, তিনি মহারাজাধিরাজ হবার স্বপ্ন দেখছেন।

কংস নিহত হবার সংবাদ প্রাপ্তির পূর্বে গিরিব্রজপুরীতে যেমন একটা অশুভ ছায়া বিস্তার লাভ করেছিল তেমনি আবার ঘটতে দেখা গেল। বৃক্ষে ফল আছে অথচ সেই ফল তেমন রসাল নয়। পুষ্প রয়েছে কিন্তু তাতে তেমন সুবাস নেই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবাই আপন আপন কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে ঠিক পুত্তলিকার মত। কোন উৎসাহ কোন প্রেরণা নেই তাদের মনে। দূরে দ্রুমদল সুশোভিত পঞ্চ পর্বতের হরিৎ বর্ণ বহুলাংশে ম্লান বলে প্রতীয়মান হয়। চৈত্যক পর্বতে

অহরহ দাবানলের বিভীষিকা। পশুপক্ষীর ভয়ার্ত চিৎকার বোধহয় কান পাতলে কর্ণগোচর হবে। স্রোতস্বিনী সরস্বতীর তরঙ্গ তেমন উচ্ছল নয়। তাপোদকের বারি মনে হয় অনেক হ্রাস পেয়েছে। কারও দ্বারা সেই বারি উচ্ছোষিত। আর ঋষিগিরির সেই পর্বত কন্দরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন্ শবর শুনে এসেছে কন্দরের অভ্যন্তরে একটি ব্যাঘ্র মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। সভয়ে শবর একটি মৃত হরিণকে কন্দরের মুখে রেখে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে।

পুরোহিতগণ সম্রাটকে বললেন—মহারাজ, ঘোর অমঙ্গলের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। যজ্ঞানুষ্ঠানের আশু প্রয়োজন।

শুভদিন স্থির করে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হল। হোতাগণ জরাসন্ধকে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ অবস্থায় অগ্নি প্রদক্ষিণ করালেন। নিরম্বু উপবাসে রইলেন জরাসন্ধ। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়ম পালন করতে হবে।

পূজা সমাধার পরে জরাসন্ধ যাজ্ঞিককে প্রশ্ন করেন—আমার সাম্রাজ্য কি বিপদমুক্ত হয়েছে? প্রজাদের শান্তিতে কি আর কোন বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে?

একজন বলেন—রাজার শুভয় প্রজার শুভ। সেইভাবে বিচার করলে তারা নির্বিঘ্ন নয়। আপনার হস্তরেখা ও ভাগ্যলিপি উভয়ের বিচার করে একথা বলছি। আমার মনে হয় আরও যজ্ঞের প্রয়োজন।

বিস্মিত জরাসন্ধ প্রশ্ন করেন—আমার বিপদ? কিসের বিপদ?

—জীবন হানির।

—যুদ্ধে?

—সেকথা ঠিক বলা যায় না।

—যুদ্ধ ব্যতীত আমার জীবনহানি ঘটবে না। একথা আমি জানি। আর এখন যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই। কে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে?

—তবু।

জরাসন্ধ একটু চিন্তা করে বলেন—ঠিক আছে। আপনাদের যখন এই সিদ্ধান্ত, অন্য একটি দিন ধার্য করুন। আপনাদের বিচার খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি আপনাদের মতামতকে সর্বদা মর্যাদা দিয়ে থাকি।

একজন যাজ্ঞিক বললেন—আপনি এই যজ্ঞস্থলে যতটা সম্ভব সময় অতিবাহিত করুন। আজ নিদ্রাহীন রজনী যাপন করবেন। আমরাও সায়াহ্ন পর্যন্ত এখানে আছি।

অপরাহ্ণ সমাগতপ্রায়। ব্রাহ্মণেরা আর কিছু পরে বিদায় নেবেন।

ঠিক এই সময় কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন চৈত্যক পর্বত অতিক্রম করে নগরীর প্রধান দ্বারদেশে সমুপস্থিত। সেখানে তাঁরা লক্ষ্য করেন বৃষচর্ম নির্মিত তিনটি অতি বৃহৎ ভেরী সজ্জিত রয়েছে। সেই ভেরীত্রয়ের প্রহরায় রয়েছে তিনজন সশস্ত্র রক্ষী। কোনরকম সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করলে তারা ভেরীতে সজোরে লগুড়াঘাত করবে। আর সেই কর্ণপটহ বিদীর্ণকারী গুরুগম্ভীর শব্দ শুনে নগরীর রক্ষীবাহিনী ধেয়ে আসবে।

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের ব্রতধারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ। সেই ব্রাহ্মণদের দেখে প্রথমে প্রহরীরা সন্দেহ করেনি। ভাবে, এঁরা সম্ভবত নগর-চৈত্যের দিকে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা ভাবে, এই যুবকেরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। এত সুন্দর দেহসৌষ্ঠব যাদের তারা নগরীর অধিবাসী হলে নিশ্চয় পরিচিত হত। এদের আচরণেও নবাগতের হাবভাব। প্রহরীরা সতর্ক হয় এবং ব্রাহ্মণদের বন্দী করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পুর্বেই মুহূর্তে তিন ব্রাহ্মণ অতর্কিতে আক্রমণ করেন তাদের।

কৃষ্ণ নিম্নস্বরে ভীম ও অর্জুনকে বলেন—চৈত্যের পার্শ্বে ওই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ওদের এখনকার মত বন্দী করে রাখতে হবে। পরে মুক্ত করে দেব।

অসহায় প্রহরীরা ক্রোধান্বিত হয়ে বলে—আপনারা ভাল কাজ করলেন না। এর জন্য অনুশোচনা করতে হবে। মহারাজকে আপনারা চেনেন না।

ওদের বন্দী করে রেখে তাঁরা নগরীর পথে চলতে থাকেন। লক্ষ্য রাজপ্রাসাদ।

এই প্রায়ান্ধকারের মধ্যেও তাঁরা বিমুগ্ধ নয়নে নগরীর শোভা দর্শন করতে করতে চললেন। ভাবলেন কোথায় গিরিব্রজ নগরী আর কোথায় হস্তিনাপুর। এ যেন ইন্দ্রপুরী। নগরবাসীগণও এই তিনজন তেজোদৃপ্ত ব্রাহ্মণকে দেখে বিস্মিত হয়। এমন রূপবান যুবক দুর্লভ। নিশ্চয় এঁরা মহারাজ সকাশে চলেছেন।

প্রাসাদে প্রবেশপথে যজ্ঞস্থান থেকে নির্গত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎও ঘটে যায়।

—আপনারা ?

—আমরা মহারাজের দর্শনপ্রার্থী। দূর দেশ থেকে এসেছি।

ব্রাহ্মণেরা এঁদের তিনজনকে খুঁটিয়ে দেখলেন। কোথায় যেন ত্রুটি রয়েছে। চেহারার সঙ্গে বেশের বৈসাদৃশ্য। অঙ্গসজ্জাও অন্য ধরনের।

ব্রাহ্মণদের একজন বলেন—অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি

মহারাজকে সংবাদ দিয়ে আসছি।

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে জরাসন্ধকে বলেন—তিনজন নিয়মস্থ ব্রাহ্মণ সন্তান আপনার দর্শনপ্রার্থী। আপনি একটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করবেন।

—একথা বললেন কেন ?

—ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হল না। তবে আপনাকে একথা বলা ধৃষ্টতা।

ব্রাহ্মণ ফিরে গিয়ে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে বলেন—মহারাজ যজ্ঞাগারে অপেক্ষা করছেন। আপনারা সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন। এই রক্ষীর সঙ্গে যান।

জরাসন্ধ তাঁদের প্রবেশ করতে দেখে তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। তারপর আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

কৃষ্ণ বলেন—রাজাধিরাজ, এঁরা দুজন মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। মধ্যরাতের পরে মৌন ভঙ্গ করবেন। তখন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

জরাসন্ধ ব্রাহ্মণদের সুঠাম দেহ দেখে বিস্মিত হন। ঠিক যেন ক্ষত্রিয়। অথচ ব্রতধারী। কিছু বুঝে উঠতে পারেন না। যাজ্ঞিকদের একজন এসে তাঁর মনে প্রথমাবধি সন্দেহের উদ্রেক করে দিয়ে চলে গিয়েছেন। তবু অতিথিদের আপ্যায়ন করা সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

তিনি সবিনয়ে বলেন—আপনারা তাহলে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমি মৌন ভঙ্গের পরে আসব।

জরাসন্ধ চলে গেলে কৃষ্ণ বলেন—মহারাজা আমাদের সন্দেহ করেছে। তবে তাতে ক্ষতি নেই। যদিও আমরা ওর আয়ত্তে তবু আকস্মিকভাবে আমাদের নিধনের চেষ্টা কখনো করবে না। অতিথি শত্রু হলেও অবমাননা করে না জরাসন্ধ।

অর্জুন বলেন—অনেক গুণ আছে দেখছি।

—হ্যাঁ, আছে। তবে উত্তর ভারতে সেই গুণাবলীর কথা প্রচারিত হয়নি। সেখানকার নৃপতিবর্গ জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হয়ে সব সময় তার কুৎসা রটনা করে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ অস্ত্রযুদ্ধে নিস্তেজ হয়ে পড়লে জিহ্বার তেজ বৃদ্ধি পায়।

ভীম বলেন—আপনার মুখেই শুনেছি ব্রহ্মার বরে জরাসন্ধ যাদবগণের অবধ্য। যদি সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চায়, তাকে তো আপনার পরিচয় দিতে হবে। ওর মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠতে পারে।

ঈষৎ হেসে কৃষ্ণ বলেন—সেকথা ভেবেছি। তবু আমার ধারণা আপনাকে

দেখে সে আমার কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হবে। প্রবলকে নিপাতিত করায় তার অপার আনন্দ। আর আপনার মত বলশালী তো আমি নই।

অর্জুন ও ভীম হেসে ওঠেন।

তারপর মধ্যরাত্র গত হলে জরাসন্ধ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেন। সারা দিনরাত উপবাসে থাকায় তাঁকে শুষ্ক দেখায়। তবু তিনি ব্রতধারী ব্রাহ্মণদের যথোচিত পূজা করতে গেলে তাঁরা সেই পূজা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

তখন জরাসন্ধ বললেন—আপনারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে ক্ষাত্রতেজের সুস্পষ্ট প্রকাশ। আপনাদের ভুজে জ্যা চিহ্ন। কে আপনারা? পরিচয় কি আপনাদের? পূজা ফিরিয়ে দিলেন। আপনারা প্রকাশ্য পথে না এসে গোপনে নগরীতে প্রবেশ করেছেন। ভেরীর তিন রক্ষীকে বন্দী করে রেখেছিলেন। কেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কি?

কৃষ্ণ ও পাণ্ডব ভ্রাতৃদ্বয় জরাসন্ধের সংযম শক্তির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন। পাণ্ডবদ্বয় ভাবে তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংযম তারা দেখেছে। তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

কৃষ্ণ বলেন—আপনি প্রথম থেকে আমাদের ব্রাহ্মণ বলে ধরে নিয়ে ভুল করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এরা সবাই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করতে পারে। আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়। বাক্ বলের চেয়ে বাহু বলকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আপনি জানতে চেয়েছেন, গোপনে কেন নগরীতে প্রবেশ করেছি। তার উত্তরে জানাই, ধীর ব্যক্তিরা শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যে ও বন্ধুগৃহে প্রকাশ্যে প্রবেশ করে।

জরাসন্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। প্রশ্ন করেন—শত্রু? আমি আপনাদের শত্রু? কিভাবে? কবে শত্রুতা করলাম? আমি দৃঢ়ভাবে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করি। নিষ্ঠাভরে প্রজার হিতসাধনের চেষ্টা করি। আমাকে আপনারা বলছেন শত্রু?

কৃষ্ণ বলেন—আপনি ছিয়াশীজন রাজাকে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় বন্দী করে রেখেছেন। আর চোদ্দজনকে বন্দী করতে পারলে মহাদেবের মন্দিরে একশোজন রাজাকে বলি দেবেন। ধিক্ আপনাকে। একে আপনি বলেন ক্ষাত্র ধর্ম?

জরাসন্ধ বলেন—জানি না আপনাদের দেশে সবাই আমাকে কিভাবে চেনে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন কোন দৈত্য নররূপে জন্মগ্রহণ করেছি। আপনি একথা ঠিক শুনেছেন যে আমার উদ্দেশ্য একশোজন নৃপতিকে বন্দী করা। কিন্তু তারপরে নরবলি নয়। রাজ্যব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা।

এভাবে মিথ্যা আমার দুর্নাম রটাবেন না।

কৃষ্ণ তখন বলেন—অযথা বাক্যব্যয়ে লাভ নেই। ক্ষমতা অর্জন করে আপনি স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে উঠেছেন। আপনার এই ক্ষমতাপ্রিয়তা অনেক রাজার দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছে। আমরা এসেছি আপনাকে যুদ্ধ দ্বারা হত্যা করতে। আপনি মহাশক্তিধর। আশা করি যদি সাহস থাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হবেন না।

জরাসন্ধের চক্ষুদ্বয় থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়। তিনি বলেন—আমার সামান্য মাত্র অঙ্গুলি হেলনে মুহূর্তের মধ্যে আপনাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে পারে। আপনাদের আচরণ তস্করের চেয়ে কোন অংশে শ্রেয় নয়। তবু আপনারা আমার অতিথির রূপ নিয়ে এসেছেন। এই প্রবঞ্চনার নৈতিক সমর্থন কিভাবে আপনারা খুঁজে পাবেন আমার জানা নেই। তবে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব। বিমুখ করব না আপনাদের। কিন্তু তার আগে আপনাদের পরিচয় জানতে চাই।

কৃষ্ণ বলেন—পাণ্ডুরাজ আপনার অপরিচিত ছিলেন না আশা করি। এরা দুজন পাণ্ডু তনয়। ভীম ও অর্জুন। আর আমি আপনার পরিচিত। বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ।

জরাসন্ধের হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হল। মনে হল এখনি তিনি কৃষ্ণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবেন। কিন্তু না, আজ এরা অতিথি।

কৃষ্ণ বলেন—হে রাজা, আপনি কার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অভিলাষী ?

জরাসন্ধ ভাবলেন এদের মধ্যে ভীম স্পষ্টতই সর্বাপেক্ষা বলশালী। এখন মনে পড়ছে ভীমের কথা তিনি পূর্বেও শুনেছেন। তাকে পরাজিত করার পরে কৃষ্ণকে বধ করা এমন কিছু কষ্টসাধ্য হবে না। সুতরাং সবার আগে ভীম।

তিনি ইঙ্গিতে ভীমকে দেখিয়ে দিলেন।

অর্জুন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর ভয় ছিল প্রতিশোধ নিতে জরাসন্ধ প্রথমে কৃষ্ণকে না নির্বাচন করেন। তাহলে তো জরাসন্ধের জয় অবধারিত ছিল। কারণ যাদবদের কাছে তিনি অপরাজেয়।

কৃষ্ণ ভীমকে প্রস্তুত হতে বললেন।

জরাসন্ধ তখন বললেন—অপেক্ষা করুন। অত সহজে হবে না। যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে আমার কতকগুলি কর্তব্য করণীয় রয়েছে।

জরাসন্ধের কথার মর্মার্থ ওঁরা বুঝে উঠতে পারেন না।

জরাসন্ধ তখন বলেন—আমি সম্রাট, এই যুদ্ধে আমার মৃত্যু হলে সিংহাসনের অধিকারী কে হবে, সেটা নির্ধারণ করে দিয়ে যেতে হবে।

অর্জুন জনান্তিকে কৃষ্ণকে বললেন—সেটা কি খুব নিরাপদ হবে ?

—হবে। জরাসন্ধ তার কথায় অনড় থাকে।

—যদি প্রজারা আমাদের বিরুদ্ধে যায়?

—তাদের শান্ত রাখার ক্ষমতা সম্রাটের আছে। নইলে এত বড় সাম্রাজ্য চালাতে পারত না। মনে রাখবেন মগধ রাজ্যের তুলনায় হস্তিনাপুর নগণ্য।

অর্জুন নীরব হন।

যথোচিত নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে জরাসন্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র সহদেবকে ভবিষ্যৎ মগধেশ্বর রূপে নির্বাচিত করা হল। কোন অঘটন ঘটলে আজকের এই অনুষ্ঠান বলে সহদেব সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনে উপবেশনের অধিকারী হলেন। ডিম্বক ও হর্ষের পুত্রদ্বয় এখন সেনাবিভাগের উচ্চ পদাধিকারী। তারা সুদক্ষ যোদ্ধা এবং তাদের পিতাদের নিপুণতা তাদের মধ্যে সহজাত হয়ে এসেছে। ধৃষ্টকেতুকে ডেকে জরাসন্ধ বললেন যে তাঁরা সবাই যেন সহদেবকে সহযোগিতা করেন। তাঁরা সম্মত হন।

তখন জরাসন্ধ কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের সম্মুখে তাঁদের বলেন—আমার যদি মৃত্যু হয়, এঁরা যেন নিরাপদে গিরিব্রজ ও মগধের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেন। এঁদের সৈন্যহীন ও নিঃসহায় দেখে কেউ যেন প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না করে।

সকলে সম্মত হন।

কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের উদারতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। পাণ্ডু-তনয়দ্বয় উপলব্ধি করেন জরাসন্ধ সম্বন্ধে যা রটনা করা হয়েছে তা বহুলাংশে অসত্য। তবু যদি তাঁরা কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন জরাসন্ধের গুণাবলীর কথা প্রচার করতে পারবেন না। কারণ জরাসন্ধের পুত্ররাও যদি পিতার মত পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তখন সাধারণ মানুষের সহানুভূতি তাঁদের প্রতি রইবে।

মল্লযুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ হয়। খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিদের সম্মুখে এই যুদ্ধের আয়োজন করা হয়। কৃষ্ণ ভীমকে কতকগুলি গুপ্তবিদ্যা শিখিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, এক আধ বার সুযোগ মত নির্দেশের জন্য তাঁর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে। তিনি ইঙ্গিতে কিছু বলতে পারবেন।

যুদ্ধারম্ভের পর কিছু সময় অতিবাহিত হতে না হতে ভীম বুঝতে পারলেন তিনি হয়ত ভুল করেছেন। এই বয়সে জরাসন্ধ অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষিপ্র। তিনি ব্যাকুল নয়নে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কোন নির্দেশ, কোন ইঙ্গিত নেই।

কৃষ্ণ বিমর্ষ। পর পর দুবার জরাসন্ধ ভীমকে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। ইচ্ছা করলে তখন তাঁকে অনায়াসে হত্যা করতে পারতেন। উল্লাসে তাঁর পুত্রদ্বয় ও সেনাপতিরা চিৎকার করে ওঠেন। ভীমকে বধ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। কিন্তু অদ্ভুত এক মায়ায় জরাসন্ধের হৃদয় আচ্ছন্ন হয়। এত শক্তিশালী এই যুবক, এত সুঠাম তার দেহ। এক অসাধারণ সম্ভাবনাময় তার ভবিষ্যৎ। এই পৃথিবীতে বহুদিন বেঁচে থাকলে কত কীর্তি স্থাপন করতে পারবে। না, একে এভাবে বধ করলে ঈশ্বরের এই সুন্দর সৃষ্টির অমর্যাদা করা হবে। বসুদেব নন্দনকে বরং দ্বন্দ্বে আহ্বান করা উচিত ছিল। মারাত্মক ভ্রম হয়েছে। সহদেবা আর অনুজার বৈধব্যের প্রতিশোধ গ্রহণের এই সহজতম সুযোগ এভাবে নষ্ট করা ঠিক হয়নি।

জরাসন্ধের পক্ষের সকলে মহারাজের এই অদ্ভুত নিরাসক্ততা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান। বুঝতে পারেন, যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে যে পাশব বৃত্তি জাগ্রত হয়, যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবে এবং সংযম ও উপবাসের জন্য তা অন্তর্হিত হয়েছে। মনের এই পবিত্র অবস্থায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। আজ তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

তাই ডিম্বক পুত্র বলে ওঠে—আজ যুদ্ধ বন্ধ থাক। আজ ভীমসেন সম্পূর্ণ পরাজিত কিন্তু ভাগ্যক্রমে নিহত নন। আজ সম্রাটের মানসিক অবস্থা যুদ্ধের অনুকূল নয়। তাঁর মধ্যে হিংসা দ্বেষের লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

কৃষ্ণ বুঝতে পারেন, এই সুযোগ জীবনে আর আসবে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—না, না। এই যুদ্ধের নিবৃত্তি হবে যে কোন একজনের মৃত্যুর পরে। সম্রাটের সামনে ভীমসেনকে নিহত করার সুযোগ এসেছিল। তিনি যে সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি, এটা ভীমসেনের ত্রুটি নয়। যুদ্ধ চলবে।

কৃষ্ণের কথায় ভীমসেন বিস্মিত হন। তারপর তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেলতে তাঁর ইঙ্গিতে জরাসন্ধের দিকে ধাবিত হন।

দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলে। এতক্ষণে জরাসন্ধ বুঝতে পারেন তাঁর বয়স হয়েছে। বুঝতে পারেন ভীমের মত তাঁর নিজের গতিকে আর ক্ষিপ্র রাখতে পারছেন না। ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। আজকের মত যুদ্ধ বন্ধের অনুরোধ জানান তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ বলে ওঠেন—না। যুদ্ধ চলবে।

ভীম কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই জরাসন্ধের একটি পদ দু হাতে বেষ্টন করে ভূতলে ফেলে দেন তাঁকে। তারপর সম্রাটের বক্ষের ওপর বসে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর বক্ষপঞ্জর ভঙ্গ করেন। সম্রাট বুঝতে পারেন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে

আসছে। ইহজগতের কোন কিছু আর দৃশ্যমান নয়। তিনি শুনতে পাচ্ছেন এক মধুর সঙ্গীত। তিনি দু নয়ন ভরে দেখছেন স্বর্লোকের দেবদেবীদের, যাঁদের তিনি ভজনা করে এসেছেন। দেখছেন চন্দ্রচূড়ের শান্ত সমাহিত মূর্তি, এক হাত উত্তোলিত করে যিনি অভয় দিচ্ছেন তাঁকে। বলছেন—চলে এসো জরাসন্ধ। নিজ আলয়ে। সম্রাটের মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। সেই মুখে বিরাজ করে পরিতৃপ্তির স্মিত হাসি।

সর্বাগ্রে সম্রাট সহদেব অটুট ধৈর্য ধারণ করে উঠে এসে পিতার পদবন্দনা করেন। অন্য সবাই তাঁর অনুগামী হয়।

পদবন্দনা শেষ হলে সহদেব কৃষ্ণকে বলেন—আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এবারে আমি আপনাদের নিরাপত্তার জন্য একদল সৈন্য দিচ্ছি। তারা আপনাদের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দেবে। যে সব রাজা মহারাজা বন্দী রয়েছেন এখানে তাঁদের আমি একে একে মুক্তি দিয়ে দেব। পিতা এই আদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

ভীম উত্তেজিত ভাবে কিছু একটা বলার উপক্রম করতে কৃষ্ণ তাঁকে থামিয়ে দেন।

অন্তঃপুরে জরাসন্ধের মৃত্যু সংবাদ পৌছে দেওয়া হয়। পুরনারীগণের বক্ষ-বিদীর্ণ আর্তনাদ ভেসে আসে।

গিরিব্রজবাসীরা শোকাহত হয়। সেই শোক সমগ্র মগধরাজ্যে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। বৃক্ষরাজির পত্রপুষ্প এতদিন বিবর্ণ ও গন্ধহীন বলে মনে হত। এখন ঝরে ঝরে পডতে থাকে। বৃক্ষগুলি পত্রপুষ্পহীন হয়ে পড়ে। পথঘাট সেই সব বিশুষ্ক পত্রপুষ্পে আচ্ছাদিত হয়। প্রবল ধূলিঝড়ে সেগুলি উন্মত্তের মত শূন্যে উড়তে থাকে, পড়তে থাকে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদী। এই নদীতে একদিনের অবগাহন নর্মদা নদে দশ মাসকাল স্নানের সমতুল্য। আর গঙ্গায় দীর্ঘ এক বৎসরকাল স্নান করলে সরস্বতীতে একদিনের স্নানের পুণ্যের সমান। এহেন সরস্বতী নদীতটে শোকাহত শত শত নগরবাসীর চক্ষের সম্মুখে সম্রাট জরাসন্ধের নশ্বর দেহ যখন পঞ্চভূতে বিলীন হতে থাকে তখন উত্তর ভারতের তিনজন প্রখ্যাত ব্যক্তি প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় অবনত মস্তকে এগিয়ে চলেছেন মগধ সীমান্তের দিকে। পথের দুই পার্শ্বের কৌতূহলী জনতার ভীড়। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এরাই সেই তিন ব্যক্তি যারা তস্করের মত প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের সম্রাটকে নিহত করে চলে যাচ্ছে। মৃত্যুর পূর্বে সম্রাটের কঠোর আদেশ ছিল

এরা যেন অক্ষত অবস্থায় মগধ পরিত্যাগ করে যেতে পারে। তারা বলাবলি করে এটা নাকি সম্রাটের ইচ্ছামৃত্যু।

*　　　*　　　*

জরাসন্ধের মৃত্যুর পর মগধের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি কিছুদিনের জন্য বিদায় নিল। কারণ তাঁর পুত্র সহদেব যুধিষ্ঠির দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞে অনেক রাজাদের একজন হয়ে উপস্থিত ছিলেন। পিতার সম্রাটত্ব তাঁর আর রইল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেখা যায় তাঁর ভ্রাতা ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তবে পরে পাণ্ডবরা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন সদদেব পুত্র মেঘসন্ধি সেই অশ্বের গতিরোধ করেছিল। কিন্তু অশ্বের সঙ্গে ছিলেন বহু যুদ্ধের নায়ক অভিজ্ঞ অর্জুন। তাই তরুণ অনভিজ্ঞ মেঘসন্ধিকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

তবু জরাসন্ধের বংশধারা বহুদিন পর্যন্ত মগধে রাজত্ব করেছিল। তাঁর বংশের শেষ রাজা ছিলেন রিপুঞ্জয়। তিনি তাঁর মন্ত্রী সুনিকা (পুলিকা?) দ্বারা নিহত হন। সুনিকা তাঁর পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই প্রদ্যোত বংশ গিরিব্রজ ও মগধের ওপর বহুদিন আধিপত্য রাখে। তারপর আসে শিশু নাগদের রাজত্বকাল। কিন্তু জরাসন্ধের সময়ের মত তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি তারা। তবে মগধ রাজ্য এবং সেই সঙ্গে গিরিব্রজ বেশীদিন অবহেলিত হয়ে থাকেনি। যুগে যুগে গৌরব দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছে এই স্থান। বারবার রাজনীতি ও অর্থনীতি, ধর্ম ও জ্যোতির্বিদ্যায় সর্ব বিষয়ে খ্যাতির শিখরদেশে অরোহণ করে ভারতবর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে যুগে যুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

বিম্বিসার ও অজাতশত্রু

জৈন-বৌদ্ধযুগ

যুগের পর যুগ গিরিব্রজ নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান অপরিবর্তনীয় থাকলেও কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার নামের পরিবর্তন ঘটেছে কয়েকবার। জরাসন্ধের বংশের অন্যান্য রাজার চেয়ে অপেক্ষাকৃত খ্যাতিনামা দুই রাজার নামে এই নগরীর নামকরণ একবার হয়েছে কুশাগ্রপুর, অপর একবার হয়েছে বৃষভপুর।

তারপর জৈন ও বৌদ্ধ যুগারম্ভের শুরুতে এই নগরীর আর একটি দীর্ঘস্থায়ী নামকরণ হয়, যা আজ অবধি অপভ্রংশিত অবস্থায় অটুট।

রাজগৃহ।

গিরিব্রজ পথ করে দিল রাজগৃহের। পথ করে দিয়ে সে চলে গিয়ে স্থান নিল পুরাণ ও মহাকাব্যের পৃষ্ঠায়। কিন্তু গিরিব্রজের সেই সমৃদ্ধি রাজগৃহেও বর্তমান। সেখানকার হর্ম্যশ্রেণী, স্থাপত্যশিল্পে পারদর্শী মহারাজা মহাগোবিন্দের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে এককালে যার সূত্রপাত, সেই সবই নতুন অবয়বে রাজগৃহে শোভা পায়। তার পথঘাট আগের দিনের মতই তরুবীথি দ্বারা সুশোভিত। সেই পঞ্চপর্বত মূক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে পালা পরিবর্তনের এই মন্থর অথচ অনিবার্য ধারা। সরস্বতী নদী রাজগৃহের অনতিদূরে আজও প্রবহমানা। তাপোদ কুণ্ডগুলি তেমনি উষ্ণ। পরিবর্তন ঘটেছে অধিবাসীদের বহিরঙ্গে, তাদের মানসিকতাতেও। মহাভারতের যুগের সেই মনুষ্য সমাজ আর নেই যারা তৎকালীন মূল্যবোধে একনিষ্ঠ থেকে বিনা প্রতিবাদে তাদের সম্রাট হন্তাদের পথ করে দেয় নিরাপদে মগধ সীমান্ত পরিত্যাগ করে চলে যাবার জন্য। এখানকার অধিবাসীরা আরও বাস্তববাদী। এখন ধর্ম আছে, কর্ম আছে, সবই আছে, তবে অনেক বাস্তব-সম্মত। এখন আর দেবতাগণ কথায় কথায় পুষ্পবৃষ্টিতে রত হন না। আকাশ থেকে আর দেববাণী শ্রুত হয় না। তখনকার দিনে ঈশ্বরের অবতার হতে হলে সাধনা কৃচ্ছ্রসাধন কিছুরই প্রয়োজন হত না। দিব্য রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করে সুখসমৃদ্ধির মধ্যে লালিতপালিত হয়েও অবতাররূপে আপামর জনসাধারণের পূজ্য হওয়া যেত। রক্তমাংসের দেহধারণ করে ষোড়শোপচারের পূজা পাওয়া যেত। আবার কূটনীতিবিদ ও রণকৌশলী হয়েও এবং মিথ্যাকে ভেঙেচুরে সত্যের অবয়ব দেবার পারদর্শিতা দেখিয়েও অবতারত্বে এতটুকু বিঘ্ন ঘটেনি। অবতার নিজে যে ভগবান, সেকথা যাতে কেউ বিস্মরণ না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতেন।

আর এখনকার রাজগৃহের যুগে কেউ অবতারত্ব দাবি করেন না। স্বয়ং রাজপুত্র হয়ে কিংবা রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও পরম সত্যকে জ্ঞাত হবার সুতীব্র ব্যাকুলতায় গৃহসংসারের নিশ্চিন্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে

অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে কঠোর তপস্যার দ্বারা এখন জ্ঞানার্জন করতে হয়। সেই তপস্যালব্ধ সত্যকে অতি বিনম্রভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন তাঁরা যাতে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হয়। তাঁদের মধ্যে কূটনীতি নেই, হিংসা নেই, নেই রাজকীয় ভোগ ও ঐশ্বর্য। তাঁদের মধ্যে আছে প্রতিটি প্রাণীর প্রতি অপরিসীম প্রেম, আছে ধৈর্য, তিতিক্ষা। অতি দীন দরিদ্র মানুষ থেকে রাজা মহারাজা সবার প্রতি তাঁদের সমান দৃষ্টি। যেমন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলো রাজপ্রাসাদ আর জীর্ণ কুটির একইভাবে আলোকিত করে, একইভাবে সান্ত্বনার প্রলেপ মাখিয়ে দেয়।

এমনি এক সময়ে অনেক আবর্তন ও বিবর্তনের পরে অনেক যুগ অতিবাহিত হলে মগধের সিংহাসনে দেখা গেল এক পরাক্রমশালী মহারাজা—নাম তাঁর বিম্বিসার। অসাধারণ রণকুশলী, অতি বৃহৎ সৈন্যদলের অধিনায়ক বহুদিন পরে মগধকে ভারতভূমিতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

চৈতক পর্বতে মৃগয়ায় গিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হতে পতনের ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী মগধেশ্বর নৃপতি মহাপদ্ম। রাজবৈদ্য স্বয়ং শয্যাপার্শ্বে সর্বক্ষণ উপস্থিত। বয়স কিছুই নয় নৃপতির। যৌবন তাঁর দেহ মনে আরও বহু বৎসর বিরাজ করার কথা। কিন্তু সহসা এই দুর্ঘটনা। অশ্বের পদস্খলনের ফলে পর্বত-গাত্রে একটি প্রস্তরের উপর সবেগে পতিত হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে সযত্নে প্রাসাদে বহন করে আনা হয়। একবার একটু চেতনা এসেছে কয়েক মুহূর্তের জন্য। আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। রাজবৈদ্য গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন। কক্ষে শুধু রয়েছেন মহিষী বিম্বি। কাঞ্চনবর্ণা অসাধারণ সুন্দরী তিনি। রাজবৈদ্যের চক্ষুদ্বয় শুষ্ক, কিন্তু অন্তর তাঁর নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে চলেছে। এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী কয়েক দণ্ড পরে সম্ভবত তাঁর স্বামীকে হারাবেন। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ মহারাজকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পতনের ফলে তাঁর মস্তকের অস্থি চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই ঐশ্বর্যময়ী স্বামীসোহাগিনীর কী নিদারুণ পরিণতি হতে চলেছে। স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে যদি একটু কথা বলতে পারতেন তাঁর সঙ্গে তাহলে একটু সান্ত্বনা পেতেন। বৈদ্য ভাবেন, নৃপতি মহাপদ্মের মৃত্যু হলে মগধের কি হবে? কে আরোহণ করবে রাজগৃহের সিংহাসনে? মহারাজের একমাত্র পুত্র এখন পঞ্চদশ

বর্ষীয় নাবালক মাত্র। তার পক্ষে কি সম্ভব হবে রাজ্যভার নিজ হস্তে তুলে নিয়ে পরিচালনা করা ?

চাপা ক্রন্দন ধ্বনি শোনেন তিনি। মহিষী কাঁদছেন, কাঁদুন। এই সময়ে ক্রন্দন তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কিন্তু মহারাজ যদি আর একবার চেতনা ফিরে পান ? অনেক সময় মৃত্যুর ঠিক পূর্বে এমন জ্ঞান ফিরে পায় মানুষে। তাঁর নিজেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া যুগে যুগে দেখা গিয়েছে সতী সাধ্বীর কত কামনা ঈশ্বর কত অবিশ্বাস্য উপায়ে পূর্ণ করেছেন। তেমন কিছু যদি ঘটে যায়।

বিম্বি রাজবৈদ্যের কাছে এসে ভেঙে পড়েন। বলেন—আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। আপনি বলুন, আমার ভাগ্যে কি আছে। আমাকে স্তোক বাক্যে ভোলাবেন না।

বৈদ্য রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলেন—মা, মহারাজের অবস্থা কেমন সেকথা আমি না বললেও আপনি বুঝতে পারছেন। কে না বুঝতে পারে ? আমি বসে আছি, মহারাজ যদি আর একবার চেতনা ফিরে পান। অনেক সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমরা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই। তেমন মুহূর্ত এলে যাতে হারিয়ে না ফেলি, তাই আছি।

রাজমহিষী স্বামীর পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর মাটিতে বসে পড়ে শয্যায় মাথা রেখে অবিরল অশ্রুবিসর্জন করে চলেন। পুত্রের কথা তাঁর মনে নেই। অথচ পুত্র তাঁর প্রাণ। তিনি লক্ষ্যও করেননি পুত্র এক সময় নীরবে এসে পিতাকে দেখে চলে গিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। রাজগৃহ নগরীতে আজ শুধু সময়ই সচল, আর সব অচল। মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ থেকে সায়াহ্ন। এরপর আসবে রজনী। কিন্তু রাজগৃহের কোথাও কোন কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় না। মহারাজ মহাপদ্মের হৃৎপিণ্ডের শব্দ, তাঁর বক্ষের উত্থান-পতনের সঙ্গে যেন আশা আর নিরাশায় দুলছে প্রতিটি মানুষের হৃদয়।

বহুদিন পরে সেই মহাকাব্যের যুগের পর এই মগধের রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহে মহারাজ মহাপদ্মের উদয় হয়েছিল এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে। মগধ তার লুপ্ত গৌরব পুণর্লাভ করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তাঁর পরিচালনায়। ঠিক সেই সময় এই অভাবনীয় দুর্ঘটনা যা প্রতিটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ বক্ষপিঞ্জরকে ভেঙে চৌচির করে দিয়েছে।

রাজবৈদ্য সহসা চমকে ওঠেন। মহারাণী বিম্বি আচম্বিতে মস্তক উত্তোলন করে

স্বামীর মুখের দিকে চান। ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কক্ষের আলো। সেই আলোয় দেখা যায় মহারাজ মহাপদ্ম চোখ মেলেছেন।

রাজবৈদ্য মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁর মুখের সামনে কান এনে বলেন—মহারাজ কিছু বলবেন।

—বিম্বি।

ইঙ্গিতে বৈদ্য মহিষীকে মহারাজের কাছে যেতে বলেন। রাজমহিষীর মুখে আশার আলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ওঠে।

তিনি অশ্রু মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলেন—হৃদয়েশ্বর।

নৃপতি মহাপদ্ম বলেন—তোমার পুত্র অনেক বড় হবে বিম্বি। ওকে তোমার হাতে দিলাম।

—আমি শুধু তোমাকে চাই, আর কিছু চাই না।

—অবুঝ হয়ো না। স্বয়ং শিব আমাকে বললেন, আমার জীবনের বিনিময়ে আমি মগধের গৌরব ফিরে পেতে পারি। তুমি তো জান বিম্বি আমি তাঁর আরাধনা করতাম। অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়ার সময় তাঁকে যেন স্পষ্ট দেখলাম। তিনি তখন ওই কথা বললেন। বললেন, তোমার বিম্বির পুত্র বিম্বিসার শ্রেষ্ঠ নৃপতি হবে। তোমার জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী—পূর্বনির্ধারিত।

রাণী কেঁদে ওঠেন—না, না।

রাজবৈদ্য চিৎকার করতে নিষেধ করতে গিয়েও সংযত হন।

রাজা বলেন—পরজন্মে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে বিম্বি। স্বয়ং মহাদেব বলেছেন। কোন রকমে এই জন্ম অতিবাহিত করে দাও।

—না।

মহারাজা একবার নড়ে ওঠেন। চক্ষুদ্বয় বড় হয়। ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয় তাঁর। বক্ষ স্ফীত হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তে সর্বশরীর নিস্পন্দ হয়ে যায়।

রাণী বিম্বি তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা কোটেন। বৈদ্য ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

আর সেই সময় রাজপুত্র বিম্বিসার ছুটে আসেন। এসে বলেন—বাবা নেই? মা, বাবা চলে গেলেন?

পুত্রকে এক হাতে বেষ্টন করে বিম্বি বলেন—হ্যাঁ। মগধ আর তোমার খ্যাতির বিনিময়ে তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন।

—আমার খ্যাতির বিনিময়ে!

—হ্যাঁ, ইন্দ্র মৌলীর আরাধনা করে এসেছেন বরাবর শুধু তোমার জন্য, মগধের জন্য।

রাজকুমার বিম্বিসার এই চরম শোকের মুহূর্তেও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

মহারাণী করপল্লব দ্বারা স্বামীর ওষ্ঠদ্বয়, চক্ষু, ললাট, মস্তক ইত্যাদি স্পর্শ করে চলেন। বড় পরিচিত এই দেহ, যে দেহে বাস করত মহারাজার আত্মা।

পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর বিম্বিসার রাজ্যাভিষেকের পরদিনই সেনাপতিদের ডেকে বলেন—বিশাল সৈন্যদল গড়ে তুলতে। শুনে সেনাপতিবর্গ বিস্মিত। মনে মনে তাঁরা ভাবেন, এবারে অর্বাচীনের রাজত্ব শুরু হল। প্রথম দিনেই এই—

মাধব প্রসাদ একজন অতিবয়স্ক সেনানায়ক। তিনি মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেন—সৈন্যদল গড়তে অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে মহারাজ।

বিম্বিসার ধীর কণ্ঠে বলেন—আমি আপনাদের একথা বলিনি যে অর্থের অপ্রতুলতা রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ আপনারা অবশ্যই পাবেন।

—রাজকোষের অবস্থা কেমন সেটা না জেনে—

বৃদ্ধ মন্ত্রী হস্ত উত্তোলিত করে সেনাপতিকে বাধাদানের পূর্বেই কথা কয়টি তিনি বলে ফেলেন। কারণ মাধবপ্রসাদ জানতেন না যে মহারাজা ইতিমধ্যে মন্ত্রীর নিকট থেকে রাজকোষের অবস্থার কথা জেনে নিয়েছেন। বিম্বিসার জানতে পেরেছিলেন যে অন্তত ত্রিশ সহস্র অশ্ব ও পদাতিক বাহিনীর ব্যায় নির্বাহ করা পরবর্তী রাজস্ব সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত সম্ভব।

বিম্বিসার সেনানায়ককে বিনীতভাবে বলেন—আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যপরিচালনার দক্ষতা নিশ্চয় আপনার আর নেই। আমার মনে হয় অবসর নিলে আপনি স্বস্তি পাবেন—শান্তিতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন। পরামর্শের জন্য আপনাকে নিশ্চয় আমন্ত্রণ করে আনব।

অন্যান্য সেনানায়কগণ হতচকিত। মহারাজা মহাপদ্মও প্রয়োজনীয় কথা এমন স্পষ্টভাবে কখনো উচ্চারণ করতে পারেননি। এই কিশোর সাংঘাতিক। মাধবপ্রসাদের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ দেখায়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সামান্য এক বালকের কাছে এই অপমান সহ্য করতে হবে কল্পনা করেননি।

তিনি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলে ওঠার আগেই বৃদ্ধ মন্ত্রী বলেন—মহারাজা রাজকোষের পরিস্থিতি আমার কাছ থেকে জানার পরই এই আদেশ দিয়েছেন।

অন্যান্য সেনাপতিগণ মুহূর্তে বুঝে ফেলেন এই পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোরকে পূর্ণ

বয়স্কের মর্যাদা না দিলে মাধবপ্রসাদের দশা হবে।

বিম্বিসার মাধবপ্রসাদকে বলেন—আপনার আবাস কি এই রাজগৃহ নগরীতে?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—কোন অসুবিধা হলে বিনা দ্বিধায় আমাকে এসে জানাবেন। মগধের জন্ম আপনি অনেক স্বেদ রক্ত দিয়েছেন।

কথাটা বলেই বিম্বিসার মাধবপ্রসাদের অস্তিত্ব একেবারে ভুলে গিয়ে অন্যান্য সেনানায়কদের দিকে চেয়ে বলেন—আমি অন্তত ত্রিশ সহস্র সৈন্যের একটি স্থায়ী দল গড়ে রাখতে চাই। এদের মধ্যে অশ্বারোহী, পদাতিক তো থাকবেই, হস্তীবাহিনীও থাকবে। আপনারা কিভাবে ভাগ করবেন নিজেরা বসে ঠিক করুন। তারপর আমাকে জানাবেন।

সবাই সম্মতি জানায়।

প্রধান সেনাপতি মেঘবাহন ভাবছিলেন, মহারাজা অস্ত্রশিক্ষা করেন বটে কিন্তু তেমন নিপুণ নন। অন্যান্য বিষয়ে তিনি কেমন জানা নেই। সুতরাং কোন অভিযানে যেতে হলে রাজা সঙ্গে থাকলেও তাঁকেই সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে।

বিম্বিসার ডাকেন—সেনাপতি মেঘবাহন।

—মহারাজা!

—আমি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী নই। যুদ্ধকৌশলও আমার জানা নেই। প্রাসাদের পশ্চাতের প্রাকার বেষ্টিত উদ্যানে প্রতিদিন প্রত্যুষে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। আপনি উপস্থিত থাকলে ভালই হয়। নইলে অন্য কোন সেনাপতির উপস্থিতিতে আমার শিক্ষাদান শুরু করুন। যারা শিক্ষা দেবে, তাদের পদমর্যাদার দিকে তাকাবেন না। সাধারণ সৈনিক হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তাকে হতে হবে সেই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

মেঘবাহন এবং অন্যান্য সেনানায়কগণ এমন কি বৃদ্ধ মন্ত্রীও নতুন মহারাজার এই উক্তিতে অবাক হন। তাঁরা বুঝে ফেলেন কিশোর হলেও মহারাজা তীক্ষ্ণধী এবং রাজকার্য পরিচালনায় তাঁর সহজাত প্রতিভা রয়েছে।

রাজসভা সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চিকের অন্তরাল থেকে রাজমাতা বিম্বি পুত্রের সভাকার্য পরিচালনার সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পুত্রগর্বে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বামীর শেষ সময়ের উক্তি যে যথার্থ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় তাঁর থাকে না। মাধবপ্রাসাদকে যখন বিম্বিসার তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পদ থেকে

অল্প কথায় অপসারিত করলেন বিম্বি তখন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বয়স্ক ব্যক্তিটির প্রতি প্রবল সহানুভূতি তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল। ভেবেছিলেন, পুত্র অন্তঃপুরে ফিরলে তাঁকে তিরস্কার করবেন। কিন্তু যখন দেখলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর কিশোর পুত্রের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন তখন থেকে তিনি ঠিক করলেন, রাজ্যের কোন বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। পুত্র নিজের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল। তাকে বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী চলতে না দিলে হিতের চেয়ে অহিত হবে অনেক বেশী।

এক সময়ে রাজমাতা অন্যমনা হয়ে পড়েন। এই একই স্থানে বসে তিনি স্বামীর রাজসভা পরিচালনার কাজও দেখতেন। পুত্রের মত তাঁর স্বামীও একবারও এই কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। তিনিও বিস্মৃত হতেন যে তাঁর স্ত্রী অতি নিকটে রয়েছেন। রাজমাতা বিম্বি পার্শ্ববর্তী বাতায়ণপথে বাইরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। রাজধানী, রাজগৃহের রাজপথের একাংশ দেখা যায় সেখান থেকে। ঘন সন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণী সেই রাজপথকে চিরকালের মত ছায়াশীতল করে রেখেছে। এখন তাঁর স্বামী আর জীবিত নেই, ভবিষ্যতে তিনি নিজেও থাকবেন না। তারপর বিম্বিসার। তারও পরে বংশের কত পুরুষ এখানে রাজত্ব করবে জানা নেই। তবু রাজপথ হয়ত এমনি দ্রুমদল শোভিত হয়ে থাকবে, যেমন যুগ যুগ ধরে থেকেছে। সে শুনেছে পুরাকালে এখানে নাকি গৌতম মুনির তপোবন ছিল। সমস্ত নগরী বিশাল এক তপোবন। পর্বতশ্রেণী সেই তপোবনকে রক্ষায় নিয়ত রত। এখানে আরও কত মুনি ঋষির অভ্যুদয় হবে কে বলতে পারে।

পেছন থেকে একজন জড়িয়ে ধরে তাঁকে। চমক ভাঙে। তারপরই খেয়াল হয়, এ যে মহারাজ বিম্বিসার। মস্তকের শিরোভূষণ খুলে রেখে এসেছে দেখছি। কখন সভার কাজ শেষ হল?

—মা, তুমি বাইরের দিকে চেয়ে বসে রয়েছ। আমার কাজকর্ম তোমার নিশ্চয় ভাল লাগছিল না।

পুত্রের মস্তক চুম্বন করে বিম্বি বলেন—না, পুত্র। তোমার প্রতি আমি খুব তুষ্ট। যেভাবে তুমি কার্য পরিচালনা করলে তাতে আমি গর্বিত।

—তবে এমন আনমনা কেন? কেন ওভাবে বাইরে চেয়ে রয়েছ?

—কি জানি। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। এখানে বসে তোমার পিতার কাজও দেখতাম তো।

—ও।

মাতা ও পুত্র অন্দর মহলের দিকে চলে গেলেন।

তিন বছর অতিবাহিত হল। তরুণ মহারাজা যৌবনে পদার্পণ করেছেন। যুদ্ধ কৌশলেও এর মধ্যে নিপুণ হয়ে উঠলেন। যাদের কাছে এতদিন শিক্ষালাভ করছিলেন তারা স্বীকার করে নিল তাদের আর দেবার কিছু নেই। কারণ মহারাজা বিম্বিসার যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী। যার ফলে তিনি দক্ষতায় তাঁর শিক্ষকদের অতিক্রম করে গিয়েছেন। বিম্বিসারের অনেক কল্পনা। মগধ শুধু মগধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে তিনি রাজী নন। এই রাজ্যের সীমারেখা আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। আর বিস্তৃত করতে হলে প্রথমেই অঙ্গদেশকে পরাস্ত করতে হবে। অঙ্গদেশের প্রতি তাঁর বিশেষ ক্রোধ রয়েছে। কারণ তাঁর পিতাকে ওই দেশের রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার আচম্বিতে আক্রমণ করে পরাজিত করেছিলেন। অঙ্গদেশ জয় করতে পারলে প্রতিশোধও নেওয়া হবে। মগধের পূর্বদিকে অঙ্গদেশ। এই দেশ জয় করার পর লিচ্ছবিদের পালা। ওরা খুব সঙ্ঘবদ্ধ জাতি। ওদের শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেওয়া যায় না। বশে আনতে হবে।

বিম্বিসার কল্পনা করেন, তাঁর রাজ্য বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। তাঁর কল্পনা আরও প্রবল হয়ে ওঠে, যখন তাঁর আদেশে স্থায়ী সৈন্যবাহিনীদের একত্রিত করা হয় নগরীর পূর্বদিকে সুবিশাল প্রান্তরে। সেই প্রান্তরে অর্ধেক সৈন্যেরও স্থান সংকুলান হয় না।

বিম্বিসার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে প্রধান সেনাপতির সমভিব্যাহারে তাঁর সৈন্যদল পরিদর্শন করেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কোথাও সামান্য কোন ত্রুটি থাকলে ঠিক ধরে ফেলে। তাই প্রধান সেনাপতি প্রধান হলেও মহারাজের পরিদর্শন কালে সন্ত্রস্ত থাকেন।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও মাতা বিম্বির সঙ্গে মহারাজের সম্পর্ক ছিল অটুট। তাঁদের উভয়ের মধ্যস্থলে অপর কোন নারী এসে স্থান করে নিতে পারেনি সেটা বিস্ময়কর। মহারাজা অত্যন্ত সুপুরুষ। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দেহের বর্ণ তাঁর। মগধরাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি। অথচ নারীবিহীন জীবন তাঁর। এমন কোন নারীরত্ন নেই রাজপুরীতে যার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। মহানগরীর রাজপথেও কি চোখে পড়ে না তেমন কোন সুন্দরীর? সত্যই বিচিত্র।

অল্প বয়সে স্বামীহারা বিম্বি এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। যেদিন তাঁর পুত্র অন্য রমণীতে আসক্ত হয়ে পড়বে সেদিন থেকে এই রাজ্যে এই প্রাসাদে তাঁর সম্মানে ভাঙন ধরবে। পুঞ্জীভূত ক্ষমতার যে সম্মান সেই সম্মান ভালভাবে উপভোগ করার আগেই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁর স্বামীকে। প্রথম জীবনের সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণার এখনো নিবৃত্তি হয়নি। তাই কৌশলে তরুণী রূপসীদের কাছ থেকে পুত্রকে দূরে রাখার সতত প্রয়াস তাঁর। তিনি অনুভব করেন, বহুপূর্বে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত ছিল। নইলে পূর্ণ রাজ্যাভিষেক সম্ভব নয়। তবু তিনি পারেন না। ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে জেনে সবার অলক্ষ্যে অশ্রুমোচন করেন, তবু নিজের সম্মানের আসনটি পরিত্যাগ করতে মন চায় না। তিনি জানেন, একবার তাঁর পুত্র রমণীর স্বাদ পেলে অন্যরকম হয়ে যাবে। এদের রক্তে সেই জিনিস আছে। মহাপদ্মের মধ্যেও কি তিনি সেটা দেখেননি? দেখেও না দেখার ভান করে থাকতেন। মহাপদ্ম তাঁকে এড়িয়ে অন্য দুজন রাণীর কক্ষে যেতেন তাতে বলার কিছু নেই। সে তো যাবেনই। কিন্তু প্রাসাদের নর্তকীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সুনয়নাকে কত অসতর্ক মুহূর্তে কত ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখেছেন বিম্বি তার শেষ নেই। তিনি অপ্রস্তুত হয়েছেন। সহ্যও করেছেন। না করে উপায় কি? তিনি ছিলেন প্রধানা মহিষী। রাজার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাঁর গর্ভজাত পুত্র সন্তান সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তাছাড়া দৈহিক বিষয়ে রাজার শত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও মনেপ্রাণে তাঁকেই ভালবেসেছিলেন।

স্বভাবতই রাণীর এই কূটকৌশল মন্ত্রী এবং সভাসদদের অনেকে বুঝে ফেলেছিলেন। যৌবন প্রাপ্তির পরেও এতবড় রাজ্যের অধীশ্বরের পক্ষে অবিবাহিত থাকা খুব অস্বাভাবিক। অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রস্তাব আসে। মন্ত্রী রাজাকে জানালে তিনি সহাস্যে বিম্বিকে দেখিয়ে দেন। রাজমাতা বলেন, অধৈর্য হবার কিছু নেই। উপযুক্ত সময়ে সব হবে।

মহারাজা মহাপদ্মের এক বয়স্য নাম তার পদ্মাক্ষ, সে আর সহ্য করতে পারল না। সে পার্শ্ববর্তী অতি ক্ষুদ্র এক রাজার সঙ্গে দেখা করে তাঁর সুন্দরী কন্যা উদাম্বরীকাকে ভিক্ষা চাইলেন। রাজা সম্মত হলেন না। তিনি বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু এভাবে তাঁর কন্যাকে প্রেরণ করা অতীব অসম্মান-জনক। মগধরাজকে প্রলোভিত করার জন্য অবিবাহিত অবস্থায় কন্যাকে প্রেরণ করা সমীচীন বলে মনে করলেন না। কন্যা তাঁর রূপসী সন্দেহ নেই। তবু বিম্বিসার যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন কিংবা যদি সাময়িক খেয়ালের বশে তাকে

ভোগ করে পরে পরিত্যাগ করেন ? তাঁর রাজ্য ক্ষুদ্র হতে পারে। কিন্তু তিনি সম্মান নিয়ে বাস করেন। না না, এ অসম্ভব।

পদ্মাক্ষ রাজার মনোভাবে এতটুকুও বিচলিত হয় না। এরকম অসম্ভব পরিস্থিতির সম্মুখীন বহুবার সে হয়েছে অতীতে। শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে। সে বলে যে ভূতপূর্ব মহারাজ মহাপদ্মকে সে চিনত, তার পুত্রকেও ভালভাবে চেনে। সে ব্যর্থ হতে পারে না। তাঁর কন্যাকে সে নিজ প্রহরায় রাখবে, কোনরকম অসম্মানজনক কিছু ঘটতে কখনো দেবে না।

ইতিমধ্যে রাজকন্যা উদাম্বরীকা সব শুনে প্রলোভিত হয়। মন্দ কি ? মগধের রাণী হবার হাতছানি। তাছাড়া সে শুনেছে, মগধরাজ দেখতে সাক্ষাৎ কন্দর্প। বিবাহের পূর্বে এইটুকু ঝুঁকি নিতে ক্ষতি কি ? এতে কতখানি রোমাঞ্চ। তাকে দেখে মগধরাজের চোখে যদি মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে ওঠে কী শিহরণই না জাগবে। সুন্দরী বলে তার খ্যাতি আছে। মগধরাজ মুগ্ধ হলে তার জীবন সার্থক। তখন কি তিনি বিবাহে অসম্মত হবেন ? যদি হন, বুঝতে হবে নারী হবার যোগ্যতা তার নেই। সে পিতাকে অনেক অনুরোধ কবে সম্মত করায়।

এর কিছুদিন পরে এক গোধূলি লগ্নে মহারাজা বিম্বিসার যখন নির্জন রাজোদ্যানে একাকী বিচরণশীল তখন পদ্মাক্ষ উদাম্বরীকাকে নিয়ে একটি বৃক্ষের অন্তরাল থেকে সহসা মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়।

মহারাজের চোখে বিস্ময়।

পদ্মাক্ষ অতি বিনীতভাবে করজোড়ে বলে—মহারাজ, ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে পারিনি আপনি—

—আপনি আমার পিতার বয়স্য ছিলেন আমি জানি। অত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন ? ইনি কে ?

—আপনার অধীনে এক ক্ষুদ্র রাজার কন্যা। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ইনি রাজগৃহ নগরী দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাই নিয়ে এলাম।

অম্বরীকার বক্ষ কম্পমান। তার ঘন কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলের নীচে আয়ত চক্ষুদ্বয় আনত। সে এই অসাধারণ সুপুরুষকে দেখে স্তম্ভিত। ভাবে, বড় ভুল করে ফেলেছে সে। তিনি সাধারণ নন—হিমালয়সদৃশ। তার মত সাধারণ রমণী এঁর জন্য নয়। এঁর যোগ্য রমণী ঈশ্বর স্বহস্তে সৃষ্টি করেন।

জীবনে এভাবে কখনও এত কাছ থেকে কোন কুমারী ললনাকে দেখেননি বিম্বিসার। রাজকার্য আর সুশিক্ষিত সৈন্যদল গড়ে তুলতে তাঁর দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়েছে। অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের অবকাশ পাননি। জীবনের

আরও একটা দিক রয়েছে, সেকথা মনে হয়নি কখনো। আজ উদাম্বরীকাকে দেখে তিনি বিমুগ্ধ। যেন নতুন কিছু দেখছেন। পদ্মাক্ষের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ হন তিনি।

পদ্মাক্ষও মুহূর্তে বুঝে ফেলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কারণ মহারাজের রক্তকণিকায় নৃত্য শুরু হয়েছে। এবারে উদাম্বরীকার কৃতিত্ব আর ভাগ্যের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। এবারে রাজমাতার সমস্ত অবরোধ সমস্ত প্রতিরোধ ধূলিসাৎ হবে। তবে প্রয়াত মহারাজা মহাপদ্মের পুত্রের আসক্তি এই একটি মাত্র রমণীতে কখনই আবদ্ধ থাকবে না। তাঁর মত ইনিও হবেন বহুবল্লভা।

—মহারাজা, আমরা তাহলে চলি।

—কোথায় যাবেন ?

—গৃহে। উনি আমার গৃহে থাকছেন।

নিজেকে সংযত করে মহারাজা বিম্বিসার বলে—ও। বেশ।

—কিন্তু মহারাজা, আপনি ইচ্ছে করলে এঁর সঙ্গে পরিচয় করতে পারেন। আমি বরং চলি।

কথাটা শেষ করেই পদ্মাক্ষ স্থানত্যাগ করে।

অম্বরীকার চেতনা নিশ্চয় লুপ্ত হত, যদি না একটি সুদৃঢ় হস্তের স্পর্শ তার চিবুকে অনুভব করত।

—তুমি আমায় মুগ্ধ করেছ। দেখি।

বিম্বিসার অম্বরীকার মুখ দু হাতে তুলে ধরেন। আনন্দে শিহরিত হয় সে। তার চক্ষুদ্বয় আপনা হতে বন্ধ হয়ে আসে। সে মহারাজের নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পায়। জীবনে প্রথম পুরুষের স্পর্শ। স্বর্গীয় পুলক।

—বাঃ, সুন্দর তো।

অম্বরীকা অপেক্ষা করে। সে সারা জীবন অপেক্ষা করতে প্রস্তুত মহারাজের নতুন নতুন উক্তির জন্য।

—কি নাম তোমার ?

চোখ বন্ধ অবস্থাতে সে তার নাম বলে।

—তুমি প্রাসাদে থাকবে ?

—কেউ কিছু বলবে না ?

বিম্বিসার হেসে বলেন—না।

—উনি চলে গেলেন।

বিম্বিসার আবার হেসে বলেন—এখন বুঝতে পারছি পদ্মাক্ষ চলে যাবার

জন্যেই এসেছিলেন। উনি আমার পিতার বয়স্য ছিলেন। আমার বয়স্যের কাজের সূত্রপাতটা উনি করে দিয়ে গেলেন।

এই কথা শুনে উদাম্বরীকার বুকের ভার বহুলাংশে লাঘব হয়। এতক্ষণে সে মহারাজের স্পর্শ উপভোগ করতে শুরু করে। তাঁর অলক্ষ্যে একবার চোখ মেলে তাঁর রূপও দেখে নেয়।

সেদিন সন্ধ্যা গাঢ়তর হয়ে অন্ধকার নেমে এলেও রাণীমাতা বিম্বির লক্ষ্যে পড়েনি প্রাসাদে মহারাজার অনুপস্থিতি। যখন জানতে পারলেন রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অথচ অন্য কারও মুখে উদ্বেগের চিহ্ন নেই এতটুকু। পদ্মাক্ষ বিদায় নেবার আগে প্রাসাদের সবাইকে ঘটনাটা জানিয়ে সাবধান করে দিয়ে গিয়েছে মহারাজকে বিরক্ত না করতে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মহারাজের পক্ষে। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই অনিন্দ্যসুন্দর যুবাপুরুষটির বিবাহ যখনই হোক তিনি অন্তত সঙ্গিনীর সান্নিধ্য উপভোগ করুন। যে বয়সের যা। তার ওপর এতবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তিনি। রাজমাতার নৈকট্য কখনো তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটাতে সাহায্য করবে না। এভাবে পুত্রকে আগলে রাখা রাজমাতার অনুচিত। প্রাসাদের প্রতিটি প্রাণী তাই পদ্মাক্ষের কর্মের সমর্থক।

রাজমাতা একসময়ে অস্থির হয়ে উঠে তাঁর পরিচারিকাবর্গকে তিরস্কার করেন। চিৎকার করে বলেন—মহারাজা কোথায়?

একজন বিনতভাবে কোনরকমে বলে—উদ্যানে।

—উদ্যানে, সেকথা আমিও জানি। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে? সে কি জীবিত আছে?

—প্রতিদিনের মত প্রহরীরা প্রহরায় নিযুক্ত আছে। মহারাজ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

—চুপ কর।

রাজমাতা অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে বাইরের অলিন্দে ছুটে আসেন। আর সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সম্মুখে। মহারাজা বিম্বিসার সারা মুখে পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে প্রবেশ করছেন। সঙ্গে তাঁর এক রূপসী নারী। রাজমাতার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে যায়।

বিম্বিসার সঙ্গিনীকে বলেন—ইনিই রাজমাতা। এই প্রাসাদের অধীশ্বরী। এঁকে প্রণাম কর।

উদাম্বরীকা দেবী আনত হয়ে প্রণাম করতে গেলে ঝটিতি পেছনে সরে দাঁড়ান রাণী।

বিম্বিসার আশ্চর্য হয়ে বলেন—সে কি মা! প্রণাম নেবে না?

—অজ্ঞাতকুলশীলা কোন রমণীর প্রণাম নিতে আমি অক্ষম।

অম্বরীকা মুহূর্তে তার নারীসুলভ সহজাত অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করল রাণীমাতার অবিসংবাদিত আধিকারত্বের সীমানায় প্রবেশোদ্যত সে-ই প্রথম রমণী। তবু সে ভীত হল না। মহারাজের সঙ্গে কিছুক্ষণের মেলামেশাতে তার বুকে নির্ভরতা এনে দিয়েছে।

বিম্বিসার গম্ভীর হয়ে বলেন—প্রণাম নাও মা। এ অজ্ঞাতকুলশীলা নয়। পরে বলব তোমাকে!

প্রণাম নিতে বাধ্য রাজমাতা। এটা মহারাজের আদেশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন—এ কোথায় থাকবে?

—প্রাসাদে। কাউকে বল ওর কক্ষ দেখিয়ে দিতে।

কথাটা শেষ করে মহারাজা বিম্বিসার স্থানত্যাগ করেন। রাজমাতার মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হয় না। পুত্র এভাবে তাঁর সঙ্গে কখনো কথা বলেনি। আজই প্রথম। আজ প্রথম তার কথায় কোন সুর নেই, রেশ নেই, ছন্দ নেই। শুধু কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কথা মাত্র। বুঝলেন এতদিনের সুরক্ষিত দুর্গে ফাটল ধরল। এই ফাটল এখন বৃদ্ধি পাবে দিনে দিনে।

তিনি এক পরিচারিকাকে চোখের ইঙ্গিতে কাছে ডাকেন। বলেন—একে উত্তরের ত্রিকোণ কক্ষটি দেখিয়ে দাও। সেখানে থাকবে। একজন দাসী দেবে একে।

কথাটা বলে কোনদিকে না তাকিয়ে রাজমাতা ছুটে নিজের প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করেন। স্বামীর শোক আজ বহুদিন পরে তাঁকে দ্বিগুণভাবে অভিভূত করতে চাইছে! অশ্রুজলের মাধ্যমে এই শোককে দ্রবীভূত করে ফেলতে হবে। সম্মুখে কঠোর সংগ্রাম। ক্রন্দনরত অবস্থায় একবার তাঁর খেয়াল হয় যে তিনি স্বামীর অকাল বিয়োগে অবিরত তাঁর প্রতি দোষারোপ করে চলেছেন। তিনি পৃথিবী থেকে এভাবে সহসা বিদায় না নিলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতেন বিম্বি।

আর কেউ লক্ষ্য করুক বা না করুক প্রয়াত মহারাজের বয়স্য পদ্মাক্ষ ঠিকই দেখেছে যে মহারাজ বিম্বিসারের মধ্যে যে চাঞ্চল্য এতদিন পরিলক্ষিত হত কদিন ধরে তা কিছুটা স্তিমিত। এটি আরও স্তিমিত হয়েছে উদাম্বরীকার মত আরও

নারীর প্রয়োজন। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটি সম্ভব নয়। আশা করা যায় মহারাজা এখন নিজেই নিজের পথ দেখে নিতে পারবেন। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। মহাপদ্মের চেয়ে তাঁর বুদ্ধি অনেক বেশী। তেমনি তাঁর আবেগ ও ক্ষুধাও যথেষ্ট। রাজমাতা সেই প্রবল আবেগকে ওভাবে রুদ্ধ রেখে দেশের সমূহ ক্ষতি করছিলেন। মহারাজা ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে রাজকার্য অবহেলা করার মত সাধারণ ব্যক্তি নন। কিন্তু অম্বরীকার পিতাকে কি কারণ দর্শানো যায় পদ্মাক্ষের মাথায় আসে না। তিনি অনেকবার কন্যার অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। প্রাসাদপুরীতে প্রবেশের পর সে যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। উদ্যানে আর মহারাজের সঙ্গে তাকে দেখা যায় না। তবে গোপন সূত্রে পদ্মাক্ষ জানতে পেরেছে মহারাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক ঘনীভূত হয়েছে এবং এই ঘনিষ্ঠতা অম্বরীকার প্রকোষ্ঠেই সংঘটিত হচ্ছে। সে আরও জেনেছে রাজমাতার সঙ্গে মহারাজের ব্যবধানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু প্রাসাদ থেকে বাইরে আসা এই সমস্ত সরস সংবাদ চাপা পড়ে যায় অঙ্গদেশ অভিযানের প্রস্তুতির ভেতরে। পদ্মাক্ষ যথার্থ বুঝেছিল বিম্বিসার সাধারণ মানুষ নন। সর্বপ্রথম তিনি মগধেশ্বর। তারপর পুত্র বা প্রেমিক কিংবা যখন স্বামী হবেন স্বামী এবং পিতা। সবার আগে তিনি নৃপতি বিম্বিসার।

অঙ্গদেশ মগধরাজ্যের পূর্বদিকে অবস্থিত। উভয় রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা চম্পা নদী। এই নদীর নামানুসারে অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম চম্পা। মগধের সঙ্গে কোনদিনই সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চম্পার ছিল না। এমনও শোনা যায় একসময় কোন এক অঙ্গরাজ মগধকে কিছুদিন পদানত করে রেখেছিল। সেই সময় তৎকালীন মগধরাজ অঙ্গসৈন্য দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে অনন্যোপায় হয়ে পরিত্রাণ লাভের আশায় চম্পা নদীতে ঝম্প প্রদান করেছিলেন। ওই নদীর অধীশ্বর ছিলেন নাগরাজ চম্পেয়। তিনি মগধরাজকে সাহায্য করায় শেষ পর্যন্ত অঙ্গরাজ পরাভূত হন। প্রকৃতপক্ষে অঙ্গদেশের প্রতি বিদ্বেষ মগধের অধিবাসীদের অন্তরে যুগ যুগ ধরে সুপ্রোথিত। তাই সামান্য সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে এসেছে।

বিম্বিসারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অঙ্গদেশ স্থায়ীভাবে মগধের অঙ্গীভূত করতে হবে সর্বপ্রথম। তারপর ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্যকেও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কিন্তু রাজমাতা বিম্বি ইতিমধ্যে নিজের হৃত সম্মানকে পুনরুদ্ধারের আশায় অন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি দেখলেন উদাম্বরীকা দেবী প্রাসাদে

আসার পর থেকে মহারাজের পরে এতদিন রাজপুরীতে যে সম্মান তিনি পেয়ে আসছিলেন তার অনেকখানি অংশ অলক্ষ্যে পেতে শুরু করল এই মেয়েটি। এটা সহ্য করা যায় না। তবু যদি মেয়েটি মহারাজের পরিণীতা বধূ হত। একদিন তিনি অম্বরীকাকে ভয় দেখিয়েছিলেন। পরদিনই নিজের গর্ভের সন্তান তাঁকে ডেকে বলেছিলেন মেয়েটিকে তিনি নিজে প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন এটি তাঁর গর্ভধারিণী বিস্মৃত না হলে সুখকর হবে। বিম্বি বুঝলেন মহারাজের দুর্বলতম মুহূর্তে অস্ফুট উচ্চারণে তার কানে কথাটা পৌছে দিয়েছে হতভাগিনী। সুতরাং এভাবে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। একদিন তিনি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। রাজমাতার মন্ত্রীকে ডেকে পাঠাবার অধিকার আছে।

মন্ত্রী এসে উপস্থিত হলে তিনি কোন রকম ভূমিকা না করে বললেন—এবারে মহারাজের পূর্ণ মর্যাদায় রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের সময় হয়েছে।

মন্ত্রী বিম্বির অভিমত সমর্থন করে বলেন—আপনি যথার্থ বলেছেন রাণীমা।

মন্ত্রীর সম্বোধনে হৃদয়ের অভ্যন্তরে কোথায় যেন ব্যথা অনুভূত হল। এই মন্ত্রী তাঁর স্বামীর সময় থেকে আছেন। তখন তাঁকে সম্বোধন করতেন 'মহারাণী' বলে। মন্ত্রী হয়ে তিনি নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করতে পারেন না। তাই সেদিনের মহারাণী আজ রাণীমাতে পর্যবসিত। কত পার্থক্য। মহারাণী যেন অলঙ্কার-বিভূষিতা কোন অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী। আর রাণীমা? নিঃস্ব রিক্ত অলঙ্কার-বিহীনা এক নারী মাত্র।

—অভিষেকের ব্যবস্থা করতে হয়।

—কিন্তু রাণীমা, তার পূর্বে মহারাজের বিবাহের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

—আমি সেইজন্য আপনাকে ডেকেছি। আপনি বিজ্ঞতম ব্যক্তি। কন্যার সন্ধান করুন। আমি চাই সত্বর মহারাজের বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হোক।

মন্ত্রী হৃদয়ঙ্গম করেন রাণীমার ব্যথা কোথায়। তবু রাণীমা ঠিক কথা বলেছেন। আশু মহারাজের বিবাহের প্রয়োজন। নইলে তিনি নীতিবিরুদ্ধভাবে রমণীদের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। সেটা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না কখনো।

তিনি বলেন—মহারাজের যোগ্য কন্যার সন্ধান করতে হলে অন্যান্য রাজ্যের অধীশ্বরদের কন্যার খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন।

—অবশ্যই। তবে কন্যা রূপসী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র রাজকন্যা হলেই মগধের অধিশ্বরী হবার উপযুক্তা বলে ভাবা উচিত নয়।

—হ্যাঁ রাণীমা। তাছাড়া সেই কন্যাকে সর্বপ্রথম আপনারই পার্শ্বে এসে দাঁড়াতে হবে। আপনার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তাই আপনার মত এতটা সুন্দরী না 'হলেও আপনার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অবশ্যই তাঁর থাকতে হবে।

বিম্বি সন্তুষ্ট হলেন মন্ত্রীর কথায়। তিনি বলেন—কোন সন্ধান ইতিমধ্যে করেছেন কি ?

—না, ইতিপূর্বে আপনি কিংবা মহারাজা তেমন ইঙ্গিত দেননি। তবে আমি চতুর্দিকে দূত পাঠাচ্ছি। কিন্তু তার আগে মহারাজের সম্মতির প্রয়োজন হবে না কি !

রাণীমা ভ্রূকুঞ্চিত করেন—সম্মতি ? ও মহারাজের সম্মতি। বেশ, নিন।

মন্ত্রী প্রস্থান করেন। বিম্বি আঙুলের ডগায় ওড়না জড়াতে জড়াতে আপন কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করেন।

পরদিন রাজসভা বসার পূর্বে মন্ত্রী সভাকক্ষ সংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে রাণীমার ইচ্ছার কথা জানান।

মহারাজা বিম্বিসার বিস্মিত কণ্ঠে বলেন—মা বলেছেন ? আমাকে তো বলেননি !

মন্ত্রী স্থির বুদ্ধির মানুষ। তিনি বলেন—আপনি রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন। সময়মত রাণীমার সঙ্গে দেখা হয় না। তাই সম্ভবত আপনাকে বলার সুযোগ পাননি। নইলে আপনাকে বলতেন।

বিম্বিসারও মূর্খ নন। তিনি বলেন—তাই হবে। তবে অঙ্গদেশ অভিযান শেষ করার আগে আমি অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। আমার অভিপ্রায় হল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির কন্যাদের বিবাহ করা। তাদের সবাইকে পরমা সুন্দরী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমার উদ্দেশ্য হল বিবাহসূত্রে সেইসব রাজ্যকে মগধের অধীনে নিয়ে আসা। আর সেটা সম্ভব না হলে অন্তত আজীবন আমার মিত্র যেন থাকে তারা।

মন্ত্রী বলেন—আপনার দূরদৃষ্টি প্রশংসার যোগ্য। আমি রাণীমাকে জানাব।

মায়ের উদ্দেশ্য বুঝতে বিম্বিসারের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়নি। অম্বরীকার অস্তিত্ব মায়ের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাই মন্ত্রীর মাধ্যমে এই নতুন উদ্যোগ। মন্দ কি। শুধুমাত্র অম্বরীকায় একটা একঘেয়েমী এসেছে অস্বীকার করা যায় না। অঙ্গ অভিযান শেষ হলে মায়ের এই উদ্যোগে ইন্ধন যোগাতে হবে।' তবে সর্বাগ্রে মহাকোশলের রাজকন্যার স্থান। শোনা যায় সে শুধু অসামান্যা রূপসী নয়,

বিদুষীও। তাছাড়া কোশলরাজের মত শক্তিশালী নৃপতির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ থাকা কম কথা নয়। আর উনি তাঁর কন্যাকে উপঢৌকন রূপে নিশ্চয় কোন মূল্যবান ভূসম্পত্তি দান করবেন। কোশলের রাজকন্যার পর স্থান হওয়া উচিত বৈশালীর লিচ্ছবি বংশজাত রাজকন্যার। এরা পরাক্রমে কোশলরাজকে অতিক্রম করে। তারপরে আরও সব রাজ্যের সন্ধান নিতে হবে। রাজপ্রাসাদে রাণী হয়ে আসা সুন্দরীদের মেলা বসবে ভাবতেও পুলকে হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। অম্বরীকার সাধ্য কি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। তবে অম্বরীকা অনেক দিয়েছে। আর ভালবাসুক না বাসুক, তার অভিনয় করেছে। ওকে প্রতারিত করা শোভা পায় না। তাছাড়া ওর প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। যৌবনের প্রথম নারী যে সে, একথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানতে হবে। ওর মাধ্যমে যৌবনকে উপভোগ করার শিক্ষালাভ। সেইদিক দিয়ে ও তুলনাহীন। পদ্মাক্ষ যদি খেলার সামগ্রীর মত নির্জন উদ্যানে ওকে ফেলে রেখে না যেত, তাহলে ও হয়ত ওর মর্যাদা পূর্ণ মাত্রায় পেত। পদ্মাক্ষ ওর এই জীবনটার সর্বনাশ করে দিয়েছে। অম্বরীকাকে এখন অন্য কোনভাবে মনে স্থান দেওয়া কঠিন। পদ্মাক্ষের মাধ্যমে অম্বরীকার পিতার অনুরোধ সে অনেকবার জেনেছে, কিন্তু করার কিছু নেই। তবে অন্যান্য দেশের রাজকন্যারা রাণী হয়ে এই প্রাসাদে আসার পরেও অম্বরীকার যাতে এখানে একটা নিরাপদ এবং মোটামুটি সম্মানের স্থান থাকে তার ব্যবস্থা করা হবে। যাতে সে নিজেকে কখনো অবাঞ্ছিত বলে মনে না করে। হয়ত দু-চার বছর পর পর তার কক্ষে যাবারও সময় হবে।

সেদিন রাত্রে বিম্বিসার উদাম্বরীকার কক্ষে প্রবেশ করলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বিম্বিসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষের প্রাচীরের সব কটি কাষ্ঠখণ্ড ও ইষ্টকই কথা বলে। যেখানে যা ঘটছে সবকিছু তারা বলে দেয়। নইলে এমন আকুল হয়ে অম্বকে তিনি কখনো কাঁদতে দেখেননি।

তার মাথায় হাত রেখে বিম্বিসার প্রশ্ন করেন—কি হয়েছে? কোন দুঃসংবাদ?

অম্ব নিজে থেকে যা কোনদিন করতে চায়নি আজ তাই করে ফেলে। সে দু-বাহু বাড়িয়ে বিম্বিসারের কণ্ঠলগ্ন হয়ে তার বক্ষে মুখ রাখে। অথচ অবাক হয়ে বিম্বিসার অনুভব করেন, যে নারী তাঁকে এত দিল যার কাছ থেকে তিনি এত শিখলেন, তার এই বুক ভাঙা ক্রন্দনে এতটুকুও দুঃখ অনুভূত হল না। হৃদয় আগের মতই শীতল। বুঝলেন এই সুন্দরী রমণী তাঁর হৃদয়ে প্রেম এনে দিতে পারেনি। বুঝলেন যতই উতলা হোক সে, বিম্বিসারকেও সম্ভবত সে ভালবাসতে

পারেনি। সে বোধহয় চেয়েছিল মগধের অধীশ্বরী হয়ে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য উপভোগ করতে এবং সেই সঙ্গে মহারাজার সংসর্গ। নইলে একজন অজানা অচেনা পুরুষের সঙ্গে কেন সে চলে আসবে এখানে? কেন সে নির্জন উদ্যানে মহারাজের সঙ্গে মিলিত হবে? কোন মর্যাদাসম্পন্না নারী হলে কি পারত? তবু, একে অবহেলা করা যাবে না।

অম্বরীকা বলে—আমার দিন শেষ হয়ে এল মহারাজা। আপনার নতুন রাণী আসবে। তখন আমার কি হবে? আমার পিতা আমাকে আর গ্রহণ করবেন না। ক্ষুদ্র হলেও তিনি একটি ভূখণ্ডের অধীশ্বর। এতদিন তিনি প্রজাদের বলে এসেছেন, আমি মগধের রাণী হব। এখন সবাই জেনে ফেলেছে আমার অবস্থা। তারা আমার পিতাকে আমার কথা ভুলে যেতে বলেছে। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন আমি তাঁর কাছে মৃত। তাহলে? আমি কোথায় যাব? ওই পাঁচটি পর্বতের কোন একটিতে কি আমি নির্বাসিত হব?

—না অম্ব। আমি স্থির করেছি তুমি আজীবন এই প্রাসাদেই থাকবে।

—প্রাসাদে? উপপত্নী হয়ে?

বিম্বিসার গম্ভীর হয়ে বলেন—তা জানি না। এখন যেভাবে আছো সেইভাবে।

—এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল ছিল।

—এখন সেকথা ভেবে লাভ নেই। চোখের জল মুছে ফেলো। আমি তোমার এখানে আসি আনন্দ পেতে। তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করব। একথা একবার বলেছি। তবু যদি শান্ত না হও আমি চললাম।

উদাম্বরীকা মহারাজের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। মুখে হাসি এনে বলে—ক্ষমা করুন প্রাণেশ্বর। আপনি আমার সব। পৃথিবীতে অন্য কোন পুরুষকে দেখিনি। শুধু আপনাকে কিছুদিনের জন্য আনন্দ দিতে ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। আপনি ফিরে যাবেন, তাই কখনো হয়? আর আমি কাঁদছি না—এই দেখুন। আসুন।

তার কথায় মধু ঝরে। বিম্বিসার জানেন, এই কথায় সবটাই অভিনয় নয়। তিনি অম্বর সঙ্গে তাঁর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত সুসজ্জিত শয্যার দিকে এগিয়ে যান।

অঙ্গদেশ পদানত হল। ঠিক যেভাবে একসময়ে মগধের কোন রাজাকে অঙ্গরাজ

বিতাড়িত করেছিলেন, সেই একইভাবে বিম্বিসারের নিকট যুদ্ধে পরাভূত হয়ে প্রাণের ভয়ে বর্তমান অঙ্গরাজ সপরিবারে চলে গেলেন আরও পূর্বদিকে, গঙ্গানদী যেদিক দিয়ে গিয়ে সাগরে মিশেছে। তিনি জানেন, মগধরাজ বিম্বিসার শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক। তাঁর রণকৌশল অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর। তাঁর ব্যূহ রচনা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। জীবিতাবস্থায় বিম্বিসারের কবল থেকে অঙ্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন আশা নেই।

অঙ্গের রাজধানী চম্পানগরীতে বিম্বিসার রেখে এলেন একজন প্রধান প্রশাসককে। মনে মনে ঠিক করলেন যখন তাঁর পুত্র হবে সেই রাজপুত্র এই অঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করবে।

কিন্তু কবে জন্মগ্রহণ করবে সেই পুত্র? কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে? কিছু ঠিক নেই। তবু তেমন হতেই হবে একদিন। এক রাণী ব্যর্থ হলে অপর রাণী, তিনি ব্যর্থ হলে আর একজন। একজন না একজন নিশ্চয় একটি পুত্রসন্তান উপহার তাঁকে দিতে পারবেন।

অঙ্গরাজ্য বিজয় করে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজমাতা বিম্বি আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি পুত্র এবং মন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন বিবাহের কথা। বিলম্ব তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তাঁর সর্বদা ভয় উদাম্বরীকা যদি গর্ভবতী হয়ে পড়ে তখন কি উপায় হবে? তার সন্তানকে কথনো পরিত্যাগ করা যাবে না। শত হলেও সেই সন্তানের জন্ম রাজার ঔরসে—যার ফলে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার তারও থাকবে। এতদিন যে এসব কিছু ঘটেনি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলতে হবে। মনে হয় মেয়েটি বন্ধ্যা।

মহারাজের অভীপ্সা অনুযায়ী মন্ত্রী কোশলরাজের নিকট প্রথম প্রস্তাব প্রেরণ করলেন। এর পূর্বে তিনি দেশে দেশে দূত পাঠিয়ে রাজকন্যাদের সংবাদ জেনে নিয়েছিলেন। রাজকন্যা কোশলদেবীর রূপ ও গুণের কথা কারও অজানা নয়। মন্ত্রী প্রস্তাব পাঠিয়ে আশঙ্কায় দিন গুনতে থাকেন। মুখে তিনি কিছু না বললেও মনে মনে ভয় ছিল কোশলরাজ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও করতে পারেন। কারণ চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী উত্তর ও পশ্চিমদিকের রাজন্যবর্গ পূর্বদিকের রাজপরিবারকে একটু হেয় চোখে দেখে। কোশলরাজ্যবাসীদের এখনো ধারণা তাদের দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম মগধের চেয়ে আগে বিস্তার লাভ করেছিল বলে তারা উচ্চবর্ণের। কিন্তু দূত কিছুদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করল অত্যন্ত সুখবর নিয়ে। কোশলরাজ তাকে অভাবনীয় সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং মগধরাজের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছেন।

মন্ত্রী একটু আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি বুঝলেন কোশলরাজের এই মনোভাবের কারণ বিম্বিসার স্বয়ং। তাঁর সৈন্য পরিচালনার খ্যাতি ইতিমধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষত যেভাবে তিনি অঙ্গদেশ জয় করেছেন তার প্রশংসা সবাই করেছে।

কোশলরাজের কন্যার সঙ্গে মগধরাজের পরিণয়ের সংবাদ প্রজাকুলের মধ্যে প্রচারিত হতে তারা খুব আনন্দিত ও গর্বিত হল। এ এক ধরনের জয়। মগধরাজেব পরাক্রমকে কোশলরাজ নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন।

অম্বরীকার কক্ষ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দীপ জ্বলেছিল যথাসময়ে। সে স্বহস্তে নিবিয়ে দিয়েছে। তার কক্ষ নিষ্প্রদীপ অথচ বাইরে প্রাসাদে এবং নগরীতে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। রাজপ্রাসাদ এত বেশী আলোকিত যে নিশীথ সূর্যের মত ভাস্বর।

উদাম্বরীকার বাতায়ন প্রাসাদের পশ্চাতে। তবু সেদিকেও আলো আর আলো। সেই আলোর রেখা তার অন্তরে প্রবেশ কবতে পারে না। কিছুদিন থেকে সে লক্ষ্য করে আসছে প্রাসাদের পরিচারিকাবৃন্দের কাছে তার গুরুত্ব কমে আসছে। খুব স্বাভাবিক। আজকে তো বলতে গেলে সবাই তাকে বর্জন করেছে। আজ এতদিনের অবহেলিত রাজমাতা বিম্বি স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ সকলে উৎসাহ সহকারে পালন করছে।

একটু পরে কোশলদেবী রাজবধূরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন। রাজগৃহ নগরীতে প্রবেশের প্রধান দ্বারদেশে মহারাজা এবং মহিষীর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে কিছুক্ষণ পূর্বে। অম্বরীকা জানে মহাকোশলরাজের সামর্থ্যের সঙ্গে তার পিতার সামর্থ্যের কোন তুলনা হয় না। তার ওপর মগধরাজের নববধূকে তাঁর পিতা কাশী নামে বিখ্যাত একটি গ্রাম দান করেছেন যৌতুক রূপে। সেই সুবিশাল ভূখণ্ডের রাজস্ব থেকে কোশলদেবীর স্নান ও রূপচর্চার যাবতীয় সুগন্ধি সামগ্রী ক্রয় করা হবে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সুন্দরী কোশলদেবী রূপচর্চায় পারদর্শিনী। অম্বরীকা জানে, তার পিতার যতটুকু রাজ্য কাশীর আয়তন প্রায় তার সমান। তাছাড়া কাশী গ্রামখানি অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পদ্মাক্ষ যখন তার পিতার নিকট গিয়ে মগধরাজের কথা উত্থাপন করেছিল, তখন তার পিতা ওভাবে কন্যাকে ছেড়ে দিতে চাননি। পিতার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। সম্পূর্ণ নিজের দোষে তার এই অবস্থা। তার

প্রলোভন তাকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছে।

বাইরে বাদ্যধ্বনি শোনা যায়। নতুন মহারাণীকে নিয়ে নৃপতি বিম্বিসার নিশ্চয় শোভাযাত্রা করে প্রাসাদে প্রবেশ করছেন। সে সবার অলক্ষ্যে প্রাসাদ শীর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। কাষ্ঠনির্মিত সোপান শ্রেণীতে এক ধাপ এক ধাপ করে অতি কষ্টে আরোহণ করে। শব্দ হলেও ক্ষতি নেই। বাইরের শব্দে এ-শব্দ ডুবে যাবে। তাছাড়া সবাই এখন প্রাসাদের সামনের দিকে। ওপরে কি কেউ আসবে? শরীর ভেঙে আসছে অম্বরীকার, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে পারে না সে।

শেষ ধাপ অতিক্রম করে শীর্ষ দেশে উঠতে সে অপর এক রমণীর সম্মুখীন হয়। তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে।

তার মুখ থেকে অস্ফুট উক্তি নির্গত হয়—আপনি!

—তুমি!

মহারাজ বিম্বিসারের গর্ভধারিণী রাজমাতা বিম্বি তার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

অম্ব কি বলবে ভেবে পায় না। কোনরকমে বলে—আমি—

—মগধের রাজমহিষীকে লুকিয়ে দেখতে এসেছ? দেখ। দাঁড়িয়ে থেকো না।

অম্বরীকার যতটুকু কৌতূহল ছিল, কখন যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সে বলে—না। এমনিতে। আমি যাই।

—দাঁড়াও। তুমি সত্যই দুর্ভাগিনী। তোমার রূপ আছে। গুণও হয়ত আছে। তোমার আকর্ষণে এতদিন আমার পুত্র সংযত ছিল। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

—মা।

রাজামাতাকে বিচলিত বলে মনে হল এই সম্বোধনে। তিনি বলেন—শুনলাম বিম্বিসার তোমাকে প্রাসাদে থাকার অনুমতি দিয়েছে। ভালই করেছে। পেছনে, ওই শূন্য স্থানে, তরুবীথিকার অন্তরালে আমার জন্য একটি পৃথক বাসগৃহ নির্মাণ করে দেবে। এখানে তোমার কখনো কখনো অসহ্য বলে মনে হবে, আমি জানি। তখন মাঝে মাঝে আমার কাছে গিয়ে থাকতে পার।

অম্ব রাজমাতার পায়ের ওপর মাথা রাখে।

—ওঠো। ভেব না কোশলদেবী বিম্বিসারের একমাত্র মহিষী হয়ে সসম্মানে থাকবে। আমার পুত্রকে আমি চিনি। অপেক্ষা কর, দেখবে আরও অনেক নারী রাণী হয়ে আসবে এই প্রাসাদে। বিম্বিসারের কাছে রমণী হল নতুন

ভূসম্পত্তি অধিকারের উপায়। আর রমণীরা যে ভোগের সামগ্রী ওর কাছে, তোমার চেয়ে সেকথা আর বেশী কে জানে? ওর পিতাও অমন ছিলেন। তবে তিনি আমাকে অবহেলা করতে পারেননি। বিম্বিসারও পারবে না, তেমন নারী রাণী হয়ে এলে। ঈশ্বর করুন, কোশলদেবী যেন তেমন রাণী হয়। শুনেছি তার অনেক গুণ। জানি না তার হৃদয়ে প্রেম আছে কিনা। থাকলে পুত্রকে বশে রাখতে পারবে।

মহাকোশল কন্যার সম্মোহিনী রূপের ছটায় কিছুদিন মোহগ্রস্ত হয়ে থাকলেন বটে বিম্বিসার, কিন্তু রাজকার্যে এতটুকু শৈথিল্য দেখা গেল না। মন্ত্রী ও প্রবীণ সেনাপতিগণ কিছুটা বিস্মিত হলেন। কারণ মহাপদ্ম এমন অবস্থার অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসতে চাইতেন না। বিম্বি যখন নববধূ হয়ে এলেন, তখন মহারাজা দিনের পর দিন রাজসভার কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। শেষে এই মন্ত্রীই একদিন নিরুপায় হয়ে বিম্বির কাছে সংবাদ পাঠান মগধরাজ্য রসাতলে যেতে আর আর বিলম্ব নেই। একমাত্র তিনিই এই অবস্থায় পরিত্রাতার ভূমিকা নিতে পারেন। হয়ত তাঁর খুব কষ্ট হবে, কিন্তু উপায় নেই। হ্যাঁ, বিম্বি মন্ত্রীর সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। মহারাজা ফিরে এসেছিলেন স্বাভাবিক অবস্থায়। বিম্বিসার সেই শ্রেণীর পুরুষ নন। রাজমাতা বিম্বিও সেটি লক্ষ্য করলেন। বুঝলেন, নিজের পুত্রকে চিনতেও বাকি ছিল তার। বিম্বিসারের কাছে সর্বাগ্রে মগধরাজ্য। আর সব আনুষঙ্গিক।

অম্বরীকার সঙ্গে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেও কখনো তৃপ্তি পাননি বিম্বিসার। কতবার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই যদি নারী হয় তাহলে ঈশ্বর বৃথা তাদের সৃষ্টি করেছেন। এরা দেহসর্বস্ব জীববিশেষ। হৃদয় বলে তেমন কিছু নেই, যদিও বক্ষস্থল এদের খুব কোমল। বহিরঙ্গ দেখিয়ে পুরুষকে প্রলোভিত করার জন্য ঈশ্বর অমন করেছেন। ওরা দিতে জানে না, শুধু পেতে চায়।

কোশলদেবীকে বিবাহ করার পরে বিম্বিসার স্তম্ভিত হলেন। তা তো নয়। তাঁর পূর্বের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ যে দেখছি হৃদয়সর্বস্ব। এর রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে হৃদয়ে তলিয়ে যাওয়া যায়। তবু সেই অগাধ হৃদয়ের তল মেলে না। ঈশ্বরের এ যে এক অসাধারণ সৃষ্টি।

কতবার কোশলদেবী সুমিষ্ট কণ্ঠে মহারাজকে প্রশ্ন করেছেন—তুমি কথা বলতে বলতে অমন অন্যমনস্ক হয়ে যাও কেন?

—আমি তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করি।

কোশলদেবী হেসে বলেন—পারবে না।

—কেন?

—নারী যে রহস্যময়ী। তারা তো পুরুষ নয় যে সবটুকু স্পষ্ট। তোমাদের তাতেই পৌরুষ। নারী ঠিক বিপরীত। ওইটুকুই তার নিজস্ব। ওইটুকু পুরুষের কল্পনায় রঙিন হয়ে তাকে আরও রমণীয় করে তোলে। তাই আমরা তোমাদের ভালবাসা পাই। আমরা তোমাদের মত অত স্পষ্ট হলে এতটুকুও মূল্য থাকত না।

জীবনে প্রথম রমণীর কথায় চিন্তামগ্ন হন বিম্বিসার। এত গভীরভাবে রমণী কথা বলতে পারে, জানতেন না। তিনি একসময় বলেন—প্রাসাদে একজন রমণী আছেন।

—আমি জানি।

চমকে উঠে বিম্বিসার বলেন—জান? কি জান!

—উদাম্বরীকার কথা বলছ তো?

—আশ্চর্য! কে বলল তোমাকে?

—আমি তোমার মহিষী। প্রাসাদে কে কোথায় আছেন জানব না? আমি এসে সাতদিন পরে সব ঘুরে দেখে নিয়েছি।

—ওকে দেখেছ?

—দেখব না কেন? কথাও বলেছি।

—সত্যি?

—কেন? সে কি ঘৃণ্য? তুমি কি তাই বলতে চাও?

বিম্বিসার কোন উত্তর দিতে পারেন না। শুধু কোশল দেবীকে আরও কাছে টেনে নেন। সব কথার সবাক উত্তর হয় না।

সান্নিধ্যের নীরবতা সেখানে উত্তর দেয়।

কিন্তু বিম্বিসার শুধু প্রেমিক নন। তিনি মগধের অধীশ্বর। তাঁর উচ্চাশা, তাঁর স্বপ্ন সীমাহীন। মগধকে তিনি ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। তাই কোশলদেবীর প্রেমে অভিষিক্ত হলেও তিনি থেমে থাকতে পারেন না। সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করতে হলে তাকে সুরক্ষিত করতে হলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে অধিকার করতে হয় কিংবা তাদের সখ্যতা অর্জন করতে হয়। আর সেই সখ্যতা লাভ করতে হলে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায় আর কি আছে? তাই কিছুদিন পরে লিচ্ছবি বংশের এক কন্যাও

এসে প্রাসাদের একটি কক্ষ বধূরূপে অধিকার করলেন। রাজমাতা বিম্বি এখন একটি নতুন ভবনে বাস করেন। প্রাসাদ প্রাকারের অভ্যন্তরে তরুসমাচ্ছন্ন একটি স্থানে ভবনটি নির্মিত হয়েছে। রাজমাতা রূপে তাঁর সম্মান পূর্বের মত অক্ষুণ্ণ। রাজমহিষীরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়ে আসেন।

একে একে চারজন রাণী এলেন প্রাসাদে। শুধু প্রতিবেশী নয়, সুদূর মদ্রদেশের রাজকন্যা সুন্দরী ও দীর্ঘাঙ্গী খেমাকেও তিনি তাঁর রাণী করে আনেন। কয়েক বছরের মধ্যে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা জন্মালো মহারাজার রাণীর সংখ্যা বোধহয় পাঁচশত।

তবু স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, অত বড রাজপ্রাসাদে সব কিছু প্রধানা মহিষী কোশলদেবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। কারণ প্রতিটি রাণীর নিকট ঘন ঘন যাবার সময় না হলেও কোশলদেবীর কক্ষে মহারাজের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয়। কোন রাণীর কথা মহারাজা বিস্মৃত হলে তিনিই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। তারপর অনুরোধ করেন সেই রাণীর কাছে একবার যেতে। কোশলদেবীর অনুরোধ মহারাজ অধিকাংশ সময় মান্য করলেও কখনো কখনো অবাধ্য হন। তাতে মনে মনে কোশলদেবী পুলকিত হলেও মুখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন—তুমি অন্যায় করছ।

মহারাজা রসিকতা করে বলেন—সত্যি বলছ?

—হুঁ।

—আজ একটু অন্যায় করি। কাল বরং ন্যায় করার চেষ্টা করব।

—কাল কিন্তু যেতেই হবে।

—সবার কাছে কি প্রতিদিন যাওয়া যায়?

—কথাটা আগে ভাবলে ওদের জীবন ব্যর্থ হত না। কাল মদ্রকন্যা খেমাকে দেখলাম। দেখলাম সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। বোধহয় ভাবছিল বহুদূর দেশে তার আপন জনের কথা। এখানে তার আপন কেউ নেই।

—কেন? আমি?

কোশলদেবী হেসে বলেন—তুমি আপনজন হলে কি করে?

—আমি ওর স্বামী।

—স্বামী হলে আপনজন হওয়া যায়? ওর সুখদুঃখের কতটুকু খোঁজ তুমি রাখ? ওর অন্তরের কথা কতটুকু জান? ওকে কখনো একটু সোহাগ করেছ, যা না হলে নারীরা শুকিয়ে যায়? ও তো কুরূপা নয়—রীতিমত রূপসী।

বিম্বিসার বলেন—হ্যাঁ, খেমা রূপবতী। কিন্তু তোমার মত কোমল নয়। তোমার মত আমার মুখ দেখে আমার ভেতরটা বুঝতে পারে না। একটু নীরস।

—সুযোগ তো দাওনি। ও মদ্রদেশের কন্যা। বাইরে দেখতে নীরস, অন্তরে রসপূর্ণ। সেই রসের সন্ধান পেতে হলে একটু অন্তত চেষ্টা করতে হয়। আর তোমার মনের কথা জানবে কি করে। তোমাকেই জানে না ভালভাবে। ও তোমাকে শুধু সমীহ করে। ওর ভালবাসা পাও আগে।

—বুঝলাম। আজ ওর কাছে যাব। তাই বলে সবার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।

—যাওয়া তোমার কর্তব্য। তারা সারা বছর ধরে ওই একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে সেই মুহূর্তটুকুর প্রতীক্ষায় বসে থাকে। ওরা বন্দিনী।

—না ওরা তোমার মতই স্বাধীন। তোমার সঙ্গে ওরা সব উৎসবে অংশ নিচ্ছে। কে বলল ওরা বন্দিনী।

—বাইরেটা অমন দেখায় বটে। ভেতরে ভেতরে ওরা সর্বক্ষণ কেঁদে চলেছে। তুমি ওদের আর কষ্ট দিয়ো না। তাতে তোমার মঙ্গল হবে না। অতগুলি নারীর অশ্রুজল অমঙ্গল ডেকে আনবে। ওদেরও ভালবাস। যে কোনভাবে ভালবাস। যাতে ওরা তোমাকে ভাল না বাসলেও তোমার অমঙ্গল কামনা না করে।

—ওরা মগধের রাণী। সেই সম্মান কি কম হল ?

—পুরুষরা বড় অবুঝ। ওই সম্মান ওদের কাছে অর্থহীন। আজ ওরা অতি ক্ষুদ্র কোন রাজ্যের রাণী হলেও সুখী হতে পারত। এমন কি কোন সাধারণ রাজকর্মচারীর পত্নী হয়েও নিজের স্বামীকে আপন করে পেয়ে আনন্দে জীবন কাটাতে পারত।

নৃপতি বিম্বিসারকে চিন্তান্বিত দেখায়। কোশলদেবীর কাছে যে আগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন সেই আগ্রহ কোথায় উধাও হয় !

তিনি বলেন—আজ তবে আমি খেমার কক্ষে চললাম।

কোশলদেবী অন্তরে বেদনা অনুভব করেন। তবু মুখে হাসি আনেন। মহারাজের দিকে এগিয়ে যান। তাঁর বুকে মাথা রাখেন। একবার তাঁর মনে হয়, কী প্রয়োজন অন্যের কথা চিন্তা করার ? পরক্ষণে মহারাজের কল্যাণের কথা ভেবে বলেন—এসো। কাল তোমার অপেক্ষায় থাকব।

মহারাজ বিম্বিসার যখন বিবাহ ও রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত তখন এক অসাধারণ ব্যক্তির উদয় হল রাজগৃহে। প্রাচীর বেষ্টিত নগরীর প্রধান প্রবেশপথের নিকট দাঁড়িয়ে তিনি দ্বাররক্ষীকে প্রশ্ন করেন, মগধের রাজপ্রাসাদে কোন্ পথ ধরে যেতে হবে।

রক্ষীরা বিস্মিত হয়। লোকটির চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি তাঁর অন্তর্ভেদী। দেখলে মনে হয় অত্যন্ত বলশালী। যদিও তাঁর কিছুটা বয়স হয়েছে তবু দৈহিক শক্তি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না।

রক্ষীরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করে গুপ্তচর হতে পারে, গুপ্তঘাতকও হতে পারে।

আগন্তুক ওদের ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারেন তাঁকে ওরা সন্দেহ করছে। তিনি একটু হেসে বলেন—ভয় নেই। তোমাদের মহারাজার ক্ষতি করতে আমি আসিনি। তাঁর সঙ্গে সত্বর সাক্ষাতের প্রয়োজন আমার। আমি বৈশালী থেকে আসছি।

রক্ষীরা জানে, এক লিচ্ছবি কন্যা এখানকার রাণী। নিশ্চয় তাঁর জন্য কোন বার্তা নিয়ে এসেছে লোকটি। তারা রাজপ্রাসাদের পথ দেখিয়ে দেয়।

মানুষটি সোজা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। বয়সে প্রবীণ হলেও তাঁর চেহারা ও কথাবার্তায় অনেকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সেদিন মগধরাজের দর্শনলাভের সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। তাই তাঁকে রাতের মত আশ্রয় নিতে হল একটি ধর্মশালায়। সেখানে যারা ছিল তারাও বুঝল আগন্তুক একেবারে সাধারণ পর্যায়ের মানুষ নয়। কিন্তু লোকটি কারও সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ না দেখিয়ে সামান্য একটু খাদ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম গ্রহণের আয়োজন করেন।

পরদিন রাজসভার কাজ শুরু হতে, সেই পরদেশী দ্বাররক্ষীকে বলেন যে তিনি মহারাজের দর্শনপ্রার্থী। মহারাজের অনুমতি পাওয়া গেলে তাঁকে সভাকক্ষের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সব কটি চক্ষুর দৃষ্টি তাঁর ওপর পতিত হয়। সবার সঙ্গে মহারাজও বুঝতে পারেন লোকটির মধ্যে অসাধারণত্ব রয়েছে। কৌতুহলান্বিত হয়ে তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চান।

আগন্তুক বলেন—মহারাজ, আপনার সুখ্যাতি সুবিস্তৃত। এই ভারতভূমিতে অনেক গ্রহতারা বেষ্টিত হয়ে আপনি সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন।

তাঁর বাক্য শেষ হবার আগেই অনেকের মুখ থেকে প্রশংসাসূচক ধ্বনি নির্গত হয়। লোকটি রীতিমত শিক্ষিত।

মহারাজ প্রশ্ন করেন—আপনার নাম কি?

—আমার নাম গোপাল।

—নিবাস?

—এখন আমি বৈশালী থেকে আসছি। আমাদের তরুণ বয়সে আমার পিতা আমাকে আর আমার ভ্রাতা সিংহকে নিয়ে সেখানে যান। সেখানেই আমাদের দুই ভাইয়ের বিবাহ হয়।

—তার আগে কোথায় ছিলেন?

—আমাদের আদি বাসস্থান বিদেহ। আমার পিতা সেই দেশের মন্ত্রী ছিলেন। রাজরক্ত তাঁর ধমনীতে ছিল।

সভাসদরা সবাই নড়েচড়ে বসে। লোকটি যে সাধারণ নয় প্রথম দর্শনেই বোঝা গিয়েছিল।

বিম্বিসার প্রশ্ন করেন—আপনার পিতা দেশ ছেড়ে বৈশালীতে গেলেন কেন?

—তিনি জানতে পেরেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিল। বৈশালীতেও তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেখানকার মহারাজ তাঁকে নায়ক করেছিলেন। ফলে, আমাদের দুজনের স্ত্রী রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মহারাজা বিম্বিসার মনে মনে স্থির করেন, আজ রাতে বৈশালীর রাজকন্যার কক্ষে যেতে হবে। সে নিশ্চয় গোপালের পরিচয় জানবে।

—আপনার পিতার নাম কি ছিল?

—সকল।

—সকল!

—হ্যাঁ মহারাজ। সকল।

আপনি বৈশালী ছাড়লেন কেন? সেখানেও কি ষড়যন্ত্র? আপনার ভ্রাতা কোথায়?

গোপাল বলেন যে বৈশালীতে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা পাননি। তাই চলে এসেছেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ওখানকার লোকেরা তাঁর ভ্রাতা সিংহকে নায়ক নির্বাচন করল। তাঁর কাছে এটা সম্মানহানিকর বলে মনে হয়েছে। কারণ তিনি জ্যেষ্ঠ। তাই বৈশালী ছেড়ে এসেছেন।

বিম্বিসার গোপালের মধ্যে একটা তেজ, একটা জেদ লক্ষ্য করেন। লোকটা

বুদ্ধিও ধরে। লিচ্ছবি দেশের নাড়িনক্ষত্র সে নিশ্চয় জানে। তিনি মনে মনে স্থির করেন, একে রাজগৃহে রাখতে হবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

গোপালকে তিনি প্রশ্ন করেন—আপনার ভ্রাতা সিংহের প্রতি নিশ্চয় বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

গোপাল হেসে বলেন—না মহারাজ। ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। একমাত্র ভ্রাতাও বটে। ওর প্রতিষ্ঠায় আমি আনন্দিত। সেকথা সিংহও জানে। আমি চেয়েছিলাম আমাকেও মর্যাদা দেওয়া হোক। প্রকৃত ঘটনা হল, আমার স্বভাব উগ্র আর সিংহ খুব নম্র। সাধারণ মানুষের কাছে নম্র স্বভাবের ব্যক্তিরা অধিক গ্রহণীয়। সিংহ আমার সঙ্গে চলে আসতে চেয়েছিল। আমি আসতে দিইনি।

—এখানে আপনি কোন্ ধরনের পদ প্রত্যাশা করেন?

—এখানে আমার সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন নেই। আমি কারও পরিচিত নই। আমাকে আপনি যেভাবে ব্যবহার করবেন আমি তাতে প্রস্তুত। সৈন্যবিভাগে যে কোন পদে রাখতে পারেন। আবার মন্ত্রণাদাতারূপে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার যা অভিরুচি।

বিম্বিসার আর একবার বুঝলেন, অযাচিতভাবে একটি রত্ন পেয়ে গিয়েছেন তিনি।

বিম্বিসারের রাণীর সংখ্যা তো কম নয়। কিন্তু কারও সন্তান হয় না। সবাই তো আর বন্ধ্যা হতে পারে না। রাজমাতা বিম্বি রীতিমত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। বিম্বিসার কি সত্যই অন্য রাণীদের কক্ষে যায়? উদাম্বরীকা মাঝে মাঝে রাজমাতার কাছে আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করেন রাজমাতা মহারাজ সব রাণীর কক্ষে যাতায়াত করে কিনা। উদাম্বরীকা শুষ্ক হেসে বলে—কদাচিৎ।

—কেন, কদাচিৎ কেন? কোশলদেবী কি তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে?

—আমি বলতে পারব না রাণী মা। আমি কে?

—এক সময়ে তুমিই সব ছিলে। তখন তোমার গর্ভে সন্তান এল না কেন?

আনত মুখে বসে থাকে অম্বরীকা।

রাজমাতা বলে ওঠেন—এখন পার তুমি তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে? পার?

—অসম্ভব। রাণীমা একটা কথা আমার মনে হয়। অভয় দিলে বলতে পারি।

—বল। অভয় দিলাম।

—মহারাজা বোধহয় কোন রাণীকেই ভালবাসতে পারেননি।

—সে কি! শুনি নাকি কোশলদেবীর রূপে মুগ্ধ সে।

—আমার ধারণা মুগ্ধ হওয়া আর ভালবাসা এক জিনিস নয়। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে কোশলদেবী মহারাজাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সত্যি রাণীমা পৃথিবীতে এই ভালবাসা দুর্লভ। আমি এক এক সময় ভাবি, এভাবে যদি ভালবাসতে পারতাম। তবু মহরাজা বোধহয় এখনো জানেন না ভালবাসা কাকে বলে। আমিও জানতাম না, এখন জানি।

—তুমি কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।

—উনি যাঁকে ভালবাসবেন, তিনি হয়ত এখনো রাজপুরীতে আসেননি।

—আর কত আসবে?

এ প্রশ্নের উত্তর উদাম্বরীকা দেবীর জানা ছিল না।

রাজসভা চলাকালে বৃদ্ধ মন্ত্রী একদিন সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে প্রাসাদের একটি কক্ষে স্থানান্তরিত করা হল। কারণ তাঁকে তাঁর নিজ গৃহে বহন করে নিয়ে যাবার মত অবস্থা ছিল না। সভা সেদিনের মত ভঙ্গ হল। মহারাজা নিজে মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রইলেন। মন্ত্রীর গৃহে সংবাদ প্রেরণ করা হল। অসুস্থ হবার কিছু পরে মন্ত্রী চেতনা হারিয়ে ফেলেন। চেতনা ফিরে না আসা অবধি এবং কিছুটা সুস্থ না হলে তাঁকে নিজ আলয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। বৃদ্ধ মন্ত্রী বহুদিন থেকে বিপত্নীক। তাঁর পুত্র এখন চম্পা নগরীতে সেখানকার প্রশাসকের মন্ত্রণাদাতা রূপে কাজ করছেন। মন্ত্রীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখা-শোনা করেন। তাদের ডেকে আনা হল। পুত্রকেও সংবাদ প্রেরণ করা হল।

দুদিন পরে মন্ত্রীর চেতনা ফিরল। তিনি মহারাজের খোঁজ করেন। জ্ঞান ফিরেছে শুনে মহারাজা আসেন। বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করেন। বৃদ্ধ তাঁর পিতৃসম।

—মহারাজ।

—বলুন।

—আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। আপনি একজন মন্ত্রী ঠিক করুন।

—আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।

—না। আমি আর সুস্থ হয়ে উঠব না।

—এর জন্য চিন্তা করবেন না। আপনার পুত্র আছেন। চম্পা নগরীতে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছি। আপনি যদি বলেন প্রয়োজন হলে তিনি আপনার স্থলাভিষিক্ত হবেন। আপনি আপাতত তাঁকে পরামর্শ দেবেন। শুধু শুধু উৎকণ্ঠিত হবেন না।

—না। আমি সত্যি বাঁচব না। আর আমার পুত্রের চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি এখানে আছেন।

বিস্মিত মহারাজ প্রশ্ন করেন—কে তিনি ?

—গোপাল।

—বৈশালী থেকে যিনি এসেছেন ?

—হ্যাঁ মহারাজ, উনিই আপনার উপযুক্ত মন্ত্রী। বৈশালীর মানুষেরা মূর্খ। তাই ওঁকে যোগ্য সম্মান দেয়নি।

বৃদ্ধ মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত পুত্রের মুখ দেখতে পেলেন না। পুত্র এসে উপস্থিত হবার পূর্বে প্রাসাদকক্ষে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজগৃহের নগরবাসীরা এই দুঃসংবাদে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়। বৃদ্ধ ছিলেন সবার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। কত মানুষকে তিনি কত ভাবে সাহায্য করেছেন। কত লোক তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

তবু শোক কখনো চিরস্থায়ী হয় না। তেমন হলে মহাকালের গতি রুদ্ধ হয়ে যেত। মন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে পরিণত বয়সে। বিম্বিসারের পিতা মহাপদ্মের ন্যায় তাঁর মৃত্যু অকালে আচম্বিতে হয়নি। হলেও মানুষ ভুলে যেত। নদীর স্রোত কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। মানুষের মনও নদীর স্রোতের মত চিরপ্রবহমান। কোন ঘটনাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। এইভাবে তাকে সৃষ্টি করেছেন বিধাতা।

প্রয়াত মন্ত্রীর উপদেশের মর্যাদা দিয়ে গোপালকে একদিন মহারাজা ডেকে পাঠালেন রাজসভায়। সবার সামনে তিনি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করেন—আপনাকে মন্ত্রীত্বের ভার দিলে আপনি কি করবেন।

—সেই ভার গ্রহণ করব।

—পারবেন ?

—পারব মহারাজ। এই ধরনের কাজে আমার উৎসাহ বেশী।

—বেশ। আজ থেকে আপনি মগধের মন্ত্রী হলেন।

সভার সকলে হতবাক। প্রবীণেরা এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রীর পুত্র মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

তাঁদের প্রত্যেকের মনে আশা ছিল ওই দুর্লভ সম্মানজনক পদ তাঁদের মধ্যে একজনের ওপর অর্পিত হবে। মন্ত্রীপুত্রকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাল। তিনি মহারাজকে প্রশ্ন করেন—আমি কি তবে চম্পা নগরীতে ফিরে যাব মহারাজ?

—না। আপনি এখানে থাকুন। আপনারও প্রয়োজন রয়েছে এখানে। আপনি মন্ত্রীকে সহায়তা করবেন।

মন্ত্রীর পদলাভের সুসংবাদ বৈশালীতে ভ্রাতা সিংহকে জানাতে বিলম্ব করলেন না গোপাল। সিংহ এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে এত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন যে তিনি তখনই রাজগৃহে যাত্রার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাধা আসে স্ত্রীর নিকট হতে। তিনি বলেন, পরমাসুন্দরী দুই কন্যার বিবাহ না দিয়ে এভাবে রাজগৃহে যাওয়া ঠিক হবে না। সিংহ স্ত্রীর কথা উপেক্ষা করতে পারেন না। কথায় যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। তিনি ভ্রাতা গোপালকে পত্র দিয়ে জানালেন যে তাঁর রাজগৃহে যাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দুই কন্যা বাসবী ও উপবাসবীর বিবাহ না দিয়ে যেতে নিষেধ করলেন তাঁর স্ত্রী। শৈশবে ওরা দুই ভগিনী কেমন ফুলের মত ছিল নিশ্চয় স্মরণে আছে। এখন ওরা বৈশালীর সেরা সুন্দরী। ওদের বিবাহ রাজা মহারাজার গৃহে না দিলে ওদের সৌন্দর্যের অবমাননা করা হবে বলে ওদের গর্ভধারিণীর ধারণা। কিন্তু রাজা মহারাজাকে পাত্ররূপে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। তাই এই মুহূর্তে যাওয়া সম্ভব হল না। ওদের বিবাহের পরে মগধরাজ্যের মন্ত্রীবরের গৃহে কিয়ৎদিবস অতিথি হয়ে থাকার বাসনা রইল।

ভ্রাতার পত্র পেয়ে গোপালের খুব আনন্দ হল। শৈশব থেকেই সিংহ কৌতুকপ্রিয়। পত্রের মধ্যেও সেই কৌতুকের আভাস। অথচ সে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। দুই সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যার পিতা হয়েও যে তার রসবোধ এখনো অটুট রয়েছে, এটা তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয়। সে বুদ্ধিহীন নয়। তাহলে বলা যেতে পারত সে তরল মস্তিষ্কের বলে এই অবস্থার গুরুত্ব বোঝে না। গোপাল জানেন, তাঁর ভ্রাতার নম্রতা এবং রসবোধের জন্য ওখানকার মানুষেরা পিতার শূন্যস্থানে তাকে নায়ক নির্বাচিত করেছিল।

ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় বাসবী ও উপবাসবীর কচি মুখের কথা মনে পড়ে। সত্যই ফুলের মত ছিল। এখন সেরা সুন্দরী। মাঝে কয়েকটি বছর কেটেছে। বৈশালী থেকে রওনা হয়ে তিনি সোজা রাজগৃহে আসেননি। সাময়িক বিতৃষ্ণায় একসময় মনে হয়েছিল হিমালয়ের ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু পথিমধ্যে এক ঋষি হস্ত উত্তোলন করে তাঁর গতিরোধ করেন। নিকটে ডেকে বলেন—ফিরে যাও বৎস। সন্ন্যাসের পথ তোমার নয়। সন্ন্যাসী হবার পথে অন্তরায় যে সকল

বৃত্তি, সবগুলি তোমার মধ্যে উগ্রভাবে বর্তমান। ফিরে যাও।

ঋষির উক্তি গোপালকে লজ্জিত করেছিল। ওখান থেকে অনেক পথ অতিক্রম করে অবশেষে এই রাজগৃহে। এখন তিনি এখনকার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।

প্রাসাদের রক্ষী ও পরিচারিকাবৃন্দ জানে মহারাজের সন্তান না হওয়ায় রাজমাতা বিম্বি রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠেছেন। কমবয়সী পরিচারিকারা গা টেপাটেপি করে বলে, একটি সন্তান উপহার দিতে পারলে রাণী হবার সুযোগ আসতে পারে। রক্ষীরা মনে মনে ভাবলেও মুখে বলতে পারে না যে মহারাজের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই।

রাজমাতা এসব বিষয়ে আগে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডেকে পরামর্শ করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে গোপালকে কখনো ডেকে পাঠাননি। তাঁর মনে মনে ইচ্ছা ছিল বৃদ্ধ মন্ত্রীর পুত্রই মন্ত্রী হোক। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

গোপাল রাজমাতার উদ্বেগের কথা জ্ঞাত ছিলেন। এই উদ্বেগ অহেতুক নয়। মহারাজা নিজে কি ভাবেন জানা নেই, তবে একে গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না। এত বড় রাজ্যের কোন উত্তরাধিকারী এখনো জন্মগ্রহণ করল না। অথচ রাজার একাধিক রাণী। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ের কথা মনে পড়ে গোপালের। তারা সাক্ষাৎ রাজার পুত্রী না হলেও রাজরক্ত তাদের মধ্যে রয়েছে। রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তও বটে। আর রূপে গুণে তারা যে কোন রাজকুমারীকে পেছনে ফেলে রাখতে পারে। এইসব ভেবে একদিন গোপাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজমাতার দর্শনপ্রার্থী হন।

প্রথম দর্শনে পুত্রের মন্ত্রী নির্বাচনের প্রশংসা করলেন রাণীমা মনে মনে। মানুষটি যে বুদ্ধিমান এবং চটপটে একদৃষ্টিতে বোঝা যায়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাঁর দর্শনপ্রার্থী এই মন্ত্রী সেটি অনুমান করতে পারেন না।

মন্ত্রী নমস্কার করলে রাজমাতা তাঁকে উপবেশনের অনুমতি দেন। গোপাল আসন গ্রহণ করে বলেন—মহারাজ এখনো অপুত্রক বলে আপনার উদ্বেগের কথা শুনেছি।

—হ্যাঁ, আমি চিন্তিত।

—একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। এই প্রস্তাবকে স্পর্ধা বলে ভাববেন না অনুগ্রহ করে।

—বলুন।

—মহারাজাকে আবার বিবাহ দেওয়া যেতে পারে।

—অবশ্যই। এতে স্পর্ধার কিছু নেই। আপনি অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন।

—সেকথা নয়। আপনি হয়ত কোন রাজকুমারীকে রাজবধূ করে আনার কথা ভাবছেন। কিন্তু আমার প্রস্তাব হচ্ছে রাজার কন্যা নয়, অথচ অত্যন্ত উচ্চবংশীয়া এবং পরমাসুন্দরী কোন কন্যার সন্ধান যদি দিই আপনি কি সম্মত হবেন ?

একটু ভেবে রাজমাতা বলেন—হব। সব সময় যোগ্য রাজকন্যাও পাওয়া যায় না।

—রাণীমা, আমরা উচ্চবংশীয়। আপনি জানেন হয়ত বিদেহ রাজবংশের সঙ্গে আমাদের বহুদিনের সম্পর্ক। তারপরে বৈশালীতেও আমরা ছিলাম সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার এবং আমার ভ্রাতার স্ত্রীদের বৈশালীর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। আমার ভ্রাতা এখন বৈশালীতে জনপ্রিয় এবং উচ্চপদে আসীন। তার দুই কন্যা রয়েছে। দুজনারই রূপ দেবকন্যার মত। আপনি সম্মত হলে আমি এবং আমার ভ্রাতা কৃতার্থ হব।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করেন বিম্বি। তারপর বলেন—আমি রাজী। কিন্তু কন্যাকে হতে হবে অসাধারণ সুন্দরী।

—তারা অসাধারণ।

এরপরে রাণীমা মহারাজকে সম্মত করালেন। মহারাজ একদিন গোপালকে শুধু একটি প্রশ্নই করেছিলেন—আপনার উদ্দেশ্য কি ?

—আমার একটিই উদ্দেশ্য। আপনার বংশরক্ষা যাতে হয় সেটি দেখা। বাসবী দ্বারা সম্ভব না হলে উপবাসীর সঙ্গে বিবাহ দেব। নইলে আমি আরও দেখব।

বিম্বিসার মৃদু হাসেন। কিন্তু এই হাসি বিস্ময়বিমুগ্ধতায় পরিণত হয়, যখন তিনি বাসবীকে দেখলেন। এত রূপ ! রূপ কোশলদেবীরও কম নয়। কিন্তু এমন দুর্নিবার আকর্ষণক্ষমতা কোন নারীর যে থাকতে পারে এতদিন সেই ধারণা বিম্বিসারের ছিল না। এর ভ্রূভঙ্গ শোণিতে দোলা লাগায়। এর চলন উন্মাদ করে তোলে। নারীকে যেন নতুন করে চিনতে পারলেন মহারাজ এবং দীর্ঘদিনের জন্য কোশলদেবী সহ অন্যান্য সমস্ত রাণীকে একেবারে বিস্মৃত হলেন। এমন কি যা কথনো ঘটেনি, রাজসভাতে আসতেও মাঝে মাঝে বিলম্ব ঘটে যায়। কোশলদেবী এতদিন পরে প্রথম উপলব্ধি করলেন উপেক্ষার কী নিদারুণ জ্বালা। তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করে চলেন। কিন্তু বৃথাই।

অথচ অন্যান্য রাণীকে সঙ্গ দেবার জন্য এককালে তিনি মহারাজকে কত অনুরোধ করেছেন। আজ অন্তর থেকে কে যেন বারবার বলছে মহারাজ তাঁর যোগ্য নারী এত দিনে খুঁজে পেয়েছেন।

কয়েক মাস অতিবাহিত হলে, প্রথমে প্রাসাদে, তারপরে রাজগৃহে এবং সর্বশেষে সমগ্র মগধরাজ্যে সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, রাজমহিষী বাসবী গর্ভবতী। মন্ত্রী গোপালের সম্মান শতগুণ বৃদ্ধি পেল। রাণীমা তাঁকে ডেকে সহাস্যে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন।

নিশীথ রাতে মহারাজ বিম্বিসার বাসবীর কক্ষে এসে বলেন—তুমি আমার হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থলে প্রতিষ্ঠিত।

বাসবী কৌতুক করে বলেন—সত্যি তো?

—বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখাতে পারি।

—প্রয়োজন নেই। সারা জীবন পায়ে স্থান দিও, তাহলেই হবে।

মহারাজ রাণীকে বক্ষে নিয়ে বলেন—পায়ে নয়, এইখানে।

বাসবীর মনে হল পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে সৌভাগ্যবতী কেউ নেই।

মহারাজা বলেন—প্রকৃতপক্ষে তুমি বিদেহের কন্যা। তোমার নাম আমি দিলাম বৈদেহী।

—প্রথম বৈদেহী, সারা জীবন বড় কষ্ট করেছিলেন মহারাজ।

—তুমি সারাজীবন আনন্দ করবে। তোমাকে তো বনবাসে যেতে হচ্ছে না।

বৈদেহীর কক্ষে যখন আলো আর আনন্দ .অন্যান্য রাণীদের কক্ষ তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলোকবর্তিকা ঠিক সময়েই জ্বলেছিল, কিন্তু নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী হবে আলোকিত কক্ষ? মহারাজা এসব কক্ষে আসতে ভুলে গিয়েছেন।

রাজগৃহে দিন অতিবাহিত হচ্ছে। ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে। বৃক্ষে বৃক্ষে পত্রে পুষ্পে ফলে তার প্রতিফলন। অনেক বৃক্ষ ফলভারাবনত। বাসবীর পুত্রও একদিন ভূমিষ্ঠ হল। জ্যোতিষী নবজাতকের জন্মক্ষণ দেখে একটু গম্ভীর হন। মুখে কিছু না বলে নাম নির্বাচন করেন অজাতশত্রু।

সুন্দর নামকরণ করেছেন জ্যোতিষী। সবাই আলোচনা করে সেকথা। রাজমাতা কিন্তু জ্যোতিষীর মুখের ভাব লক্ষ্য করেন। তিনি একান্তে তাঁকে ডেকে প্রশ্ন করেন—আপনি ভাগ্য গণনা করে কি পেলেন। আপনাকে গম্ভীর দেখাল।

জ্যোতিষী বলেন—নবজাতক অত্যন্ত পরাক্রান্ত নৃপতি হবেন সন্দেহ নেই। মগধের সুখ্যাতি তাঁর সময়ে অটুট থাকবে। তবে একটা খারাপ দিক রয়েছে।

—সেটা কি?

—তাঁর পিতা বৃদ্ধ হলে অন্যের প্ররোচনায় তাঁর ক্ষতিসাধন করে ফেলতে পারেন।

—কি রকম ক্ষতি?

জ্যোতিষী কোনরকমে নিস্তার পেতে বলেন—এই মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা ঠিক হবে কিনা জানি না। তবে এটা ঠিক, নবজাতকের পিতা সুদীর্ঘকাল মগধের অধীশ্বর থাকবেন। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।

রাজমাতা শান্ত হন।

রাণী বৈদেহী পুত্র নিয়ে অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকায় মহারাজা তাঁকে বিরক্ত করা থেকে নিবৃত্ত হলেন কিছুদিনের জন্য। কিরকম যেন শূন্য হয়ে গেল সব। তখন তাঁর মনে পড়ল অন্যান্য মহিষীদের কথা। তাঁদের কক্ষে যেতে লাগলেন। অন্য সব রাণীদের কথা ভিন্ন। উপেক্ষা সহ্য করতে তাঁরা অভ্যস্ত। কিন্তু কোশলদেবীর প্রকোষ্ঠে রাজা যখন প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অভিমান চাপা থাকল না। সেই অভিমান ভাঙাতে মহারাজের দীর্ঘ সময় কেটে গেল। তিনি এবিষয়ে সচেতন যে একমাত্র কোশলদেবী তাঁকে যথার্থ ভালবাসেন। তাঁর জন্য হেলায় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন। তাই কোশলদেবীর অভিমান ভাঙাতে তিনি সত্যই পুরুষের যাবতীয় কলাকৌশল সব প্রয়োগ করলেন এবং অবশেষে সফল হলেন।

আবার পূর্বের মত মহারাজা এক এক রাণীর কক্ষে যেতে শুরু করলেন। শুধু মাঝে মাঝে পুত্র অজাতশত্রুর কথা মনে পড়লে ছুটে গিয়ে দেখে আসেন তাকে।

বৈদেহী বলেন—এখন আর আমাকে প্রয়োজন নেই। এখন পুত্র হয়েছে। আমার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

মহারাজা বলেন—বৈদেহী তুমি জান না, আমাকে তুমি কি দিয়েছ। তোমার তুলনা নেই। পৃথিবীকে তুমি নতুন করে চিনতে শিখিয়েছ আমাকে।

দুটি বৎসর অতিবাহিত হতে না হতেই সবাই বিস্মিত হয়ে শুনল, কোশল-দেবী এবং খেমা গর্ভবতী। তার আরও কয়েক বছর পরে জানা গেল অন্যান্য

রাণীদেরও দু-একজন সন্তানসম্ভবা।

রাজমাতার আনন্দের সীমা নেই। তিনি নাগদেব ও যক্ষের মন্দিরে পূজা প্রেরণ করলেন। রাজগৃহের সমস্ত ব্রাহ্মণই ভরদ্বাজ গোত্রীয়। তাঁদের একদিন সেবার আয়োজন করলেন। মনে মনে তিনি মন্ত্রী গোপালকে আশীর্বাদ করেন। এই গোপাল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এনে দেবার জন্য এত কিছু সম্ভব হল। রুদ্ধ নদীর উৎসমুখের প্রস্তরখণ্ড স্খলিত করে তাতে গতির সঞ্চার করে দিয়েছেন বিদেহকন্যা। নইলে এতদিন রাজপ্রাসাদ ছিল শুষ্ক, নিষ্ফলা। বৈদেহী প্রথম ফলবতী বৃক্ষ যাঁর সংস্পর্শে এসে সবাই ফলবতী হয়ে উঠল। রাণীমা কল্পনা করেন, আর কিছুদিনের মধ্যে এই প্রাসাদ শিশুদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠবে। তখন তিনি মাঝে মাঝে প্রাসাদে গিয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্যের নয়ন-লোভা রূপ দেখে আসবেন। তাদের মধ্যে বসে স্বর্গীয় রস আস্বাদন করে আসবেন। কী সুন্দর সব নামকরণ করা হয়েছে ওদের—অজাতশত্রু ও অভয়, বিমল ও বেহল্ল, শিলাবৎ ও মেঘ, হল্ল ও নন্দীসেন।

যৌবন কখনো চিরস্থায়ী হয় না। রাজা মহারাজারাও তার ব্যতিক্রম নন। বিম্বিসারের বয়স বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর রূপে একদিন তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন, তারপর পঞ্চত্রিংশতি বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলল। যৌবন আর কদিন? সেই উন্মাদনাও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এখন রাণীরাও অনেক ধীর। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় সাধারণভাবে। বৈদেহীর আকর্ষণ যদিও অটুট তবু কোশলদেবীর পরামর্শের গুরুত্ব অনেক বেশী। অজাতশত্রু সম্বন্ধে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার আগে একদিন তাই কোশলদেবীর কক্ষে প্রবেশ করেন বিম্বিসার।

—আসুন মহারাজ।

—মনে হচ্ছে, আমার আগমনে তুমি বিস্মিত হয়েছ।

—না, বহুদিন পরে কিনা। জানি, আমার আকর্ষণে আপনি আজ আসেন-নি। আমার যৌবন গত, রূপও কি আছে আগের মত?

—এসব কথা কি তোমার মত বিদুষী নারীর মুখে শোভা পায় রাণী। তুমি আমার প্রধানা মহিষী।

—জানি। তবু ঈশ্বর আমাকে রক্ত মাংস দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। তোমার রাজ্য

আছে, রাজকার্য আছে, অন্যান্য রাণীরা আছে। অবাধ স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছামত সবকিছু করতে পার। আমি যে তুমি ছাড়া কাউকে জানি না, জানতে চাইনি কখনো।

বিম্বিসার নীরব থাকেন। যেজন্য এসেছিলেন, সেকথা আর বলতে পারেন না।

কোশলদেবী একটু হেসে বলেন—তোমাকে আমি দোষারোপ করছি না মহারাজ। ভুল বুঝো না। আমার এই আক্ষেপ আর বেশীদিন থাকবে না। একজন বর্ষীয়সী রমণী বলেছে, যৌবন চলে যাবার আগে নারীদের এমন একটা ভাব হয়। চলে গেলে নিশ্চিন্ত। তেমন দিন আসতে আমার বিশেষ দেরি নেই।

—এসব কি বলছ রাণী। তোমাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। আমি কিছুদিন তোমার কাছে শুধু আসব।

—সত্যি!

—হ্যাঁ। আমি জানি যে যা-ই দিক তুমি তোমার মনের সবটুকু আমাকে দিয়েছ। তোমাকে বিষণ্ণ দেখলে আমি বিচলিত বোধ করি।

মহারাজের কথায় কোশলদেবী মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠেন। বলেন—বল কি বলতে চাও। জানি, কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য এসেছ। নইলে এভাবে আসতে না। আমার ওপর তোমার এই নির্ভরতা আমাকে আনন্দ দেয়।

—রাণী, আমি যখন অঙ্গদেশ অধিকার করি, তখন আমি সবে যৌবনে পদার্পণ করেছিলাম। তোমাদের কারও এই প্রাসাদে তখন আগমন ঘটেনি। হ্যাঁ, একজন ছিল বটে। উদাম্বরীকা দেবী। অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পাতে বসে সেদিন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার যখন পুত্রসন্তান হবে তখন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ওখানকার উপ-অধিপতি করব। যুবরাজ ওখানে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালিত করে ভবিষ্যৎ মগধের রাজা রূপে দক্ষ হয়ে উঠবে। তাছাড়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটা স্বতন্ত্র সম্মান থাকা উচিত। কি বল?

কোশলদেবীর হৃদয়ের নিভৃতে কোন এক সূক্ষ্মতন্ত্রীতে আঘাত লাগল। তাঁর নিজের সন্তান জ্যেষ্ঠ নয়, যদিও তিনি প্রধানা মহিষী। কিন্তু তিনি মহারাজার মঙ্গলাকাঙ্খিণী—মনেপ্রাণে তাঁর শুভ চান। তাঁর হর্ষে কোশলদেবীর আনন্দ তাঁর বিষাদে, দুঃখ। তাই মহারাজের এই চিন্তাকে তিনি সমর্থন করলেন। তাঁকে তিনি উৎসাহিত করলেন।

বিম্বিসার এই রকমই অনুমান করেছিলেন। কোশলদেবীর অন্তর যে কত বড় একথা কেউ না জানুক তিনি জানেন। তাই তাঁর সমর্থন পেয়ে আনন্দে

তাঁকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে কোশলদেবীর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিম্বিসার একটু অপেক্ষা করেন। ভাবেন, বৈদেহীর কক্ষে কখন যাওয়া যায়। না, আজ নয়। আগামীকাল। অজাতশত্রুকে চম্পা নগরীতে প্রেরণের পূর্বে বৈদেহীর সমর্থনের প্রয়োজন। কারণ সে বৈদেহীর গর্ভজাত সন্তান।

পরদিন রাত্রে বৈদেহীর কক্ষে প্রবেশ করে তিনি দেখেন রাণী পত্র লিখতে ব্যস্ত। তাঁকে দেখতে পাননি। তিনি বলে আসেননি। বিম্বিসার রাণীর অলক্ষ্যে তাঁকে দেখতে থাকেন। ভাবেন, তিনি ছাড়াও রাণীর একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সেখানে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে একটি আসনে উপবেশন করেন তিনি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকেন। দেখতে থাকেন, রাণীর পত্র লেখা একসময় শেষ হল। সেই পত্র তিনি সযত্নে একটি পেটিকার মধ্যে রেখে সেটি বন্ধ করেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চমকে ওঠেন। মহারাজা!

কি করবেন ভেবে পান না রাণী। সেই আগের মত ছুটে গিয়ে কণ্ঠলগ্না হবেন? কিন্তু মহারাজ কি পছন্দ করবেন? থাক, প্রয়োজন নেই।

মহারাজার মুখে হাসি। রাণী ধীর পায়ে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান।

—এভাবে তোমার আগমন আমাকে বিস্মিত করেছে রাজা।

—আনন্দিত করেনি তাহলে?

—তোমার উপস্থিতি সব সময়ই আনন্দের। কতটা আনন্দের সে কথা বুঝতে হলে তোমাকে নারী হতে হবে। সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণত তুমি সংবাদ প্রেরণ করে এসে থাক।

—আজ সেভাবে আসতে চাইনি, তোমাকে অবাক করে দেব বলে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি একটি বিষয়ে।

বাসবী বিস্মিত হলেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চান না। মহারাজ চিরকাল তাঁকে সোহাগ করে এসেছেন, তাঁর পরামর্শ নেননি কোন গুরুতর বিষয়ে। সবাই জানে তাঁর যত কিছু পরামর্শ শুধু কোশলদেবীর সঙ্গে। এ জন্যে মনে মনে তাঁর চিরকালের অভিমান। তবু মনে কিছু করেননি। কারণ শুধু ওইটুকু ছাড়া তিনি মহারাজের হৃদয় জুড়ে রয়েছেন। তিনি অনুভব করেন, এখনো মহারাজ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন, চঞ্চল হন।

তাই বাসবী বলেন—বল মহারাজ। আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছ শুনে কি যে আনন্দ হচ্ছে।

—তোমার পুত্রের বিষয়ে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা অবশ্যকর্তব্য আমার।

—সে তোমারও পুত্র। তার শুভ অশুভ তোমার চেয়ে ভাল কে বুঝবে?

—তুমি যথার্থ বলেছ। ওকে দেখে গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে। কী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। কী সুন্দর দেহের গঠন। তোমার জন্যে এটা সম্ভব হয়েছে।

—আর তুমি? নিজেকে কি দর্পণে দেখনি কখনো? ওই কন্দর্পের মত রূপ প্রাসাদের রমণীকুল ছাড়াও আরও কত নারীকে বিমুগ্ধ করেছে তা কি জান?

বিম্বিসার হাসেন। বলেন—বেশ, আমরা দুজনেই অজাতশত্রুকে কিছু কিছু দিয়েছি। সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। যুবরাজ সে। তাকে রাজকার্য পরিচালনার শিক্ষা নিতে হবে। ভাবছি তাকে চম্পা নগরীতে পাঠাব। সেখানে সে দক্ষ হয়ে উঠবে। ফলে, আমি রাজকার্য পরিত্যাগ করলে কিংবা আমার মৃত্যু হলে মগধের সিংহাসনে বসে শাসনকার্য চালাতে তার কোন অসুবিধা হবে না।

বৈদেহী মহারাজের এই অভিপ্রায়ের কথা জ্ঞাত হয়ে মনে মনে তাঁর প্রশংসা না করে পারেন না। মুখে বলেন—তোমার ইচ্ছাই তোমার আদেশ। অজাতশত্রু চম্পা নগরীতে গিয়ে বসবাস করলে আমার কষ্ট হবে ঠিক, তবে তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেটুকু কষ্ট আমি সহ্য করব।

উৎসাহিত মহারাজা বলে ওঠেন—তোমার তাহলে অমত নেই।

—না মহারাজ।

মহারাজের এই অভিপ্রায়ের কথা সকলে শুনল। প্রশংসা করল তারা। যুবরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে চম্পা নগরীতে গিয়ে বসবাস করার জন্য অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করল। কেউ কেউ প্রাসাদের কর্মীদের মাধ্যমে রাণীদের ধরল। কেউ ধরল মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের। এমন ব্যক্তি বহু আছে যারা দীর্ঘদিন রাজার অধীনে কাজ করেও কোন গুরুত্ব পায় না। তাদের আশা চম্পাতে গিয়ে অজাতশত্রুর সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে তুষ্ট করতে পারবে। তাহলে তাঁর রাজত্বকালে উচ্চপদ পেতে সুবিধা হবে।

অজাতশত্রু প্রথমে সংবাদটি শুনে খুবই প্রীত হলেন। স্বাধীনভাবে একটি রাজ্য শাসন করা কম কথা নয়। সেখানে তাঁকে কোন বিষয়ে পদে পদে বাধা দেবার কেউ থাকবে না। তিনিই হবেন সেখানকার উচ্চতম ব্যক্তি। তাঁর কথা

সবাইকে মানতে হবে।

পরক্ষণে তাঁর মনে পড়ে গেল ভ্রাতা অভয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহের উদ্রেক হল মনে। অভয় এই রাজগৃহে থাকবে পিতার সঙ্গে। সেটা ঠিক হবে না।

অভয়কে অজাতশত্রু কোনদিন পছন্দ করেন না। এর একমাত্র কারণ অভয় লিচ্ছবিবংশীয় রাজকন্যার পুত্র। তার ধমনীতে লিচ্ছবির রক্ত রয়েছে কিছুটা। অথচ অজাতশত্রুর নিজের রক্তেও লিচ্ছবির মিশ্রণ যে আদৌও নেই, একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ তার প্রমাতামহ বিদেহ রাজ্য থেকে এসে বৈশালীতে আশ্রয় নেন এবং মাতামহের বিবাহ হয় লিচ্ছবি কন্যার সঙ্গে। তবু তিনি নিজেকে বৈশালী নয় বিদেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ভাবেন। তাছাড়া তিনি জানেন অভয়ের লিচ্ছবিদের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে। তাঁর ধারণা হল, তাঁর অনুপস্থিতিতে অভয় পিতাকে তুষ্ট করে সুযোগমত মগধের সিংহাসনে আরোহন করবে। লিচ্ছবিরা তার সাহায্যের জন্য তখন এগিয়ে আসবে।

কথাটা মনে হতে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। উত্তেজিত অবস্থায় ছুটে বৈদেহীর কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করেন।

—কি হল ? এভাবে হঠাৎ—

—আমি চম্পা নগরীতে যাব না।

—কেন ? কি হয়েছে ? তোমার মঙ্গলের জন্য—

—আমার মঙ্গলের জন্য ? এতে কত বড় বিপদ লুকিয়ে রয়েছে তুমি ভেবে দেখনি।

এরপর অজাতশত্রু মাতা বৈদেহীকে অঙ্গের রাজধানীতে গিয়ে বসবাসের অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বলেন। বৈদেহী পুত্রের নিকট সব শুনে বিশ্বাস করে বসলেন। পুত্র যা বলছে তেমন দিন আসতে পারে বৈকি। এলে অত দূর থেকে পুত্র কিছু করতে পারবে না। মগধের সিংহাসন তার কাছে স্বপ্নই থেকে যাবে।

ঘটনাটা কতদূর গড়াত বলা যায় না। একদিকে স্বামীর সম্মান, অন্যদিকে পুত্রের কল্যাণ—এই উভয় সঙ্কটে পড়ে বৈদেহীর চিত্ত ক্ষতবিক্ষত। শেষ পর্যন্ত প্রায় স্থির করে ফেলেছিলেন যে পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করবেন এবং জ্যেষ্ঠতাত মন্ত্রী গোপালকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। ভাবতে ভাবতে আহারে রুচি চলে গেল, রাতের নিদ্রা বিদায় নিল বাসবীর।

এমনি সময়ে এক ঘটনা ঘটল।

একদিন মহারাজা নগরী পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। নগরীর প্রান্তদেশে

এসে তিনি রত্নকূট পর্বতের দিকে চেয়ে ছিলেন। গিরিব্রজ নগরীর নাম এখন যেমন রূপান্তরিত হয়েছে রাজগৃহে তেমনি পঞ্চপর্বতের পুরাতন নাম বৈভব ও বরাহ, বৃষভ ও ঋষিগিরি এবং চৈত্যক এখনকার অধিবাসীদের মুখে মুখে নতুন নামে ভূষিত হয়ে উঠছে। অনেকে এখন তাদের বলে বৈভার ও বিপুল, রত্নকূট ও রত্নাচল এবং চৈত্যক।

মহারাজা বিম্বিসারের বাসনা প্রাকারবেষ্টিত রাজধানী রাজগৃহকে প্রাকারের বহির্দেশে আরও বিস্তৃত করবেন। রথারূঢ় অবস্থায় তিনি নগরীর বহির্দেশে চলে এলেন। সেখানে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এক অতীব জ্যোতির্ময় পুরুষের প্রতি, যাঁকে ঘিরে রয়েছে একদল শ্রদ্ধাবনত মানুষ। বিম্বিসার বিস্ময়াবিষ্ট হন। কে ইনি? ঠিক যেন মূর্তিমান কোন দেবতা। তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডলে অস্পষ্ট হাসির ছোঁয়া। পরিধানে বস্ত্র খুবই সামান্য। যেটুকু রয়েছে তাও বুঝি স্খলিত হয়ে পড়বে এমনই বাহ্যজ্ঞানরহিত ভাবাবেশ। পৃথিবীর মানুষের তাঁকে কিছুই দেবার নেই। অথচ বোঝা যায়, পৃথিবীর মানুষকে তিনি অনেক কিছু দিতে পারেন। তাঁর চিত্ত ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কে এই পুরুষ, যিনি তাঁরই রাজধানীর দ্বারদেশে অপেক্ষারত?

সারথীকে মহারাজ রথ থামাতে বললেন। তারপর পদব্রজে দ্রুত তিনি সেইদিকে এগিয়ে যান। মহারাজের রথ দেখে সকলে সচকিত হয়ে উঠেছিল। এবারে তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা সসম্মানে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে মহারাজকে নিরীক্ষণ করেন। তাঁর স্মিত হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

মহারাজা তাঁর সম্মুখে পথের ওপর বসে তাঁর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করে বিনয়ের সঙ্গে বলেন—আমি মগধের রাজা। আপনি আমার প্রাসাদে চলুন।

—আমি মহারাজের অপেক্ষায় ছিলাম।

বিস্মিত বিম্বিসার বলেন—আপনি অন্তর্যামী। নইলে আজ এতদিন পরে কেনই বা নগর পরিভ্রমণে বের হব? আসুন প্রভু আমার রথে।

—আপনি রথে যান। আমি পদব্রজে যাচ্ছি।

মহারাজ বিম্বিসার সঙ্গে সঙ্গে সারথিকে নির্দেশ দেন শূন্য রথ নিয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করতে। সারথি জীবনে এমন নির্দেশ কখনো পায়নি। তবু মহারাজের আদেশ অবশ্য পালনীয়।

বিম্বিসার সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলেন। অনেক নাগরিক তাঁদের সঙ্গ

নেয়। তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহারাজকে কেউ এভাবে নগরীর রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখেনি। সঙ্গে দেহরক্ষী নেই, সৈন্য নেই। রয়েছেন শুধু দেবতুল্য জ্যোতিষ্মান পুরুষটি। কত বয়স? অনুমান করা কঠিন। মহারাজের সমবয়সীও হতে পারেন আবার বেশীও হতে পারেন। কিন্তু কী রূপ! এই রূপ ধরাতলের রূপ নয়। সুদূর আকাশের সুষমা দিয়ে তৈরী এই রূপ।

মহারাজা অত্যন্ত দ্বিধাভরে প্রশ্ন করেন—প্রভু আপনার আগমন কোন্ দেশ থেকে?

—একসময় আমার জন্ম হয়েছিল বৈশালীতে। আপনার দুই রাণী আমাকে চিনবেন, মনে থাকলে।

—আমার রাণীরা?

—হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আমার গার্হ্যস্থ জীবনের আত্মীয়তা ছিল। তাদের কেউ কি আমার কথা আপনাকে বলেনি? বলেছে, আপনি বিস্মৃত হয়েছেন।

বিম্বিসার বিস্মিত হন। কখনো কোন মহাপুরুষের কথা কেউ কি বলেছে? মনে তো পড়েনা তাঁর। লিচ্ছবি-কন্যা তাঁকে তো কিছু বলেনি। বিবাহের পর সে একটি কথাই বলতে চাইত। সেটি হল, বৈশালী নগরী রাজগৃহের চেয়ে অনেক বেশী মনোরম। তারপর পুত্রের মাতা হয়ে তার শুধু একই কথা, অভয়ের ভবিষ্যৎ যেন সম্মানের হয়। তার বড় দুঃখ অভয় জ্যেষ্ঠ রাজকুমার হয়ে জন্মায় নি। এমন রাণীর এ হেন ঋষি-কল্প আত্মীয়? কিন্তু অস্বীকার তো করা যায় না। ইনি নিজে বলেছেন।

জ্যোতির্ময় পুরুষ বলেন—আপনি অহেতুক চিন্তা করছেন। আমি বিশেষ করে বাসবীর কথা বলছি। বাসবীর মা এবং আমি দুজনাই একইভাবে রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত।

এতক্ষণে মনে পড়ে বিম্বিসারের বৈদেহী কয়েকবার বলেছিল বটে একজনকে দর্শনের জন্য মাঝে মাঝে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি কথা দিয়েছিলেন রাজগৃহে তাঁর পরিক্রমার সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এখনো এলেন না। আর কি আসবেন?

একবার ঈর্ষাপরবশ হয়ে বিম্বিসার প্রশ্ন করছিলেন—কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ?

বৈদেহী সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের মুখ চেপে ধরেছিলেন দুহাত দিয়ে। বলে উঠেছিলেন—উনি ইহজগতে থেকেও এ জগতের নন। ওঁর সঙ্গে যে আমাদের আত্মীয়তা রয়েছে এতে আমাদের সবার গর্ব। তবু কারও আপনার জন নন তিনি। আবার সবার আপনজন। ওঁকে না দেখলে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

ঠিক আসবেন। দেখে নিও। ওঁর মুখ নিঃসৃত বাক্য কখনো নিষ্ফল হয়না।

বিম্বিসার সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি ফেলতে তিনি বলেন—এবারে মনে পড়েছে। ভাই না!

—হ্যাঁ প্রভু। আমি ভাগ্যবান।

প্রাসাদে যখন পৌছলেন মহারাজ নতুন অতিথিকে নিয়ে তখন দেখলেন নগরীর প্রায় এক চতুর্থাংশ অধিবাসী পেছনে পেছনে এসেছেন।

মহারাজ তাদের ডেকে উচ্চকণ্ঠে বলেন—আমাদের পরম সৌভাগ্য উনি এখন রাজগৃহে অবস্থান করবেন। আপনারাও ওঁকে দেখতে পাবেন নয়নভরে। ওঁর উপদেশামৃত শুনতে পাবেন। দীক্ষিত হতে পারবেন।

সকলে দূর থেকে ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করে, হৃষ্টচিত্তে বিদায় নেয়।

ইনি হলেন মহাবীর। শ্রেষ্ঠ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর।

বৈদেহীর মহা আনন্দ। এতদিন পরে উনি এসেছেন। তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। লিচ্ছবি কন্যাও হাসি মুখে এসে প্রণাম করলেন। তাঁরও আত্মীয় ইনি। তিনিও কম গর্বিত নন।

বৈদেহী বলেন—এত দেরি করলেন?

—দেরি কোথায়? ঠিক সময়ে এসেছি।

—আপনার সঙ্গে অনেকে থাকেন। তাঁদের কোথায় রেখে এলেন?

—আসবে তারা। এখন রাজগৃহের প্রান্তে আমি থাকব। তারা এখনো নালন্দাতে আছে। ওটি ছিল আমার তপশ্চারণের স্থান।

সেদিন প্রাসাদে রাজমাতা, রাণীরা, পরিচারিকাবৃন্দ, এমনকি উদাম্বরীকাও মহাপুরুষ মহাবীরের উপদেশাবলী শুনে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। যে কোন কারণে হোক, রাণী খেমার মধ্যে কিছুদিন ধরে একটা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল। সবাই স্যেটা লক্ষ্য করে তাঁকে সমীহ করে চলছিল। মহাবীরের বাণী শুনে তিনি অতিমাত্রায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপর একসময় কান্নায় ভেঙে পড়ে ছুটে নিজ কক্ষে চলে গেলেন। ভগবান মহাবীর তাঁকে দেখলেন এবং একটু হাসলেন।

বৈদেহী প্রশ্ন করেন—উনি আপনার কাছে শান্তি চান কি?

—ওঁর ভূমি দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে। শান্তি উনি অবশ্য পাবেন। একটু বিলম্ব আছে।

রাজকুমারগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মহাবীরের শান্ত সমাহিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন। মনুষ্যরূপী এমন কাউকে তাঁরা কখনো দেখেনি। রাজকুমার নন্দীসেন সহসা সামনে এসে মহাবীরের পদদ্বয়ের মধ্যে মস্তক স্থাপন করে নিশ্চল হয়ে রইলেন।

মহাবীর রাজকুমারের মস্তক হস্তদ্বারা স্পর্শ করা মাত্র রাজকুমারের সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠল। চক্ষুদ্বয় অবিরল ধারা বর্ষণ শুরু করল।

রাজকুমার বলেন—আমাকে আশ্রয় দিন।

—দেব।

মহারাজ বিম্বিসারের কর্ণগোচর হল এই সংবাদ। তিনি তখন রাজসভায় কার্য পরিচালনা করছিলেন। তিনি বলে পাঠালেন। পুত্র নন্দীসেন যখন এতই একাগ্র তাকে যেন তার ইচ্ছামত চলতে দেওয়া হয়।

রাজগৃহের রাজপ্রাসাদে প্রথম জৈনধর্মে দীক্ষিত হলেন রাজকুমার নন্দীসেন।

এরপর বৈদেহী তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর চম্পা নগরীতে গমনের অনিচ্ছার কথা জানালেন। সব শুনে মহাবীর অজাতশত্রুকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন—চলে যাও চম্পা নগরীতে। কোন ভয় নেই। তোমার আশঙ্কা অমূলক।

অজাতশত্রু অনুভব করলেন, তাঁর ভেতরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দ্বিধা সংশয় মুহূর্তে অন্তহিত হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি যাত্রা করলেন।

এরপরই মহাবীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চলে যান নগরপ্রান্তে। সেখানে থাকলেন তিনি। তাঁর প্রভাবে রাজগৃহ তথা মগধের অধিবাসীদের চিত্তে আধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ হতে শুরু করল। এ এক নতুন অনুভূতি যা জাগ্রত রাখতে পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্যর্থ হচ্ছিল। দেশে নাগ যক্ষ ইত্যাদি বিবিধ পূজার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়েছে মানুষের মন। মহাবীর যেন সবার মনে সাবধান-বাণী প্রেরণ করলেন—একবার চেয়ে দেখ তো, তোমরা কোথায় চলেছ? এই কি পৃথিবীতে শান্তি লাভের পথ? এই কি পরম সত্য লাভের উপায়?

মহারাজ বিম্বিসার থেকে শুরু করে সবার মনে প্রশ্ন জাগে—তাই তো।

মগধের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকে ছুটে এল মহাবীরের নিকট আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। আশ্রয় তাদের মিলল, তৃষিত হৃদয় স্নিগ্ধ হল। গর্ব, অহংকার সব কিছু গলে জল হয়ে গেল।

বিম্বিসার বুঝতে পারেন সত্যই তাঁর বয়স বাড়ছে। সুন্দরী নারীকুলের মধ্যমণি হয়ে থাকার উৎসাহে অনেক আগেই ভাঁটা পড়তে শুরু করেছিল। এখন বৈরাগ্যের স্পর্শ লাগতে আরম্ভ করেছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেকদিন সিংহাসনে বসেছেন। অনেক হয়েছে। অনেক কীর্তি স্থাপন করেছেন। তবু একটা স্থায়ী কীর্তি রাখার বাসনা যা বরাবর ছিল তাঁর মনে, সেটি বাস্তবে পর্যবসিত করার ইচ্ছা হল। নগরীর বহির্দেশে আর একটি নগরী নির্মাণ করতে হবে—সম্প্রসারিত রাজগৃহ।

সময় বড় কম। তাই নতুন নগরী নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল। এমন কি সেখানে নতুন রাজপ্রাসাদও তৈরীতে হাত দেওয়া হল। বনাঞ্চল থেকে বহুমূল্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করে তাই দিয়ে নব নব হর্ম্য নির্মিত হতে থাকল। রাজপথও তৈরী শুরু হল। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হল। কয়েক বছরের মধ্যে স্থানটি এক ক্ষুদ্র নগরীর রূপ নিল। পরম পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হল মহারাজ বিম্বিসারের হৃদয়। অধিবাসীরাও পুলকিত হল।

তারপর এক শুভ লগ্নে নতুন নগরীর উদ্বোধন হল। অধিবাসীরা তাদের নব নব আবাসে বসবাস শুরু করল। বিম্বিসারও চলে এলেন তাঁর নতুন রমণীয় প্রাসাদে। নতুন নগরীতে রাজগৃহের অধিবাসী নন, এমন বহু মানুষ স্থান পেলেন।

কিন্তু অধিকাংশ বাসগৃহ কাষ্ঠনির্মিত বলে মহারাজা ঘোষণা করলেন, যদি কারও অবহেলায় তার নিজের গৃহে কিংবা অন্যত্র কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় তাহলে শাস্তিস্বরূপ তাকে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হবে পর্বতের অপর পার্শ্বে অতি নির্জন ও শীতল অরণ্যের অভ্যন্তরে।

নবনির্মিত প্রাসাদে বসবাস করে সেখানকার নতুন সভাগৃহে সভাকার্য পরিচালনা করে মহারাজ বিম্বিসার এক নতুন ধরনের আত্মসুখ অনুভব করতে লাগলেন। সেই সুখানুভূতির আবেশ কেটে যাবার আগে এক রজনীতে প্রচণ্ড কোলাহলে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি দেখলেন তাঁর কক্ষের দ্বারে করাঘাত করছে কেউ। বাইরে চিৎকার, শিশু ও রমণীর ক্রন্দন। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে দেখেন কোশলদেবী দাঁড়িয়ে। তিনি মহারাজের হাত ধরে বলেন—শীগ্‌গির নীচে চলুন।

—কি হয়েছে?

—প্রাসাদের একাংশ প্রজ্জলিত অগ্নি দ্বারা আক্রান্ত।

ততক্ষণে হুতাশনের তাণ্ডবলীলা দৃষ্টিগোচর হয়েছে মহারাজের। তার লেলিহান শিখা যেন তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় সব কিছুকে গ্রাস করে আকাশ স্পর্শ

করতে উদ্যত।

—অন্য রাণীরা কোথায়? রাজপুত্ররা? পরিচারিকাবৃন্দ? শিশুরা? তাদের রক্ষা করতে হবে। তাদের ফেলে রেখে আমি প্রাসাদ ত্যাগ করব না। সবাই বিপদমুক্ত হলে আমি যাব।

রাণী উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন—তারা সবাই নিরাপদে প্রাসাদ ত্যাগ করেছে। আমিও গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি আপনি নেই। তাই চলে এসেছি। ওরা বুঝতে পারেনি আপনি নিদ্রামগ্ন রয়েছেন এখানে।

ততক্ষণে অগ্নির উত্তাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে তাঁদের কাছে। কোশলদেবীকে ক্লান্ত বলে মনে হল। শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

—কি হল তোমার?

—কিছু না। আপনি চলে যান।

—আর তুমি?

—আমি চলতে পারছি না। বোধহয় চেতনা হারাব।

কথা শেষ হবার পূর্বেই কোশলদেবী অচৈতন্য হন।

মহারাজা রাণীর অচেতন দেহ দু হাতে উত্তোলিত করে স্কন্ধে স্থাপন করে ছুটে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। মুহূর্তকাল পরে নিষ্ক্রমণের পথের ওপর বিরাট একখণ্ড প্রজ্বলিত কাষ্ঠ ভেঙে পড়ে পথ অবরুদ্ধ করে দেয়। প্রাসাদে তখন আর কেউ ছিল না।

সেই রাতে আবার পুরাতন প্রাসাদে ফিরে আসেন রাজপরিবারের সকলে। পরদিন আবার পূর্বেকার সভাগৃহে সভা বসে। মহারাজা বিম্বিসার সিংহাসনে বসে প্রথম ঘোষণা করেন—আমার আদেশ ছিল কারও অবহেলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তাকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে। আমি স্বয়ং সেই দোষে দোষী। আমার প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন—আপনার অবহেলায় নয় মহারাজ, প্রাসাদের দায়িত্ব ছিল প্রাসাদরক্ষীদের দলপতির ওপর। কেউ যদি দোষী হয় তবে সে দোষী।

—না। প্রাসাদের দায়িত্বভার রাজার ওপর যেমন গৃহস্থের বাসগৃহের দায়িত্ব গৃহস্বামীর ওপর। নিজের প্রাসাদরক্ষার ক্ষমতা যার নেই, সে রাজ্য রক্ষা করবে কি করে? আমি নির্বাসন জীবন যাপন করব। রত্নকূট পর্বতের পশ্চাতের অরণ্যে আমি বনবাস করব।

সব অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করে মহারাজ একদিন চলে গেলেন অরণ্যে।

কোশলদেবী কিছুতে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। বাধ্য হয়ে মহারাজা তাঁকে তাঁর সঙ্গিনী করে নিলেন।

সংবাদটি শুধু মগধরাজ্য নয়। পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্যে কয়েকদিনের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেল। অঙ্গদেশ থেকে অজাতশত্রু শুনলেন, তবে কোন মন্তব্য করলেন না। বিম্বিসার বিদায় নেবার সময় বলে গিয়েছেন অজাতশত্রুর রাজ্যাভিষেকের একটা শুভদিন দেখে রাখতে।

এদিকে বৈশালীতে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। তারা শক্তিশালী। তারা জানে বিম্বিসার যখন স্বেচ্ছায় নির্বাসনদণ্ড ভোগ করছেন তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু কিছুদিনের মধ্যে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করবেন। লিচ্ছবিদের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষের কথা কারও অজানা নয়। বৈশালীর রাজার আশঙ্কা হল, তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, মগধ শক্তিশালী বটে, কিন্তু ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক এখন অরণ্যবাসী। অজাতশত্রু কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেও, বিম্বিসারের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। সুযোগের অপচয় করতে চাইলেন না বৈশালী রাজ। কালবিলম্ব না করে রাজগৃহ অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করলেন।

বিম্বিসারের নির্দেশে মগধের গুপ্তচরেরা রাজ্যের ভেতরে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। তারা সর্বদা সক্রিয় ও সদা সতর্ক। তারা ত্বরিতে মগধে এসে মন্ত্রীবরকে অভিযানের সংবাদ জ্ঞাপন করল। ঠিক হল নৃপতি বিম্বিসারের কাছে কালবিলম্ব না করে সেইদিনই দুঃসংবাদটি প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। একজন অশ্বারোহী মন্ত্রীর পত্র নিয়ে ধাবিত হল পর্বতাভিমুখে।

পত্র পাঠ করে বিম্বিসারের ভ্রূকুঞ্চিত হল। কারণ মন্ত্রী পত্র শেষ করেছেন এই কথা লিখে: অগ্নিকাণ্ডের দায়িত্ব যদি আপনাতে বর্তায়, এই আক্রমণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার। আপনি রাজধানীতে অবস্থান করলে শক্তিশালী হয়েও লিচ্ছবিরা কখনো মগধদেশ আক্রমণে সাহসী হত না। মগধের যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তার দায়ভার একমাত্র আপনাকেই বহন করতে হবে বলে সভাসদ-গণের দৃঢ় অভিমত।

পত্রবাহকের হস্তে লিখিতভাবে মহারাজ আদেশ দিলেন, তাঁর ও রাণীর জন্য অবিলম্বে শকট প্রেরণ করতে। সেনাপতিকে আদেশ দিলেন দ্রুত সৈন্য সংগ্রহ করতে। আর গুপ্তচরবাহিনী যেন লিচ্ছবি সীমান্তে প্রচার করে দেয় তিনি রাজধানীতে ফিরে এসেছেন এবং সৈন্যদল প্রস্তুত করছেন।

লিচ্ছবিরাজ বিম্বিসারের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়া মাত্র সৈন্যদের গতিরুদ্ধ করে তাদের আবার বৈশালীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। বিম্বিসারের সম্মুখীন হবার সাধ্য তাঁর নেই।

প্রাসাদে এই সমাচার পৌছলে রাজপুত্র অভয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাঁর মাতাও স্বস্তি পেলেন। লিচ্ছবিদের সঙ্গে মগধের সংঘর্ষ কেউই চান না।

নতুন নগরীর প্রাসাদ সংস্কার করা হয়। বিম্বিসার ভাবেন পুরাতন নগরীর নাম পুনরায় গিরিব্রজ রাখলে কেমন হয়? নতুন নগরীর নাম হোক রাজগৃহ। আবার ভাবেন, পুরাতনের নাম যদি রাজগৃহ থাকে, তাহলে নতুনটির নাম রাখা হোক সেই কুশাগ্রপুর? কিন্তু রাজার ইচ্ছার চেয়েও সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অনেক বেশী বলবতী। তারা যাতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে সেটাই প্রচলিত হয়। সুতরাং দুই নগরীর নাম একই রইল। রাজগৃহ। নতুন নগরীর বৃক্ষরাজি বৃদ্ধি পেয়ে পুরাতন নগরীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেল।

মহারাজ বুঝতে পারেন আর বেশীদিন সিংহাসন আঁকড়ে রাখা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। সব রাজপুত্রই যৌবনে পদার্পণ করেছে। অজাতশত্রুর এই তো সময় রাজা হবার। রাজ্যাভিষেকের প্রসঙ্গ রাণীদের কাছে তুললে তাঁরাও আপত্তি করেন না।

রাণীদের মধ্যে মদ্রদেশীয় খেমা বহুদিন থেকে নিজের মত থাকেন। মহারাজের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহও এখন আর তেমন নেই। সব সময় অন্যমনস্ক। মহারাজা তাঁর কক্ষে যদি কখনো যান, তাঁর অবস্থা দেখে বিস্মিত নয়নে চেয়ে থাকেন। খেমাকে দেখে মনে হয় প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের প্রভাব তাঁর দেহমনে বিরাজ করছে। চোখের দৃষ্টি ইহলোকের সীমা অতিক্রম করে অনেক উর্ধ্বে কোথাও নিবদ্ধ। কিসের চিন্তায় বিভোর।

সেদিন মহারাজা খেমার কক্ষে প্রবেশ করতে বহুদিন পরে খেমা পরম আগ্রহে এগিয়ে এসে মহারাজকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে ওঠেন—মহারাজ, তিনি এসে গিয়েছেন। আমাকে একবার নিয়ে চলুন। আমি দেখব। আমি আর পারছি না।

রাণীর এই অবস্থা দেখে মহারাজের হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল। তিনি রাণীর মস্তকে ও কপোলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন—কে এসেছেন খেমা? তোমাকে নিশ্চয় তাঁর কাছে নিজে যাব। তুমি যা বলবে তাই করব।

শিশুর মুখের মত খেমার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন—আমাকে সত্যি নিয়ে যাবেন? কবে নিয়ে যাবেন?

—যেদিন বলবে। কিন্তু কে এসেছেন তা তো বললে না।

—আমি যাঁর প্রতীক্ষায় বসে আছি। দিন গুনছিলাম এতদিন। সমস্ত ধরিত্রী বসে ছিল যাঁর জন্য।

মহারাজ বিম্বিসার অসুবিধায় পড়েন। খেমার চোখের আলোয়, মুখের কথায় স্থির বিশ্বাসের দৃঢ়তা।

তিনি বলেন—কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব রাণী। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই নিয়ে যাব।

রাণীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি অভিমান ভরে বলেন—তাঁকে চিনতে পারছেন না কেন? তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছেন। ঈশ্বর আপনাদের দ্বারে, তবু চিনে নিতে পারছেন না।

—ঠিক আছে। তুমি স্থির হও। আমি অনুসন্ধান করছি। তোমার বাসনা অপূর্ণ রাখব না। তাঁর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।

খেমা নিশ্চিন্ত হন।

মহারাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি মন্ত্রীকে ডেকে রাণীর আধ্যাত্মিক ভাব, তাঁর মানসিক অবস্থা ও তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের বিষয় ব্যক্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন—এমন কোন ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে কি যিনি ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন?

মন্ত্রী সসঙ্কোচে বলেন—আমি ঠিক বলতে পারছি না। নগররক্ষককে ডেকে জেনে আপনাকে বলছি।

নগররক্ষক কথাটা শুনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনিও শোনেননি। তারপর অনুসন্ধানের জন্য কিছু ব্যক্তিকে নিয়োগ করলেন। অনুসন্ধান করে জানলেন সংবাদ সঠিক। একজন রাজপুত্র এই মগধেরই একস্থানে দীর্ঘদিন তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করে সিদ্ধ হন। বহুদিন আগে অত্যন্ত কৃশতনু নিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে একসময় এই রাজগৃহ নগরীতে এসে ভিক্ষাও করেছেন। এখন আবার তাঁর পুনরাগমন ঘটেছে। নগরীর বহির্দেশে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যষ্টিবনে অবস্থান করেছেন দু একদিন হল। ইতিমধ্যেই তাঁর আকর্ষণে বহু মানুষ তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে যেতে শুরু করেছে। তাঁর সৌম মূর্তি, তাঁর মাধুর্য, তাঁর করুণাবিগলিত নয়নদ্বয় দেখে সবাই তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ছে।

বিম্বিসার শুনে বিচলিত বোধ করেন। তিনি তাঁর একজন অতি বিশ্বস্ত

ব্যক্তিকে একদিন সায়াহ্নে প্রেরণ করলেন যষ্ঠিবনে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দেশ যেভাবে অনাচারে ছেয়ে গিয়েছে, মানুষের নীতিবোধ যেভাবে নীচে নেমে এসেছে তাতে ভগবান মহাবীর ব্যতীত অপর কোন ঋষিকল্প ব্যক্তি মগধরাজ্যে বিরাজ করছেন একথা ভাবতে ভরসা পান না মহারাজ। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বুঝিয়ে বললেন, যষ্ঠিবনের সেই সাধুকে প্রলোভিত করতে হবে। বলতে হবে মহারাজ তাঁকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করবেন, সেই সঙ্গে মগধের অর্ধাংশ। তিনি যেন বনের মধ্যে অবস্থান করে নিজেকে নিগৃহীত না করেন। তিনি অনুমতি করলে মহারাজ তাঁর জন্য রথ প্রেরণ করবেন, প্রাসাদে আনয়নের জন্য।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন মহারাজ প্রেরিত ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়। সারারাত অতিবাহিত হয় তবু সে আসে না। মনে মনে ক্রুদ্ধ হন মহারাজ। পরদিন প্রত্যুষে তিনি দেখেন, সে আসছে। সে আসছে টলতে টলতে। মহারাজের সম্মুখে এসে তাঁকে প্রণাম জানাতেও ভুলে যায়।

রুষ্ট বিম্বিসার একটু উচ্চকণ্ঠে বলেন—এতক্ষণে আসার সময় হল?

মহারাজের কথার উত্তর সে দিতে পারে না। শুধু কাঁদে।

—কি হল? তিনি কি বললেন?

তবু সে নীরব।

অধৈর্য মহারাজ সেই অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিটিকে তিরস্কার করে বলেন—আমি তোমাকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলাম, ক্রন্দনের জন্য নয়।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পায় লোকটি। সে মহারাজের সামনে নতজানু হয়ে বলে—মহারাজ আপনি আমার পরিত্রাতা। আপনি তাঁর কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি আজীবন আপনার দাসত্ব করে যাব। আপনি না পাঠালে তাঁকে দেখতে পেতাম না।

মহারাজা এবারে নম্রভাবে বলেন—বেশ তো। এবারে বল, কি বললেন তিনি।

—মহারাজ, যে হিমালয় সমস্ত নদীর উৎস, তাকে বারি উপঢৌকন দেবার কথা বলা যায়? সূর্যদেবকে কি কখনো বলা যায় আপনাকে তেজ উপহার দেব? না মহারাজা আপনার ওই প্রস্তাব তাঁকে দেখার পর উত্থাপন করার কথা মনে নেই। আপনিও পারবেন না।

মানুষটিকে বিম্বিসার খুব ভালভাবে চেনেন। তার মানসিক অবস্থা দেখে মহারাজা ভাবলেন, মহিষী খেমা যাঁর কথা বলেছেন, ইনি সেই ব্যক্তি বটেন।

পরদিন বহু ব্রাহ্মণ সমভিব্যহারে তিনি স্বয়ং যাত্রা করলেন যষ্টিবনের উদ্দেশে এবং সেখানে পৌছে ভক্তপরিবৃত সেই মূর্তির দিকে একদণ্ড দৃষ্টিপাত করেই তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা শাক্য মুনির পদতলে লুটিয়ে পড়লেন।

সমগ্র যষ্টিবন প্রকম্পিত করে সুমিষ্ট গম্ভীর বাণী উচ্চারিত হল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ইনিই তিনি, খেমার অন্তরে যিনি বার্তা পাঠিয়েছেন। যাঁর জন্য খেমার কৈবল্য দশা। সমগ্র জীবাত্মার অন্তরে এঁরই আগমন বার্তা ধ্বনিত হচ্ছিল। ইনিই তিনি। কোন সন্দেহ নেই।

মহারাজ সেই মুহূর্তে পাশ্ববর্তী গৃধ্রকূটকে বেষ্টন করে যে বেণুবন—কলণ্ডিকানিবাপ রয়েছে সেই ভূখণ্ডটি বুদ্ধদেবকে সমর্পণ করলেন, তাঁর এবং ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্য।

এত যে কিছু ঘটেছে, এত উত্তেজনা এত অস্থিরতা, তার মধ্যে মহাবোধি স্থির অচঞ্চল। মুখে তাঁর সর্বক্ষণ একটা শান্ত হাসির ছোঁয়া। সেই হাসিতে অভয়, সেই হাসি সর্বক্ষণ যেন বলছে, তোমরা নিজেরা ভালভাবে চল, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভালভাবে চলবে। নিজেরা হিংসার আশ্রয় নিও না, দেখবে হিংসা হ্রাস পাবে। কুসংস্কারের নিকট আত্মসমর্পণ কর না। বাস্তব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কয়েকটি অতি মূল্যবান নীতি মেনে চল। তোমরা শান্তি পাবে। বাহ্যিক আড়ম্বর আর ঈশ্বরের নামে হৈ-হট্টোগোলের মধ্যে কিছু নেই। নিজে খাঁটি থাক, তবেই হবে। দুঃখ কষ্ট তখন আর স্পর্শ করবে না তোমাদের।

মহারাজ বিম্বিসার তাঁর সঙ্গে আগত ব্রাহ্মণদের বিদায় দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে বসে রইলেন বুদ্ধদেবের সম্মুখে। তাঁর বাসনা তখনই তাঁর নিকট দীক্ষিত হন।

গৌতম বুদ্ধ একসময় মৃদু কণ্ঠে বললেন—তাঁকে নিয়ে এস মহারাজ।

—খেমা?

তথাগত মস্তক হেলিয়ে বলেন—হ্যাঁ।

নৃপতি বিম্বিসার তখনই বুদ্ধের নির্দেশ মাথায় নিয়ে ফিরে চললেন রাজপ্রাসাদে। তাঁর প্রতি অনুকম্পায় ভরে উঠল বুদ্ধদেবের অন্তর। কিন্তু কিছু করার নেই। পৃথিবী তো এই নিয়মেই চলবে। ব্যাঘ্র মৃগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, শ্যেনপক্ষী ক্ষুদ্র জীবকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। এরই নাম প্রকৃতি। মহারাজের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিবিধানের কোন অর্থ হয় না। এই ভাবে পৃথিবী চলে। একটি ক্রিয়ার একাধিক

প্রতিক্রিয়া। দুঃখ আছে বলেই এটা পৃথিবী। নইলে দুঃখের অতীত আনন্দ, সুখ আর শান্তির যে স্বর্গরাজ্য মানুষ কল্পনা করে ধূলোমাটির ধরিত্রীও তাই হয়ে উঠত। এরা সবাই যেন দুঃখকে জয় করতে পারে। অনর্থক দুঃখের ফাঁদে পা না দেয়।

ভক্তকুল বুদ্ধদেবের অন্তরের অতল গভীরে প্রবেশ করতে না পারলেও মহাবাজের প্রতি ভগবান বুদ্ধের মনোভাব কিছুটা যেন অনুমান করতে পারে। দুঃখশোক বুদ্ধদেবের অন্তব স্পর্শ না কবলেও ভক্তবৃন্দের করে। তাঁবা দুঃখ-কষ্টেব অতীত নন কেউ। তাঁরা তো বুদ্ধ নন। বোধিসত্ত্বেব অবস্থাতে পৌছনও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয।

তবে ভক্তবৃন্দের মধ্যে রাজগৃহেবই দুইজন রয়েছেন যাঁরা বুদ্ধদেবের অনুপ্রেরণায়, শিক্ষায় এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা হলেন সারিপুত্ত ও মোগ্গালান।

কদিন পরে স্বয়ং মহারাজ ও রাজমহিষী খেমার দীক্ষাগ্রহণে সমগ্র মগধ রাজ্যে সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে সকলে আসতে লাগল বেণুবনে। মহা-কাশ্যপ নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি দীক্ষিত হলেন। এত বেশী মানুষের সমাগম শুরু হল যে অনাথপিণ্ডিকা নামে একজন শ্রেষ্ঠী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহু বিহার নির্মাণ করে দিলেন বসবাসের জন্য। রাজগৃহ হয়ে উঠল বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল। হবেই বা না কেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব যে এখানে সশবীরে অবস্থান করছেন।

শুধু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেই তৃপ্ত থাকলেন না অনেকে। পুরুষেরা যদি ভিক্ষু হতে পারেন, নারীদের তাহলে ভিক্ষুণী হতে বাধা কোথায়? গৌতম বুদ্ধের নিকট এই প্রার্থনা রাজগৃহ তথা সমগ্র মগধরাজ্যের নারীসমাজের। বুদ্ধদেব সম্মতি জানালেন।

ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বিরাজ করছেন রাজগৃহের অতি সন্নিকটে বেণুবনে, তথাপি বহু মানুষের মনে চৈতন্যের উদয় নেই। তারা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবক্ষয়ের ফলে যে সমস্ত কুসংস্কার কু-আচারের জন্ম হয়েছে, তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। এই রাজগৃহে এক ধরনের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, যাতে নগরবাসীরা যথেচ্ছ মাংস ভক্ষণ করে উদরপূর্তি করে এবং তারপর অত্যধিক সুরাপানে এত বেশী উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে সেই উন্মত্ততা সমস্ত শ্লীলতার সীমারেখা অতিক্রম করে ব্যাভিচারের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। এতদিন এই উৎসব মহারাজের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। কারণ চিরকাল এই উৎসব দেখতে তিনি অভ্যস্থ।

নাগরিকদের এই বাঁধন-ছেঁড়া আনন্দে তিনিও আনন্দিত হতেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের পদে অর্ঘ্য নিবেদনের পর থেকে তাঁর ধারণা হল এটি উৎসব নয়, উৎসবের নামে অনাচার। কিন্তু মহারাজা হয়েও এক কথায় বন্ধ করে দিতে পারেন না এসব। নগরবাসীরা আঘাত পাবে। ভগবান তথাগতের কৃপায় এদের চিত্তেও নিশ্চয় আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটবে ধীরে ধীরে। তখন আপনা হতে এই উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবে। তিনি লক্ষ্য করেছেন মগধবাসীদের অধিকাংশই অকৃত্রিম হৃদয়ে ভিক্ষুদের সম্মান জানায়। তাঁদের সুখসুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখে। এটা খুব শুভ লক্ষণ। ভিক্ষুরা তাঁকে বলেছেন যে রাজগৃহ তাঁদের নিকট নিজ গৃহ। এখানে তাঁরা কোনরকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন না। নিশ্চিন্ত মনে বুদ্ধদেবের নির্দেশ মত কাজ করে যেতে পারেন।

একদিন রাণী খেমাকে সঙ্গে নিয়ে নৃপতি বিম্বিসার বেণুবনে উপস্থিত হন বুদ্ধদেবকে দর্শন করে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের মানসে। শকট থেকে অবতরণ করেন বেণুবনে প্রবেশের পূর্বেই। তারপর রাণী খেমা ও তিনি পদব্রজে অগ্রসর হন সুগত যেখানে দিনের অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন থাকেন, সেইদিকে। পথিমধ্যে যেখানে বেণুবন ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় সুশীতল ছায়া বিস্তার করেছে, সেখানে সহসা সম্মুখে আবির্ভূত হন দেবদত্ত। মহারাজা জানেন, ইনি বুদ্ধদেবের নিকট আত্মীয় এবং তাঁর সঙ্গে থাকেন। সুতরাং ইনি শ্রদ্ধেয়। এই বিবেচনা করে তাঁকে প্রণতি জানান। রাণী খেমা একটু দূরে সরে গিয়ে অধীর দৃষ্টিতে যেখানে বুদ্ধদেব থাকেন সেইদিকে চেয়ে রইলেন। রাণীকে মহারাজার ইঙ্গিতে বলার ইচ্ছা ছিল দেবদত্তকে প্রণাম করতে। পারলেন না। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। সহসা রাণীর এত অন্যমনস্ক হয়ে যাবার কি কারণ ঘটল?

দেবদত্ত মহারাজের মনোভাব বুঝতে পেরে বলে ওঠেন—ঠিক আছে, মহারাজা। ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনার শকটের শব্দ শুনেই আসছিলাম।

—আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হয়েছেন?

—হ্যাঁ, ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত মহারাজা হওয়া যায় না। আপনি সেই বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। আপনার সম্মান ভিন্ন।

বিম্বিসার এই কথা শুনে রীতিমত হতচকিত হন। বুদ্ধদেব এ ধরনের কথা কখনো বলেন না। তবে কেন ইনি তাঁরই আত্মীয় হয়ে এত সাধারণ কথা বলছেন?

বিনম্র স্বরে তিনি বলেন—ভগবান তথাগত এই জাতীয়—

তাঁর কথা অর্ধসমাপ্ত থাকতে দেবদত্ত বলে ওঠেন—ও এই জাতীয় কথা

বলে না, এই তো? সিদ্ধার্থকে আমি শৈশব থেকে দেখছি। কখন কি বলে, কখন কি করে, কোন স্থিরতা নেই। তাই ওর তত্ত্বাবধানে থাকি সব সময়। চলুন আমার কুটিরে।

দেবদত্তের কথা শুনে মহারাজের মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি দেবদত্তের সঙ্গে যেতে দ্বিধাবোধ করেন। তাঁর কথোপকথন মনের প্রশান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেন খেমা নিজে থেকে এগিয়ে চলেছে।

—খেমা।

মহারাজা খেমার কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে বলেন—উনি ওঁর কুটিরে যেতে বলছেন।

অস্থির খেমা বলে ওঠে—আমি ওঁকে সহ্য করতে পারি না। আমায় আপনি ক্ষমা করুন। আমি ভগবান তথাগতের কাছে যাব, অন্য কোথাও নয়।

মহারাজা অপ্রস্তুত হন। তিনি দেবদত্তকে বলেন, রাণীর বাসনার কথা। বুদ্ধদেব ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি যেতে রাজী নন।

—বেশ তো। মহারাণীর ইচ্ছার প্রাবল্য যখন আপনার ইচ্ছার চেয়ে অধিক, তখন নিশ্চয় আপনারা সেখানে যাবেন। সেখানেই যান তবে।

মহারাজা খেমার সঙ্গে চললে দেবদত্তের মুখে কয়েকটি কুটিল রেখা ফুটে ওঠে। সেই রেখার মধ্যে হিংসা দ্বেষ সবই ছিল। সেই মুহূর্তে, সেই স্নিগ্ধ সমীরণে সঞ্চালিত বেণুবণের দীর্ঘশীর্ণ অসংখ্য পত্রাবলী হতে উত্থিত সঙ্গীত মুর্ছনার স্বর্গীয় পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে দেবদত্ত নিষ্করুণ চিত্তে স্থির করে ফেলেন মহারাজের সর্বনাশ ঘটাতে হবে। তাঁকে অবহেলা করে সিদ্ধার্থকে যে এতখানি প্রাধান্য দেয়, তাকে সহ্য করা যায় না। মহারাজ সাধারণ মানুষ নয়, যে তাঁর এই অবহেলাকে ভুলে যাবেন। সাধারণ মানুষেরা তাঁকে অপছন্দ করলে কিছু এসে যায় না। বিম্বিসারকে এর ফলভোগ করতে হবে। তির্যক দৃষ্টিতে মহারাজা ও রাণী খেমাকে একবার দেখে নিয়ে দেবদত্ত দ্রুতপদে চললেন তাঁর কুটিরে যেখানে তাঁর বিশ্বস্ত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সব সময় উপস্থিত থাকে। তাঁর নির্দেশে তারা বুদ্ধদেবের প্রচারে কখনো বিঘ্ন ঘটায়, কখনো বুদ্ধদেবের অপযশ গেয়ে বেড়ায়। কয়েকবার তারা তাঁর প্রাণবিনাশের জন্যও সচেষ্ট হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পারে নি। সেই কবে থেকে দেবদত্ত তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতার সর্বনাশের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, এখন পর্যন্ত সফল হতে পারলেন না। সিদ্ধার্থ যুবরাজ বলে প্রথম থেকে দেবদত্ত হীনমন্যতায় ভুগতেন। তারপর সিদ্ধার্থ সংসার ছাড়লেন, রাজ্য ছাড়লেন, সব কিছুই ছাড়লেন। তবু দেবদত্ত তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। তারপর একসময় দেখলেন শৈশবের সেই সিদ্ধার্থ রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে এলেও, আর

এক ঐশ্বর্য তাঁকে মানুষের কাছে বরণীয় করে তুলল। দেবদত্তের কাছে অসহ্য মনে হল। তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না, তাঁর মনোভাব জেনেও বুদ্ধদেব তাঁকে কাছে রেখেছেন, কখনো তাঁকে কিছু বলেননি। ব্যবহার তাঁর চিরকালের মত মিষ্ট। দেবদত্তের ধারণা নেই শৈশবের সেই সিদ্ধার্থ কত উচ্চস্তরের। স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে না, এই সিদ্ধার্থের জন্য ধরিত্রীর মানব সন্তানেরা যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করে থাকে।

মহারাজা বিম্বিসার ও রাণী খেমা বহুক্ষণ বুদ্ধদেবের নিকট বসে রইলেন। ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকে শুধু নিরীক্ষণ করলেন। তাতেই কি শান্তি। খেমার নয়ন বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে অবিরল।

অনেকক্ষণ পরে মহারাজা ভিক্ষুদের নিকট দেবদত্ত সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। কেউই কিছু বলতে চাইলেন না। শুধু একজন একটু হেসে বলেন—মহারাজ এত বড রাজ্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করেন, তবু দেখবেন আপনার প্রাসাদেই সবচেয়ে বেশী অপশাসন বিরাজ করছে। আপনি ন্যায়ের ধারক, অথচ দেখবেন আপনার কাছের কোন মানুষ সবচেয়ে বেশী অন্যায় করে চলেছেন। প্রদীপের নীচে সর্বাপেক্ষা বেশী অন্ধকার। এটা নিয়ম।

মহারাজা বিম্বিসার নীরব রইলেন।

সেই সময় সারিপুত্ত বাইরে থেকে এসে মহারাজকে দেখে বলেন—ভগবান আজ ধ্যানস্থ। কথা হল না তো ?

—না। কোন ক্ষতি নেই তাতে। খেমা কিরকম তন্ময় হয়ে বসে রয়েছে। আমি খেমা হতে পারলাম না।

সারিপুত্ত বলেন—আমিও কি পারলাম ?

মহারাজ বলেন—ভগবান কি সত্যই আগে রাজগৃহে ছিলেন ?

—বহুদিন আগের কথা। তিনি কোথায় বোধিলাভ করেন, এখন সেকথা কারও অজানা নয়। রাজগৃহ তাঁর প্রিয় স্থান। শুধু এ জন্মের নয়। এ জন্মেও তাঁর অনেকদিন কেটে গেল। এখন তাঁর বয়স হয়েছে। আপনার চেয়েও তিনি পাঁচ বৎসরের বড়। কিন্তু প্রথম যখন তিনি রাজগৃহে আসেন, তখন তরুণ।

মহারাজা অনুশোচনার কণ্ঠে বলেন—আমি বুঝতে পারিনি।

—কে পেরেছিল ?

—কিন্তু ওঁর এত বয়স হয়েছে বোঝা যায় না। মুখখানা তারুণ্যে ঝলমল করছে।

—ঠিক বলেছেন মহারাজা। বয়স বৃদ্ধি পায় জাগতিক চিন্তায় আর

দুর্ভাবনায়, দুঃখে কষ্টে আর শোকে। ওঁর যে সেসব কিছু নেই। আমাদেরও সেই শিক্ষা দিতে ওঁর আবির্ভাব। গ্রহণ যারা করতে পারবে না, তারা বড় দুর্ভাগা।

—আমি তাদের মধ্যে একজন।

সারিপুত্ত হেসে বলেন—তার প্রমাণ এত তাড়াতাড়ি হবে কি করে মহারাজ?

কথোপকথনের সময় সারিপুত্তের ভগিনীত্রয় চালা, উপচালা ও শিশু-উপচালা সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরা বিম্বিসারকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে নম্রস্বরে বলেন—মহারাজ, মহিষী খেমা ভিক্ষুণী হতে চান।

—খেমা?

—হ্যাঁ মহারাজ, তিনি শুনেছেন বৈশালীতে ইতিমধ্যে অনেক রমণী ভিক্ষুণী হয়েছেন। ভগবান তথাগত নারীদের সেই অনুমতি পূর্বেই দিয়েছেন। রাণী দেখলাম মনস্থির করে ফেলেছেন।

—আর কেউ?

—হ্যাঁ মহারাজ, অনেকেই হতে চান। ব্রাহ্মণ কন্যাদ্বয় মিত্তিকা আর শুভা অধীর হয়ে উঠেছেন। এছাড়াও আছেন ধম্মদিন্না ও চিত্ত। এছাড়া স্বর্ণকার কন্যা অপর এক শুভাও আছেন। রাণী খেমা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করলে, তাঁরাও করবেন।

মহারাজা এক পলকের জন্য সারিপুত্তের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন—স্বয়ং অমিতাভের যেখানে আপত্তি নেই, আমার আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। আমি শুধু নিজে একবার খেমাকে জিজ্ঞাসা করব।

ভগিনীত্রয় নিম্ন অথচ মধুর কণ্ঠে বলে ওঠেন—মহারাজের জয় হোক।

কদিন পরে খেমা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা জোয়ার এল। সেই সময় বুদ্ধদেব দেশের সমস্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আহ্বান করলেন রাজগৃহে। সঙ্ঘ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে উপদেশ দিয়ে, সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য সাত প্রকারের বিধি নির্ণয় করে সেই বিধিগুলি কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দিলেন।

এর কিছুদিন পরে তিনি ভিক্ষুদের নিয়ে বেণুবন ত্যাগ করে কিয়ৎকালের জন্য যাত্রা করলেন খানুমত নামে একটি গ্রামের উদ্দেশে। একজন ভিক্ষু তাঁকে জানিয়েছিলেন যে গ্রামটির অধিবাসী সকলেই ব্রাহ্মণ। তারা তাঁকে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু নারী ও শিশুদের পক্ষে এতদূরে এই বেণুবনে আগমন সম্ভব নয় বলে তারা হতাশাগ্রস্থ। বুদ্ধদেব তখন স্থির করলেন তিনি স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হবেন তাদের দ্বারে। তাই সপ্তবিধি স্থির করে দেবার

পরেই সকলকে নিয়ে ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত খানুমত গ্রামের দিকে চললেন।

চলতে চলতে সহসা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভক্তদের সবাই থেমে যায়। ঠিক যেন এক বেগবতী প্রবাহিনীর গতি রুদ্ধ হয়ে গেল।

বুদ্ধদেব সারিপুত্তকে ডেকে বললেন—মোগ্গল্লানের চরম পরীক্ষার দিন সমাগত।

সারিপুত্ত বিস্মিত হন। ভগবান সহসা একথা কেন বললেন? তাঁর মনে বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটে। সবাইকে বুদ্ধদেব সঙ্গে নিয়ে এলেন, মোগ্গল্লানকে একাকী রেখে এলেন বেণুবনে। তাঁর কোন অপযশ কিংবা ক্ষতি হলে সারিপুত্তের প্রাণে বাজবে। তিনি ভগবান তথাগতের মত দুঃখশোকের উর্ধে নন।

তিনি বুদ্ধদেবকে শুধু বললেন—ভগবান, আপনি ওঁকে ওঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করুন।

বুদ্ধদেবের মুখে অস্পষ্ট হাসির স্পর্শ। তিনি বলেন—আমি ইচ্ছে করে ওকে রেখে এসেছি।

বিদ্যুৎ চমকের মত অতি ক্ষণকালের জন্য সারিপুত্তের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। তিনি বলে ফেলেন—আপনার ভ্রাতা দেবদত্তের জন্য?

বুদ্ধদেব নীরব থাকেন।

সারিপুত্তের অনুশোচনা হয় অবিবেচকের মত কথাটা বলে ফেলে। বুদ্ধদেব কখনো এসব পছন্দ করেন না। অতি বড় সহৃদয় মানুষের প্রতি তাঁর যেমন অহেতুক পক্ষপাতিত্ব নেই, অতি বড় শত্রুর প্রতিও তাঁর বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই। তিনি চিরশান্ত। সবার প্রতি সমান মমত্বপূর্ণ তাঁর হৃদয়।

আরও অনেকখানি পথ অতিক্রম করার পরে একসময় একজন ভিক্ষু বলে ওঠেন—ওই যে সম্মুখে খানুমত গ্রাম। আর ওই যে তার অদূরে বৃহৎ আম্র লতিকাকুঞ্জ দেখা যাচ্ছে। নৃপতি বিম্বিসার একবার বহু পূর্বে মৃগয়ায় এসে ওই কুঞ্জের সৃষ্টি করেন। পরে আরও কয়েকবার তিনি ওখানে এসেছেন।

আম্র-উদ্যানের নিকটে এসে বুদ্ধদেব বলেন—আমি ফিরে এসে এখানেই থাকব।

সবাই বুঝতে পারে না তাঁর কথার মর্মার্থ। তিনি কোথা থেকে ফিরবেন? তাঁর তো এখানে থাকার কথা। এখানকার ভরদ্বাজ গোত্রীয় আর অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা তাঁর আশায় দিন গুনছে।

সারিপুত্ত বলেন—ভগবান, এখানেই আপনার আসার কথা।

—হ্যাঁ সারিপুত্ত। জানি। আমি ফিরে আসব। তোমাদের মধ্যে যারা পথ-

শ্রান্ত তারা এখানে বিশ্রাম নাও। আমি আসছি।

বুদ্ধদেব কিসের আকর্ষণে যেন এগিয়ে চললেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজনও বিশ্রামের জন্য আম্রলতিকায় থাকতে চাইল না। তারা কেউ ক্লান্ত নয়। বুদ্ধদেবের সান্নিধ্যে থাকলে মুহুর্মুহু নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায় পথশ্রম দেহমনকে স্পর্শ করতে পারে না। এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ।

কোথাও স্রোতস্বিনী, কোথাও পর্বত, কোথাও অরণ্য, কোথাও দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর—এগিয়ে চলেন বুদ্ধদেব। তিনি যেন সম্মোহিত। তাঁর সঙ্গীরাও সম্মোহিত অবস্থায় চলেছেন তাঁর পিছু পিছু।

অবশেষে বুদ্ধদেব এক জায়গায় এসে থামেন। নির্নিমেষ নয়নে একাদিকে চেয়ে রইলেন তিনি। পরে অঙ্গুলি উত্তোলন করে তাঁর সর্বসময়ের সহচর আনন্দকে প্রশ্ন করেন—ওই স্থানটির নাম কি আনন্দ?

একজন ভিক্ষু বলে ওঠেন—ভগবান, ওই গ্রামের নাম নালন্দা।

—নালন্দা। ওখানে আমি কিছুদিন থেকেছি।

উৎসাহিত হয়ে একজন বলে ওঠেন—হ্যাঁ ভগবান। শুনেছি বর্ধমান মহাবীরও ওখানে বহুদিন তপশ্চারণা করেছেন।

—খুব স্বাভাবিক। অমন যোগ্য স্থান দুর্লভ।

তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে স্থানীয় একজন অধিবাসী কৌতূহলান্বিত হয়ে এগিয়ে আসে। বুদ্ধদেবের পরিচয় পেয়ে তাঁর পদতলে প্রণতি জানায়।

সে বিনত স্বরে বলে—আমি ভগবান মহাবীরের জৈনধর্মে দীক্ষিত।

বুদ্ধদেব বলেন—খুব ভাল। আপনি ভাগ্যবান।

লোকটি বলে—আমার বাসনা তাঁকে অন্তত আর একবার দর্শন করা।

এবারে সারিপুত্ত বলেন—তিনি রাজগৃহের সন্নিকটে আছেন।

—জানি। সময় করে উঠতে পারছি না। চাষবাসের কাজ। শেষ হলেই যাব।

বুদ্ধদেব এগিয়ে যেতে গিয়েও কি মনে করে লোকটিকে প্রশ্ন করেন—মহাবীর কতদিন রয়েছেন রাজগৃহে?

একটু ভেবে নিয়ে সে বলে—এবার নিয়ে চতুর্দশ বর্ষকাল হবে।

বুদ্ধদেবের নয়নে করুণা। তিনি বলেন—তাঁকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকলে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে এখনই চলে যান তাঁর কাছে।

—আমার খেত, আমার চাষবাস?

এবারে আনন্দ একটু জোর দিয়ে লোকটিকে বলে ওঠেন—বুঝলেন না?

খেতখামারের কথা ভাবলে ভগবান মহাবীরের দর্শন জীবনে আর লাভ হবে না আপনার।

লোকটি বুদ্ধদেবের পদধূলি নিয়ে মাটিমাখা হাত দিয়ে মাথার মলিন পাগড়ি ভালভাবে বেঁধে নিয়ে সত্যই ছুটল রাজস্থানের পথে। পড়ে রইল তার ঘরবাড়ি, স্ত্রী পুত্র পরিবার।

বুদ্ধদেব নয়নভরে তাকে দেখতে লাগলেন। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে আবার তিনি নালন্দার দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হল তাঁর মনোদর্পণে ভবিষ্যতের ছবি প্রতিফলিত হতে থাকে। তাঁর চক্ষুদ্বয়, যা অধিকাংশ সময় ধ্যানে নিমীলিত থাকে, তাতে স্বপ্নের আবেশ। সকলে হৃদয়ঙ্গম করল, নালন্দা স্থানটি তাঁর আশীর্বাদ-ধন্য হল।

এরপর বুদ্ধদেব আবার ফিরে এলেন খানুমত গ্রামে। গ্রাম সংলগ্ন আম্র-লতিকা কুঞ্জে তিনি অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর আগমনবার্তা খুব শীঘ্র চারদিকে প্রচারিত হল। দলে দলে নারী পুরুষ আসতে থাকে তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। আম্রলতিকাকুঞ্জ জনসাধারণে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

খানুমত গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্রাহ্মণের নাম কূটদন্ত। তিনিই হলেন গ্রামের ভূম্যাধিকারী। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীকে নিয়ে একদিন কুঞ্জে এসে উপস্থিত হন বুদ্ধদেবের বাণী শ্রবণের মানসে। বহুক্ষণ ধরে তাঁরা বুদ্ধদেবের সহজ সরল অথচ হৃদয়স্পর্শী বাণী শোনেন। তাঁরা বিচলিত হন।

কূটদন্ত বুদ্ধদেবকে প্রণতি জানিয়ে বলেন—প্রভু, আমাদের সকলকে আপনি আশ্রয় দিন। আপনার বাণী শুনে আমাদের অশান্ত চিত্ত শান্তির পথের নির্দেশ পেয়েছে।

এদিকে রাজগৃহ ম্রিয়মান। বুদ্ধদেব বেণুবন—কলণ্ডকনিবাপ পরিত্যাগের পর কলণ্ডকরাও যেন খাদ্যান্বেষণের জন্য বৃক্ষ থেকে অবতরণে অনাগ্রহী। তারা ওপরে বসে থাকে। এই সব কাঠবিড়ালীদের খেলা এবং সামনের দুখানা পা দিয়ে খাদ্য তুলে নিয়ে খাওয়া স্বয়ং তথাগতও উপভোগ করতেন। ওদের নির্ভয়ে বিচরণভূমি হল এই বেণুবন।

শুধু কাঠবিড়ালীরা নয়, রাজগৃহের অধিবাসীরাও যেন বিষণ্ন। বিম্বিসার জেনেছেন বুদ্ধদেব এখন প্রধানত আম্রলতিকাতেই থাকবেন। তবে মাঝে মাঝে বেণুবনে ও গৃধ্রকূটে আসবেন।

এই সময়ে আর এক অপ্রত্যাশিত আঘাত। এই আঘাত প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হল মগধবাসীর অন্তরে।

বর্ধমান মহাবীর দেহত্যাগ করলেন। জৈনধর্ম যাদের আত্মা তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। অথচ তারা ভালভাবে জানত মহাবীর আর বেশীদিন তাদের মধ্যে থাকবেন না। কিছুদিন ধরে কখনো ইঙ্গিতে কখনো কিছুটা স্পষ্টভাবে তিনি সকলকে বলে আসছিলেন ইহলোকে এবারের মত তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। শীঘ্র তিনি বিদায় নেবেন। কিন্তু জানলেই কি মন মানে? প্রায় এক পক্ষকাল রাজগৃহের পথঘাট জনশূন্য রইল বলতে গেলে। যেন রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে নগরীর। তারপর খুব ধীরে ধীরে আবার সব কিছু স্বাভাবিক হতে থাকল।

সকলেই বলাবলি করতে থাকে একটা ঘোর দুর্দিন এগিয়ে আসছে। নইলে রাজগৃহ এত প্রাণহীন মনে হয় কেন? মনে হয়, একটা অশুভ ছায়া, একটা অন্ধকার চারদিকে বিরাজ করছে। এ অন্ধকার কিসের অন্ধকার? অন্তরের, না বাইরের? যাই হোক না কেন, মোগ্‌গল্লান তথাগতের নির্দেশ মত বেণুবনে অবস্থান করে অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্ঘের কার্য পরিচালনা করে চলেন। বুদ্ধদেব না থাকায়, সাধারণ মানুষের উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও, প্রকৃত কাজ সঠিকভাবে এগিয়ে চলে। অনেক ভিক্ষু আসেন, ভিক্ষুণী আসেন। স্তবগানে বেণুবনের পরিবেশ সুরেলা হয়ে ওঠে।

সেই সময় এক রাতের অন্ধকারে দেবদত্তকে একাকী বেণুবনের প্রান্তে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে অস্ফুটস্বরে কাউকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন তিনি। আর তখনি দেখা যায় এক বিরাট বপু দীর্ঘকায় পুরুষ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে এল তাঁর নিকট।

—এত বিলম্ব?

—ক্ষমা করবেন। সকলের অলক্ষ্যে আসতে হয়েছে। কেউ দেখে ফেললে কার্যোদ্ধার হবে না।

—ঠিক আছে। আগামী কাল বেণুবনে সন্ধ্যার পরে আর কেউ থাকবে না। সেই ব্যবস্থা আমি করেছি। ও একা থাকবে।

—আপনার দেখা কোথায় পাব তারপরে?

দেবদত্ত আর একটু হলে বলে ফেলতেন যে আজ রাত্রেই তিনি অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা নগরীর দিকে যাত্রা করবেন। কিন্তু এই সব মানুষেরা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হয় না। এদের স্বভাবে রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা।

তিনি বলেন—আমার দেখা এখন পাবে না। তোমার জন্য অপর এক

বৃহৎ কার্যের আয়োজন করতে আমি ব্যস্ত থাকব। সেই তুলনায় কালকের কাজ অতি তুচ্ছ।

—তবু আপনার সঙ্গে দেখা করলে ক্ষতি হবে কি?

—হতে পারে। সম্ভবত আমি কিছুদিন রাজাধানীতে থাকব না।

—ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে যে কথা দিয়েছিলেন তার কি হবে?

—কোন চিন্তা করো না। তোমার দ্বিতীয় ও শেষ কার্যের পরেই তুমি সমাজের এক গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হবে। কারণ নতুন রাজার অনুগ্রহ তুমি পাবে।

—নতুন রাজা? কেমন কথা?

—আমার ওপর নির্ভর কর। বেশী বুঝতে চেষ্টা কর না।

দেবদত্তের কথার দৃঢ়তায় লোকটি নীরব হয়।

দেবদত্ত দ্রুত স্থানত্যাগ করেন। ঊর্ধাকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের উদয় হচ্ছিল। সেই চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোয় তিনি কিছুদূরে মনুষ্য ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তাই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

দুদিন পরে অতি প্রত্যুষে একজন ভিক্ষু ছুটতে ছুটতে প্রাচীর বেষ্টিত রাজগৃহ নগরীর বেণুবনের দিকের দ্বারদেশে এসে দৌবারিককে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে থাকেন। তিনি রীতিমত উত্তেজিত।

—দ্বার খোল। দ্বার খোল দৌবারিক।

দৌবারিক ভিক্ষুকে দেখে। ভিক্ষুরা মগধরাজ্যে অতি সম্মানীয় ব্যক্তি। তবু মহারাজের কঠোর আদেশ রয়েছে স্বয়ং মহারাজও যদি রাত্রে বাইরে থেকে এসে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চান, তিনিও অনুমতি পাবেন না। কিন্তু এখন সূর্যের উদয় না হলেও অন্ধকার অপসারিত হয়েছে। তাছাড়া ভিক্ষুর কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত।

সে সত্বর সামনে এসে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে?

—খুবই দুঃসংবাদ। মহারাজের নিকট যাব। শীঘ্র দ্বার খোল।

দ্বারপাল ভাবে, একাকী এক ভিক্ষু মহারাজকে কোন গুরুতর সংবাদ দেবার জন্য ব্যাকুল। তাঁকে প্রবেশ করতে দিতে কোন বাধা নেই। রজনীর অন্ধকার এখন একটুও নেই।

সে দ্বার উদঘাটিত করে দেয়।

ভিক্ষু রাজপথ ধরে ধাবিত হন প্রাসাদের দিকে। ছুটতে ছুটতে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসে বসে পড়েন। তিনি তাঁর যৌবন বহুদিন অতিক্রম করেছেন।

অবসন্ন কণ্ঠে প্রাসাদের রক্ষীকে কোনরকমে বলেন—মহারাজের দর্শনপ্রার্থী আমি। ভীষণ বিপদ।

বিম্বিসারের নিদ্রা ভঙ্গ করে ভিক্ষুর আগমন বার্তা বলা হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে ভিক্ষুর কাছে দাঁড়ান।

—মহারাজা, সর্বনাশ হয়েছে। মোগ্‌গাল্লানকে রাতে কোন আততায়ী গুরুতররূপে আহত করে ফেলে রেখে গিয়েছে। এতক্ষণ বোধহয় তিনি মৃত।

—কী সর্বনাশ। কে সেই পাষণ্ড?

—জানি না মহারাজ।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ প্রাঙ্গণের একটি রথে আরোহণ করলেন। সঙ্গে চলল দেহরক্ষী এবং আরও অনেকে। রথ ধাবিত হল বেণুবনের দিকে। সেখানে বেণুবনের অভ্যন্তরে মোগ্‌গাল্লানের ক্ষুদ্র কুটিরের সামনে রথ থেকে অবতরণ করে মহারাজা ছুটে যান কুটিরের ভেতরে।

রক্তাপ্লুত মোগ্‌গাল্লান পড়ে রয়েছেন। মহারাজ তাঁকে ডাকেন। সাড়া মেলে না। তবে কি উনি মৃত? হে তথাগত! আপনি যে বেণুবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার ওপর সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। আমি এত অনুপযুক্ত?

একটু পরে বোঝা গেল, মোগ্‌গাল্লানের হৃদয়ে স্পন্দন রয়েছে। তিনি মৃত নন। মহারাজ তখন তাঁর রথ প্রেরণ করলেন প্রখ্যাত ভিষক্ জীবকের গৃহে। এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। রথ ছুটল।

মহারাজ দেখলেন বেণুবনে কেউ নেই। যে ভিক্ষু সংবাদ দিয়েছিলেন, জানা গেল তাঁরও ওখানে আসার কথা ছিল না। প্রথম রাতে তিনি ভগবান বুদ্ধের স্বপ্ন দেখেন। দেখেন বুদ্ধদেব আম্রলতিকা থেকে ফিরে এসেছেন আবার বেণুবনে। সেই সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন মধ্যরজনী অতিক্রান্ত হয়েছে। ভিক্ষু নিদ্রিত ছিলেন গৃধ্রকূটের নিকটবর্তী এক গুহায়। তাঁর মনে হল স্বপ্ন হলেও এটি সত্য। মনে হল, তথাগত তাঁকে এই মুহূর্তে বেণুবনে আহ্বান করছেন। কিন্তু বেণুবনে গিয়ে তাঁকে দেখতে না পেয়ে বিষণ্ণ হৃদয়ে ভাবলেন মোগ্‌গাল্লান তো রয়েছেন। তাঁকে গিয়ে স্বপ্নের কথা বলা যাবে।

মহারাজ অনুভব করলেন বুদ্ধদেবই এনেছেন এই সৌভাগ্যবান ভিক্ষুকে। সুতরাং মোগ্‌গাল্লানের মৃত্যু হবে না।

হল না। জীবকের অসাধারণ চিকিৎসার গুণে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। যদিও ক্ষতস্থানগুলি শুকিয়ে গেলেও প্রকটভাবে দৃষ্টিতে পড়তে লাগল। তবে ভিষক্ জীবকের মত হল ক্ষতের গভীরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। একেবারে

বিম্বিসার যখন তাঁর রাণী এবং পাত্রমিত্র অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর সিংহাসন ত্যাগের একটা সম্ভাব্য দিন স্থির করলেন, তখন দেবদত্ত অঙ্গ-দেশের রাজধানী চম্পা নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন। রাজগৃহে স্থির হয়েছে জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু মহারাজের উত্তরাধিকারী হয়ে মগধের সিংহাসনে বসবেন। অন্যান্য রাজপুত্রদের মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির শাসনভার দেওয়া হবে। কেউ ইচ্ছা করলে মগধের উচ্চ কোন পদেও আসীন থাকতে পারবেন। মহারাজের সিদ্ধান্তের প্রশংসা সবাই করল।

ওদিকে দেবদত্ত চম্পাতে উপস্থিত হয়ে অজাতশত্রুর প্রাসাদের দিকে চললেন। নগরীর অধিবাসীরা তাঁর পরিচ্ছদ দেখে বুঝল তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তারা তাঁকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। দেবদত্ত জানেন, এইসব শ্রদ্ধা প্রকৃতপক্ষে পৌঁছে যাচ্ছে সিদ্ধার্থের কাছে। সিদ্ধার্থের প্রতি তাঁর চিরদিনের বিদ্বেষ। কত চেষ্টা তিনি করেছেন, তাঁর ক্ষতি করতে। পারেননি। মনে আছে একবার উরুবেলতে যখন গৌতম তপস্যামগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর অনশনে এক রমণীকে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হতে দেখে হিংসায় জর্জরিত হয়ে দেবদত্ত ঠিক করেন সম্পর্কে ভ্রাতা হলেও, গৌতমকে আর জীবিত রাখা সম্ভব নয়। তিনি একজনকে ঠিক করেন তপশ্চর্যার সময় সিদ্ধার্থকে নিহত করতে। লোকটি পারল না। সে কৃশতনু তাপসকে দেখে কেঁদে আকুল। খুব নরম মন ছিল লোকটার। অথচ শোনা গিয়েছিল সে নাকি ওখানকার কুখ্যাত ডাকাত। তবে এবারে বেণুবনে মোগ্‌গাল্লান নিশ্চয় নিষ্কৃতি পায়নি। এবারের লোকটি সাংঘাতিক। তার মধ্যে কোমলতার স্থান নেই। মূল বৃক্ষকে মারতে না পারলে তার শাখাপ্রশাখা ছেদন করলেও কিছুটা কাজ হয়।

অজাতশত্রুর সম্মুখীন হয়ে দেবদত্ত বলে ওঠেন—মহারাজের জয় হোক।

অজাতশত্রু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন—আপনি বৌদ্ধ ভিক্ষু?

দেবদত্ত মুহূর্তে উপলব্ধি করেন, অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের প্রতি অতটা আস্থাশীল নন। তিনি স্মিত হেসে বলেন—বুদ্ধের নিকটের মানুষ হয়েও আমি বৌদ্ধ নই।

—কি রকম!

—সেকথা প্রকাশ্যে বলা অনুচিত হবে। আপনি অনুগ্রহ করে কোন কক্ষে আমাকে নিয়ে গেলে সব বলতে পারি।

কৌতূহলী অজাতশত্রু দেবদত্তকে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে গিয়ে বলেন—এবারে বলুন।

দেবদত্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—ওসব ধর্মের কথা এখন আদৌ মনে স্থান দেবেন না। আমি জানতে এসেছি আপনি সত্যিই মগধের অধীশ্বর হতে ইচ্ছুক?

—আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমি ব্যতীত আর কে হবে?

দেবদত্ত হেসে উঠে বলেন—জ্যেষ্ঠ পুত্র! ওসব কিছু নয়। বুদ্ধি আর শক্তি হল মূল কথা। নৃপতি বিম্বিসার যেভাবে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বিভোর হয়ে আছেন তাতে আমার আশঙ্কা মগধে অবস্থানরত কোন করিৎকর্মা রাজপুত্র তাঁকে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করে নেবেন। আপনি কতটা শক্তিশালী আমি জানি না। আর শক্তিশালী হলেই বা কি! চম্পা নগরী থেকে সেখানে গিয়ে পৌছনোর আগে সেই রাজপুত্র সবকিছু নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেবেন। আপনি তখন অবাঞ্ছিত।

দেবদত্ত যেন অজাতশত্রুর মনের আশঙ্কাকে পরিস্ফুট করে তুললেন। অজাতশত্রু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেবদত্তের দিকে চেয়ে বলেন—হঠাৎ আমার প্রতি আপনার মমত্ববোধের হেতুটা কি?

—খুব সহজ। আমি আমার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

—ধর্ম, না অধর্ম?

—যাই হোক। সেটা বাস্তব। তাছাড়া আপনি সিংহাসনে আরোহণ করলে আমার ধারণা মগধ আরও ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে।

—কেমন করে?

—আপনার পিতার উদ্যম বয়সের ভারে প্রায় নিঃশেষিত।

অজাতশত্রু বলেন—আমি শুনেছি, তিনি সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আমাকে নির্বাচিত করেছেন তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে।

—সিংহাসনে আরোহণ অত নিশ্চিন্তে হয় না।

—দেখা যাক।

দেবদত্ত বুঝতে পারলেন, পিতার ওপর অজাতশত্রুর অগাধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে ভাঙন ধরাতে হবে। খুব দুঃসাধ্য হবে না সেই কাজ। কারণ চম্পা ও রাজগৃহের দূরত্ব অনেক। অজাতশত্রু রাজগৃহে থাকলে যা অসাধ্য হত, এখানে তা হবে না। কারণ যুবরাজ অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা মিশ্রিত করে দেবদত্ত অজাতশত্রুর মুখের দিকে চাইলেন। তারপর বিমর্ষ কণ্ঠে বলেন—ওখানে রীতিমত ষড়যন্ত্র চলছে। আর প্রাসাদই

হয়েছে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল।

—তাই নাকি! এই সংবাদ কোথায় পেলেন? প্রাসাদে যাতায়াত আছে?

—না। কিন্তু আপনার হিতৈষীর একবারে অভাব এখনো ঘটেনি সেখানে। আপনি নিশ্চয় রাজমাতা বিম্বির মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছেন।

—সে তো অনেকদিন হল। না পাবার কথা নয়। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

—তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত।

দেবদত্ত তির্যক দৃষ্টিতে অজাতশত্রুর দিকে চেয়ে বুঝতে পারেন সন্দেহের ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর মনে।

তিনি আর একটু কল্পনা যোগ করে দিয়ে বলেন—আপনি হয়ত জানেন না পাঁচ বৎসর পূর্বে আপনার বিবাহের আনন্দোৎসবের মধ্যে এক কুচক্রী আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

এবারে অজাতশত্রুর চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। তিনি দেবদত্তের প্রতি সন্দিহান হন। বলেন—আপনি একটু বেশী বলছেন। আপনি না ভিক্ষু—অহিংসার সেবক!

—কে বলল আমি ভিক্ষু? আমি অহিংসায় বিশ্বাসী নই। তবে আমাকে বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি।

অজাতশত্রুকে বশে আনতে দেবদত্তের মাত্র তিনদিন সময় লাগল। এবার থেকে তিনি দেবদত্তের দৃষ্টিতে মগধের যাবতীয় সবকিছু দেখতে শুরু করলেন। শেষে দশদিনের মধ্যে সসৈন্যে রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন। ঠিক হল, সৈন্যরা রাজধানীর বহির্দেশে অবস্থান করবে। তারপর অজাতশত্রু প্রাসাদে গিয়ে সুযোগ মত নির্দেশ পাঠাবেন প্রাসাদ অবরোধ করতে। রাজধানীর বাহিনী স্বভাবতই অপ্রস্তুত থাকবে। কারণ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা মহারাজা, মহামন্ত্রী কিংবা সেনাপতি কেউই কল্পনা করতে পারবেন না। অজাতশত্রুর সৈন্যদল দেখেও তাঁদের মনে সন্দেহের উদয় হবে না। কারণ শাসনকর্তারূপে তিনি সৈন্য নিয়ে চলাফেরা করতে পারেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের আগমনবার্তা চরেরা যথাসময়ে এসে জানিয়ে গেল। বিম্বিসার খুব আনন্দিত হলেন। কারণ তিনি কদিনের মধ্যে চম্পা নগরীতে সংবাদ প্রেরণ করবেন ভাবছিলেন অজাতশত্রুকে রাজধানীতে আসার জন্য। রাণীদের মধ্যে বাসবী খুবই পুলকিত হলেন। তিনি অজাতশত্রুর গর্ভধারিণী। কিন্তু অন্যান্য

রাণীদের মধ্যে যে একই রকম প্রতিক্রিয়া হল একথা বলা যাবে না। রাজকুমার অভয় ও তাঁর মাতার মনে সংশয়। লিচ্ছবিদের তিনি বিষদৃষ্টিতে দেখেন। অজাতশত্রু পৌছলে এবারে তার রাজ্যাভিষেক হবার কথা। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনে সে অনেক পূর্বেই চম্পা নগরী ছেড়ে চলে এসেছে মনে হচ্ছে। তাই সৈন্য নিয়ে আসছে। কোশলদেবীর মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলেও, তিনি খুব স্বস্তি পেলেন না। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অন্যান্যদের শ্রদ্ধাবোধ বিশেষ নেই। বরং অজাতশত্রু এখানে অনুপস্থিত থাকলে, তাঁরা মিলেমিশে নিশ্চিন্ত থাকেন। তবু অজাতশত্রুকে অভ্যর্থনা জানাবেন সবাই। কারণ কিছুদিনের মধ্যে তিনি হবেন মগধের নতুন অধীশ্বর। তাই প্রাসাদের পশ্চাতে আরও আবাসগৃহ নির্মিত হচ্ছে। সেখানে স্থান হবে অনেক রাজমাতার, এখনো যাঁরা রাজরাণী।

অজাতশত্রু প্রাসাদে পৌছে পিতা ও মাতাদের চরণে প্রণতি জানান। কুশলবার্তা বিনিময়ের পরে নৃপতি বিম্বিসার প্রশ্ন করেন—অত সৈন্য এনেছ কেন ?

—এমনি।

—ভাল। এসেছ যখন আর ফিরে যেও না। তোমাকে বার্তা পাঠাতাম। তোমায় রাজ্যাভিষেকের দিন স্থির হয়েছে।

কোশলদেবী লক্ষ্য করেন, অজাতশত্রুর মন একটু চঞ্চল একটু বিক্ষিপ্ত। তিনি একবার ভাবেন, এর কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। শেষে নীরব থাকা শ্রেয় মনে করেন। তিনি শুনেছেন অজাতশত্রুর সঙ্গে দেবদত্তকে দেখা গিয়েছে। মোগ্গাল্লান আহত হবার পর থেকে তাঁকে আর রাজগৃহে দেখা যায়নি। তবে তাঁর মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে কেউ সন্দেহ করে না। কোশলদেবী শুনেছেন দেবদত্তকে বুদ্ধদেবের পার্শ্বচর ও পরম ভক্ত আনন্দ বিশেষ পছন্দ করেন না। আরও অনেকেই করেন না। শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন। মহারাজ সহাস্যে বলেছিলেন, দেবদত্ত বুদ্ধদেবের আত্মীয় বলে আনন্দের মনে সূক্ষ্ম অভিমান থাকতে পারে। ভগবান তথাগতের ওপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকারে দেবদত্ত যেন বাধা দিচ্ছেন।

অজাতশত্রুর আগমনের তৃতীয় দিবসের সায়াহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে। বহুদিন ধরে গ্রীষ্মের দাবদাহ সহ্য করার পরে আজই প্রথম বৃষ্টিপাত রাজগৃহ তথা

মগধের অনেক অঞ্চলে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত নেমে এসেছে। নগরবাসীরা অন্য দিনের চেয়ে পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। আবহাওয়া শীতল ও সুখপ্রদ।

প্রাসাদে অনেকক্ষণ আলো জ্বলেছে। মহারাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর কিছুটা পথ অতিক্রম করেছেন, সহসা স্বল্পালোকিত এক স্থানে একজন স্ত্রীলোক সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। উত্তরীয় দ্বারা অবগুণ্ঠনাবৃত এই রমণী। স্পষ্ট বোঝা যায় সে মহারাজের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু এভাবে তাঁর পথ রুদ্ধ করার স্পর্ধা পেল কোথায়? প্রাসাদে থাকে নিশ্চয়। নইলে এখানে বাইরের কেউ আসতে পারে না। কোন পরিচারিকা?

—কে? পথ ছাড়।

রমণী অচঞ্চল। সে ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন অনাবৃত করে। বলে—আমাকে চিনতে পারেন মহারাজ!

অস্পষ্ট আলোয় মহারাজ তাকে চিনতে পারেন না। কোন রাণী নয়। স্ত্রীলোকটি দুঃসাহসিনীর মত দু পা অগ্রসর হয়ে বলে—এবারে দেখুন তো ভাল করে?

মহারাজা তবু চিনতে পারেন না। তবে তার কথার ভঙ্গিতে পরিচিতের ভাব লক্ষ্য করেন। তাই ক্রোধের পরিবর্তে বিস্ময় জাগে মনে। তবু সত্যিই চিনতে পারেন না।

রমণী ম্লান হেসে বলে—পারলেন না। কি করে পারবেন। কবেকার কথা। তাছাড়া এখন আমি প্রৌঢ়া। যাহোক ওসব কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না মহারাজা। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিণী এটুকু জেনে রাখুন। দীর্ঘদিন প্রাসাদে থাকার ফলে আমার কিছু অনুগত নারী ও পুরুষ রয়েছে। তাদের একজন একটি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ এনেছে। তাই এভাবে আপনার পথের ওপর দাঁড়িয়েছি। নইলে এ জীবনে আপনাকে আমার মুখ দেখাতাম না।

—কে তুমি?

—সেকথা পরে। শুনুন মহারাজ আপনার ক্রোধ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে। আমার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মাতে পারে। তবু বলছি অজাতশত্রু দেবদত্তের সহায়তায় আপনাকে বধ করার ষড়যন্ত্র করেছে। আপনি সাবধান হন। সম্ভব হয় তো সত্বর অন্য প্রাসাদে গিয়ে বাস করুন। সেনাপতিকে বলুন প্রাসাদ রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করতে।

বিম্বিসার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ভূমিতে পদাঘাত করে বলে ওঠেন—আজ

যদি তুমি নারী না হতে এই মুহূর্তে তোমার ছিন্নমুণ্ড ভূতলে লুণ্ঠিত হত।

—নারী বলে বিশেষ সম্মান কোনদিন পাইনি, আজও প্রত্যাশী নই। আমাকে স্বচ্ছন্দে হত্যা করতে পারেন।

—কে তুমি?

—আপনি এই মুহূর্তে নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন মহারাজা। সত্যই এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হবে আপনার।

মহারাজা ধৈর্যধারণ করতে না পেরে অপরিচিতার কাঁধ দুটি চেপে ধরে সজোরে ঝাঁকিয়ে বলেন—কে তুমি?

—ছাড়ুন মহারাজ। অনেক হয়েছে। আমি উদাম্বরীকা।

মহারাজের হাত দু কাঁধ থেকে স্খলিত হয়। উদাম্বরীকা ছুটে মিলিয়ে গেল। আর মহারাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্তঃপুরে প্রবেশের পথের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে তিনি অবনত মস্তকে ধীর পায়ে গিয়ে প্রবেশ করেন কোশলদেবীর কক্ষে।

কোশলদেবী মহারাজের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছে মহারাজ? পুত্রের রাজ্যাভিষেকের জন্য আপনাকে কদিন ধরে এত আনন্দিত দেখলাম কিন্তু আজ এমন গম্ভীর কেন? সব আনন্দ কোথায় অন্তর্হিত হল? কোন দুঃসংবাদ?

—রাণী, উদাম্বরীকার কথা মনে পড়ে? সেই যে, তুমি মগধের অধীশ্বর হবার আগে যে নারী আমার জীবনে এসেছিল?

—মনে থাকবে না কেন মহারাজ? তিনি যে এই প্রাসাদেই থাকেন। রাজমাতা বিম্বির জীবনের শেষ কদিন তিনি ছিলেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। তাঁকে সেবা করতেন। আপনিও দেখেছেন। অবগুণ্ঠিতা থাকতেন বলে চিনতে পারেননি তাঁকে।

—আশ্চর্য। কিন্তু কেন? সে তো আমার কাছ থেকে কোন মর্যাদা পায়নি।

—তবু হয়ত কোন অসতর্ক মুহূর্তে তিনি আপনাকে তাঁর হৃদয়ের সর্বেশ্বর করে ফেলেছিলেন!

—আমি কিন্তু তাতে একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম।

মহারাজা তখন কোশলদেবীকে উদাম্বরীকার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং তারপর যা যা ঘটেছিল আনুপূর্বিক সব বললেন।

শুনেই কোশলদেবী অস্থির হয়ে ওঠেন। এত অস্থির তাঁকে জীবনে হতে দেখেননি মহারাজ।

—তুমি এমন করছ কেন রাণী। এসব কথা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

—সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মহারাজ। অজাতশত্রুর কয়েকটি আচরণ আমার কাছেও অদ্ভুত লেগেছিল। আপনি এই মুহূর্তে সেনাপতিকে ডেকে প্রাসাদ সুরক্ষার ব্যবস্থা নিন। আর সম্ভব হলে আপনি দু-একদিনের জন্য আত্মগোপন করুন।

বিম্বিসার মস্তক উন্নত করে দাঁড়িয়ে বলেন—একথা তুমি আমাকে বলতে পারলে ? আমি মহারাজা বিম্বিসার, পুত্রের ভয়ে ভীত হয়ে আত্মগোপন করব ?

—এটা ভয় নয় মহারাজ, এ হল কৌশল। প্রাণরক্ষা করার জন্য কৌশল। আপনি জয়ী হন, তারপর পুত্রকে ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনি পরাস্ত হবেন না। কারণ পরাস্ত হলে আপনার প্রাণ সংশয়।

—তুমিও।

—হ্যাঁ আমিও। দাঁড়িয়ে থাকবেন না মহারাজ।

মহারাজা সহস যেন স্থবির হয়ে গেলেন। প্রিয়তম পুত্র সত্যিই কি তাঁকে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করতে চায় ? কিন্তু কেন ? তিনি তো স্বেচ্ছায় তাকে সিংহাসন অর্পণ করছেন। একি বিশ্বাসযোগ্য কথা ? ভগবান তথাগতের ভ্রাতাকে এর মধ্যে জড়িত করা হচ্ছে ! এ যদি সত্য হয়, তবে তাঁর মৃত্যু শ্রেয়।

কোশলদেবী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন—মহারাজ !

মহারাজা স্থির নিশ্চল। যেন পাষাণপ্রতিমা।

অনেকক্ষণ পরে প্রাসাদের অলিন্দে কোলাহল শোনা গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে কোষমুক্ত অসিহস্তে স্বয়ং অজাতশত্রু প্রবেশ করল রাণী কোশলদেবীর প্রকোষ্ঠে।

মহারাজকে স্থাণুর মত দণ্ডায়মান দেখে তিনি বলে ওঠেন—এই যে এখানে। ঠিক অনুমান করেছিলাম।

অজাতশত্রুর চোখে মুখে হিংস্রতা। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। মনে হল কেউ যেন তাঁকে সম্মোহিত করেছে, তারই প্রভাবে ছুটে এসেছেন উনি পিতৃ-হত্যার জন্য।

কোশলদেবী তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠেন—অজাতশত্রু তুমি পিতৃরক্তে অসি রক্তাক্ত করতে এসেছ ? একথা বিশ্বাস করতে হবে।

—হ্যাঁ।

কোশলদেবী ততক্ষণে তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়ান। বলেন—তোমাকে আমি চিনি অজাতশত্রু। তোমাকে কেউ মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। নইলে এ কাজ তুমি

কখনো করতে পার না। সিংহাসন তোমাকে অর্পণ করার জন্য মহারাজ সব আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন। মনে তাঁর সেজন্য কত আনন্দ।

—সব অসত্য। আমি জানি, যে কোন মুহূর্তে মহারাজের মতের পরিবর্তন হতে পারে। পথ ছাড়ুন। বাইরে আমার সৈন্যদল প্রাসাদ অবরোধ করে রেখেছে।

—তোমাকে কোন দুরাত্মা প্রতারিত করেছে। তাই তোমার বিবেক আজ লুপ্ত। আজ যদি তুমি সত্যই মহারাজকে বধ কর তাহলে জীবনে তুমি শান্তি পাবে না। অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে তোমারও অপমৃত্যু ঘটবে। এই পাপকার্য একবার সংঘটিত হলে থেমে যায় না।

—সরে দাঁড়ান। বিবেকের কথা শোনাবেন না।

—তোমাকে আমি চিনি অজাতশত্রু। তোমার গুণের অবধি নেই। দোষও তোমার রয়েছে। কিন্তু এতটা নীচ তুমি হতে পার না। তোমার শুভবুদ্ধি সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়েছে।

অজাতশত্রু মহারাজের দিকে অগ্রসর হতে কোশলদেবী তাঁর হাত চেপে ধরেন। বলেন—তুমি তোমার জননীর অনুমতি নিয়েছ? অনুমতি নিয়ে এস। আমি মহারাজকে এখানে রাখছি। তোমার মা যদি অনুমতি দেন আমি তোমার পথের বাধা হব না।

—আমি তাঁর কাছে যাব না। অনুমতিও নেব না। এ সিদ্ধান্ত আমার নিজের।

—তাহলে তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা রয়েছে। হ্যাঁ, প্রার্থনা। আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিনি। কিন্তু তোমাকে নিজের পুত্রের মত স্নেহ করেছি। এক মুহূর্তের জন্যও তোমার কোন অমঙ্গল চিন্তা করিনি। আমার প্রার্থনা তুমি মহারাজকে বধ কর না। অন্যভাবে তাঁকে সরিয়ে রাখ, যাতে নিশ্চিন্তে রাজকার্য চালাতে পার।

—অসম্ভব। মহারাজের অস্তিত্ব যে কোন মুহূর্তে আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। সরে দাঁড়ান।

অজাতশত্রু ছুটে যেতে চান। রাণী কোশলদেবী তাঁর পায়ের ওপর পড়েন।

অজাতশত্রু থমকে যান। তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ান। আর তখনি তাঁর দৃষ্টি পড়ে পাথরের মত নিস্পন্দ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা নৃপতি বিম্বিসারের কটিদেশ থেকে দোদুল্যমান ভূমিচুম্বনোন্মুখ দীর্ঘ তরবারির দিকে। তিনি নিরস্ত্র নন। তাহলে তিনি নিশ্চেষ্ট কেন? অসি যুদ্ধে তাঁর সমতুল্য তো

কেউ নেই ভূ-ভারতে ? তবে ? দেখে মনে হচ্ছে, উনি ভিন্ন জগৎ থেকে পুত্রের ক্রিয়াকলাপ দেখছেন, উপভোগ করছেন। তবে মুখমণ্ডলে দুঃখ বা আনন্দ কোন কিছুর চিহ্ন নেই।

—বেশ, মহারাজকে আমি বধ করব না। তবে তাঁকে প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হবে না।

—তোমার শুভ হোক।

সমগ্র মগধরাজ্য স্তম্ভিত। রাজগৃহের নাগরিকবৃন্দ সচকিত। অজাতশত্রু তাদের নতুন রাজা। এ কেমন রাজা ? রাজ্যাভিষেক হল না। পুত্র হয়ে পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন ? মনে তাদের অসন্তুষ্টি ! তবে প্রজাদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ শীঘ্র হয় না কখনো। যুগ যুগ ধরে জমে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়। ভ্রাতারা অজাতশত্রুর দাপটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ম্রিয়মান। তাঁরা পিতার স্নেহছায়ায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্থ। এমন যে ঘটতে পারে কল্পনার বাইরে ছিল তাঁদের। এখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভিরুচি অনুযায়ী তাঁদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে বুঝতে পারেন। তবে প্রাণসংশয় রয়েছে বলে মনে হয় না। অজাতশত্রু উত্তমরূপে জানেন প্রতিটি রাজপুত্রের পশ্চাতে রয়েছে তাঁদের মাতুলালয়ের শক্তি ও সমর্থন।

একদিনের ব্যবধানে সকল রাজমহিষী এখন রাজমাতায় রূপান্তরিত। রাজমহিষী এখন শুধু অজাতশত্রুর ভার্যা। তবু রাজমাতারা প্রাসাদেই রইলেন আপাতত।

কোশলদেবী বিম্বিসারের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। তিনি বীর ছিলেন, যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু এখন প্রতিদিনের খাদ্যগ্রহণের বেলায় সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল ছিলেন। তাঁর মাতা বিম্বি একথা বিবাহের পরদিনই কোশলদেবীকে বলে দিয়েছিলেন। তাই প্রাসাদে কোশলদেবী নিজে সব সময় না পারলেও একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকার ওপর মহারাজের আহারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু এখন কে দেখবে তাঁর স্বামীকে ? সেই পরিচারিকাকে একদিন পাঠিয়েছিলেন কারাগারে। সে ফিরে এসে বলে, ভেতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। সেখানকার সংবাদ জানার কোন উপায় নেই। হতাশ হন কোশলদেবী।

তারপর একদিন উদাম্বরীকার কথা মনে পড়ে তাঁর। সে-ই প্রথম মহারাজকে বিপদের সঙ্কেত দিয়েছিল। যে কারণেই হোক মহারাজের হিতৈষী সে। তার

সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়।

কোশলদেবী সেইদিনই উদাম্বরীকার কক্ষে যান। বিস্মিত হয় উদাম্বরীকা। তারপর ভাবে, এখন কোশলদেবী আর রাজমহিষী নন। তবু তাঁর আগমন অস্বাভাবিক।

—আপনি নিজে এলেন? আমাকে ডেকে পাঠালে এই কষ্ট করতে হত না।

—কষ্ট আমার দেহে নয়, মনে। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। মহারাজকে কেমন করে রক্ষা করা যায়?

—কারাগার থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।

—না, মুক্ত করতে চাই না। আমি শুধু তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তিনি যাতে প্রতিদিন খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন।

—কেন, তাঁকে অনাহারে রাখা হচ্ছে?

—না। তাকে যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে ওঁর পক্ষে মুখে তোলা সম্ভব নয়।

উদাম্বরীকাদেবী ভেবে বলে—আমাকে কদিন সময় দিন। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

দুদিন পরে উদাম্বরীকা জানাল, কারাগারের একজনকে সে বশীভূত করেছে। কারাগারের নিকটবর্তী পিপুল বৃক্ষের নীচে সে প্রতিদিন অপেক্ষা করবে। তার কাছে মহারাজের আহার্য পৌঁছে দিতে হবে।

উদাম্বরীকাকে এই প্রথম কোশলদেবী আলিঙ্গন করে বলেন—আপনি এত বুদ্ধিমতী।

—কে বলে আমি বুদ্ধিমতী? মহারাজের মন জয় করতে তো পারলাম না। অথচ তখন আপনারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আসেননি।

—আমিও সেকথা ভেবেছি।

—প্রকৃত কারণ হল, তখনো মহারাজকে আমি ভালবাসিনি। আমার নিজের স্বার্থই ছিল প্রধান। কোনরকমে মহারাণী হওয়া ছিল আমার মূল লক্ষ্য। তাই পরাজিত হলাম।

দেবদত্ত ক্রমাগত অজাতশত্রুকে প্ররোচিত করতে থাকেন বিম্বিসারকে বধ করার জন্য। বলেন, তাঁর কাছে যোগ্য ব্যক্তি আছে, যে এবিষয়ে পারদর্শী। বিম্বিসারকে বধ করতে না পারলে যেন দেবদত্তের শান্তি নেই। বুদ্ধদেবকে হত্যা করতে না পারার নিষ্ফলতা বিম্বিসারের রক্তে ঢাকতে চান তিনি। অবশেষে

দেবদত্তের পরামর্শে অজাতশত্রু তাঁকে গুপ্তঘাতক ঠিক করতে বলেন। কারণ তিনি জেনেছেন পিতাকে অর্ধাহারে রাখা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্যের তেমন অবনতি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলতে শুরু করেছে বিম্বিসারের ওপর ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ রয়েছে, তাই এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছে।

দেবদত্ত তাঁর কর্ণে ক্রমাগত বিষমন্ত্র দেবার ফলে বুদ্ধদেবের ওপর অজাতশত্রু ততটা সন্তুষ্ট নন যতটা আগে ছিলেন। কিন্তু তাঁরই কৃপায় পিতা কারাগারে আবদ্ধ থেকেও সুস্থ আছেন একথা জেনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাই গুপ্তঘাতকের সঙ্গে দেবদত্ত চূড়ান্ত কথা বলে নিলেন। কিন্তু কোশলদেবী কেমন করে যেন স্বামীকে হত্যার এই পরিকল্পনা জেনে ফেলেন। তিনি ছুটতে ছুটতে এসে অজাতশত্রুর হাত ধরে বলেন—পুত্র, তোমার কাছে আমার একটি বিশেষ প্রার্থনা আছে। সেটা পূর্ণ কর।

অপ্রস্তুত অজাতশত্রু বলেন—আমার কাছে প্রার্থনা? কী সেই প্রার্থনা?

—আগে একদিন বলেছিলাম, আজ আবার বলছি পিতৃশোণিতে তোমার অসি রঞ্জিত কর না।

অজাতশত্রু ভাবেন, কে সেই বিশ্বাসঘাতক যে কোশলদেবীর কাছে সব প্রকাশ করে দিয়েছে? একথা দেবদত্ত ব্যতীত কারও জানার কথা নয়।

—আপনি একথা বলছেন কেন মা?

কোশলদেবী বলতে পারেন না, যাকে ঘাতকরূপে নির্বাচিত করা হয়েছে, সে অতি দুর্জন হলেও, তার পিতা কোশলদেশ থেকে এখানে এসেছিল এবং তার পরিবার কোশলদেবীর প্রতি অনুগত। তিনি মিথ্যা বলেন না কখনো। নইলে বলতে পারতেন স্বপ্নে দেখেছেন।

তিনি বলেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন কিছু ঘটতে চলেছে। প্রাসাদ অতি কদর্য স্থান। এখানে মাতৃস্নেহ, পতিভক্তি, মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ—এ সবের কোন স্থান নেই। তাই ভাবলাম, তোমায় কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে রাখি। এক সময় তুমি আমার কাছে কত যেতে, কত পরামর্শ নিতে। মনে হল, হয়ত আমার কথা রাখবে।

অজাতশত্রু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—বেশ, তাঁকে ওভাবে হত্যা করা হবে না।

কেশলদেবী নিশ্চিন্ত হন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হবে, যে লোকটি বিম্বিসারকে খাদ্য সরবরাহ করত সে ধরা পড়ে গেল। ভূতপূর্ব নৃপতির স্বাস্থ্যের কোন অবনতির লক্ষণ না দেখায় গুপ্ত-

রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। ক্রোধোন্মত্ত অজাতশত্রুর কঠোর নির্দেশে সেইদিনই তার মৃত্যুদণ্ড হল। তবে সে মৃত্যুর পূর্বে শত অত্যাচারেও আর কারও নাম বলল না। কারণ নৃপতি বিম্বিসারের প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা।

এবারে বিম্বিসারের খাদ্যের অনটন শুরু হল। প্রথম কয়েকদিন তিনি বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, কোন ভুল হয়েছে। আহারে রুচি রইল না। তারপর বুঝলেন, যতদিন জীবিত আছেন এই আহার তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং এ না খেলে ক্ষুধার জ্বালা আরও অধিক সহ্য করতে হবে। তিনি খাওয়া শুরু করলেন। পুত্র তাঁকে বাঁচতে দিতে চায় না। তিনি দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। এই দুর্বল শরীরে আচ্ছন্নতার মধ্যে কত সব সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে চলেন তিনি। তিনি যেন যুবক। কোশলদেবী সপ্রেম দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছেন। কখনো দেখেন ভগবান তথাগত স্মিত হেসে হাত তুলে তাঁকে অভয় দান করছেন। কখনো শিশু অজাতশত্রু সামনে এসে আধোস্বরে তাঁর তরবারি চাইছে। এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর আচ্ছন্নতা কেটে যায়। দেখতে পান, কে যেন তাঁর দ্বারের পাশে জলপূর্ণ একটি পাত্র রেখে গেল।

কোশলদেবীর অন্তরের জ্বালা ক্রমবর্ধমান হলেও বিম্বিসারের অন্যান্য পত্নীরা স্বামীর এই ভাগ্যবিড়ম্বনাকে বিধাতা কর্তৃক নির্ধারিত ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা পেলেন। তাঁরা ভেবে নিলেন, সিংহাসনকে কেন্দ্র করে, এই ধরনের বিপর্যয় হতেই পারে। তাই তাঁদের মন থেকে প্রথম যৌবনের সেই পুরুষ সিংহের মুখচ্ছবি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকল। তাঁরা বর্তমানের উপভোগ্য ঘটনা ও সামগ্রীর মধ্যে আনন্দের অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং খুঁজে পেলেনও।

অজাতশত্রুর মহিষী সন্তানসম্ভবা হলেন। প্রাসাদে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। মহারাজা ভাবলেন, পুত্র না হয়ে যদি কন্যা হয়? হোক, ক্ষতি কি? সন্তান তো। রাজপুত্র কিংবা রাজকন্যা—দুইই সমান স্নেহের। মনের আনন্দে বহুদিন পূর্বের হারিয়ে যাওয়া রঙিন দৃষ্টি তিনি ফিরে পেলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, রাজগৃহ এখনো পূর্বের মত মনোরম। তার বৃক্ষরাজি এখনো পুষ্পশোভিতা, ফলাবনত। সেখানে এখনো কোকিল ডাকে, ময়ূর এখনো প্রাসাদের আঙিনায় উড়ে এসে নৃত্য করে। কোথায় ছিল এরা? সিংহাসন আর রাজ্যের কথা চিন্তা করতে করতে সব ধূসর হয়ে গিয়েছিল।

দিন বয়ে যায়।

একদিন অতি প্রত্যুষে অজাতশত্রুর মন্ত্রী দুটি সংবাদ একসঙ্গে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি মন্ত্রী। তাই সংবাদ দুটি মহারাজের গোচরে আনতে হবে তাঁকেই। এটা নিয়ম। দ্বিধায় পড়েন তিনি। তাছাড়া রয়েছে ভাবাবেগ। কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসে। কিন্তু ভাবাবেগকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। নিজেকে শক্ত করেন। দুটি সংবাদ যেন দুই ভিন্ন মেরুর। একটি অশ্রুপাত ঘটায়। অপরটি আপাতদৃষ্টিতে অতি সুখের। কিন্তু অশ্রুসিক্ত বদনে তা হাসি ফোটাতে পারে না। যাহোক মহারাজকে অবিলম্বে জানাতে হবে। মন্ত্রী হয়ে এটি তাঁর কর্তব্য। মহারাজ এই সময় নিদ্রিত। তবু তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করতে হবে। মন্ত্রী প্রাসাদে প্রবেশ করেন। ভাবেন আগে শুভ সংবাদ দেওয়া বিধেয়। কারণ অন্য সংবাদটি অন্যের নিকট মর্মান্তিক হলেও মহারাজ নিশ্চয় তেমন বিচলিত হবেন না। না হওয়া স্বাভাবিক। হয়ত মনে মনে আনন্দিত হবেন।

অজাতশত্রুর নিদ্রাভঙ্গ করা হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মন্ত্রীবর তাঁর সাক্ষ্যাৎপ্রার্থী জেনে তিনি আশ্চর্য হন। মন্ত্রীকে ডেকে পাঠান।

—কি সংবাদ? এই সময়ে?

—খুবই সুসংবাদ মহারাজ। কয়েক দণ্ড পূর্বে আপনি একটি সুস্থ সবল রূপবান পুত্রের জনক হয়েছেন।

অজাতশত্রুর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বলেন—মন্ত্রী সত্যি? আপনাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাব আমি বুঝে উঠতে পারছি না। পুত্রের পিতা হওয়ায় এত সুখ? এত আনন্দ? এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ওঃ এই সংবাদ যে চেপে রাখা যায় না। একা উপভোগেও তৃপ্তি নেই। সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলে অশেষ আনন্দ। তাই না মন্ত্রী।

—হ্যাঁ, মহারাজ। পুত্রের চেয়ে প্রিয়তম পৃথিবীতে আর কি কিছু আছে? নেই। তার মাধ্যমে আপনি মৃত্যুর পরও জীবিত থাকবেন। তার মাধ্যমে আপনি আপনার জীবনের যাবতীয় ব্যর্থতাকে সাফল্যের রূপ দিতে চাইবেন। এ এক স্বর্গীয় সুখ।

—আপনি যথার্থ বলেছেন মন্ত্রী। কিন্তু শুধু তাই নয়। আরও আরও অনেক কিছু। আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না এই মুহূর্তে। আচ্ছা আমার জন্ম হলে আমার পিতাও নিশ্চয় আনন্দে ঠিক এমনি ভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। তাই না? মন্ত্রীবর, এই মুহূর্তে কারারক্ষীকে সংবাদ প্রেরণ করুন আমার পিতাকে যেন এখনি মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাঁকে যেন প্রাসাদে নিয়ে আসা হয় সসম্মানে।

মন্ত্রী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন—তার আর প্রয়োজন হবে না।

—কেন? প্রয়োজন হবে না কেন? এ কথার অর্থ কি?

—আপনার পুত্রের জন্মের কয়েক মুহূর্ত পূর্বে আপনার পিতার অসহনীয় দুঃখের অবসান হয়েছে। তিনি ইহজগত ছেড়ে শান্তি পেয়েছেন।

মন্ত্রীর সম্মুখে অজাতশত্রু শিশুর মত কেঁদে ওঠেন। পুত্রলাভের আনন্দ এক নিমিষে অন্তর্হিত হল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের মাতা কোশলদেবীর নিকট ছুটে যান। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর নিজের গর্ভধারিনী ততটা ন'ন, যতটা কোশলদেবী তাঁর পিতাকে ভালোবাসতেন।

কোশলদেবী পিতৃহন্তার মুখে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ অত্যন্ত স্থির ভাবে গ্রহণ করেন। যখনি মহারাজের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল তখনি তিনি জানতেন এই সংবাদ কিছুদিনের মধ্যে শুনতে হবে। সহ্য করতে হবে। স্বামীর কষ্টের কথা ভেবে, তাঁর মৃত্যুও কামনা করেছেন কত সময়।

অজাতশত্রু প্রশ্ন করেন—মা, পিতার আমার প্রতি স্নেহ ছিল?

নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত কোশলদেবী বলেন—স্নেহ তাঁর সব পুত্র কন্যার প্রতি ছিল। কিন্তু তোমার প্রতি যে স্নেহ তিনি পোষণ করতেন তার পরিমাপ ছিল না। তোমাকে তাঁর হৃদয়ের প্রায় সবটুকু দিয়ে বাকীটুকু তিনি অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

অজাতশত্রু আবার কেঁদে ওঠেন।

—অজাতশত্রু তোমাকে ঘিরে তাঁর যে কত কল্পনা ছিল তুমি ভাবতে পারবে না। তোমার জন্মের বহু পূর্ব থেকেই চম্পানগরীর শাসনভার তোমার ওপর বর্তে ছিল। কত আর বলব। এখন বলে আর কি হবে। তিনি নেই। চলে গিয়েছেন। শান্তি পেয়েছেন।

অজাতশত্রু কোশলদেবীর কক্ষ পরিত্যাগ করেন বিবেকের দংশনে জ্বলতে জ্বলতে। এই বিবেক কি একদিন সুপ্ত ছিল? সহসা তাঁর মনে পড়ে গেল দেবদত্তের কথা। ধীরে ধীরে সব কিছু স্পষ্ট হল। ঠিক করলেন, দেবদত্তকে আর রাজগৃহে রাখা চলবে না। বিতাড়িত করতে হবে তাকে মগধ রাজ্য থেকে।

রাতের অন্ধকারে দেবদত্ত রাজগৃহ পরিত্যাগ করলেন কিছু অনুগতকে নিয়ে। তারপরই একদিন কোশলদেবীর মৃত্যু হ'ল। স্বামীর মৃত্যুর পর উনি জীবন্মৃত হয়েছিলেন। এবারে আত্মা তাঁর দেহ পরিত্যাগ করল। শান্তি পেলেন তিনিও।

অজাতশত্রুর মনে কিন্তু বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। রাতের নিদ্রা তাঁর নিকট হয়ে উঠল বিভীষিকা। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে প্রতিবার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। সামান্য একটু তন্দ্রা এলেও ওই সমস্ত নারকীয় দৃশ্য দেখতে শুরু করেন। শেষে প্রতিদিন অপরাহ্নকাল সমগত হলেই সূর্যাস্তের ভয়ে তিনি ভীত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, এবারে আবার সেই ভয়ঙ্কর রজনীর সূত্রপাত হবে।

সেই সময় সংবাদ এল কোশলদেবীর বিবাহের সময় তাঁকে কাশী নামক যে বর্ধিষ্ণু গ্রামটি উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল তাঁর অঙ্গসজ্জা ইত্যাদির ব্যয়ের জন্য বর্তমান কোশলরাজ পসেন্দী কোশলদেবীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেটি পুনরায় দখল করে নিয়েছেন। তিনি স্থির করেছেন, কোন পিতৃহন্তাকে ওই গ্রামের রাজস্ব ভোগ করতে দেওয়া হবে না। এতদিনে অজাতশত্রু একটি কাজ পেয়ে যেন নিষ্কৃতি পেলেন। এই ব্যস্ততা তাঁকে কিছুদিন অন্তত বিভীষিকা থেকে রক্ষা করতে পারবে হয়ত। তিনি কাশী পুণরুদ্ধারের জন্য অভিযান চালালেন। কোশল-রাজও প্রস্তুত ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে অজাতশত্রু পরাজিত হলেন। সমগ্র ভারতভূমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হল যুদ্ধের এই ফলাফলে। শ্রেষ্ঠ সেনা-নায়ক নৃপতি বিম্বিসারের পুত্র যে এভাবে পরাজিত হবেন, কেউ কল্পনা করেনি। অপমানিত অজাতশত্রু ক্রুদ্ধ হলেন। নতুন ভাবে সৈন্য সমাবেশ করে আবার এসে কোশলরাজ্যকে আক্রমণ করলেন। এবারে কোশলরাজ সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। কারণ মগধের শক্তির তুলনায়, তাঁর শক্তি অতি নগন্য। উপায়ান্তর না দেখে পসেন্দী তাঁর কন্যা বজীরাকে অজাতশত্রুর হস্তে সমর্পণ করে কাশী গ্রামটি পুনরায় বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তাঁকে দান করলেন।

কিন্তু নতুন রাণী রাজাকে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারলেন না। রাজার নিদ্রা গাঢ় হয় না। তিনি চিৎকার করে ওঠেন। সেই চিৎকার নিশীথের রাজপ্রাসাদের স্তব্ধতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

উন্মাদের মত হয়ে ওঠেন মহারাজা। কী করে দুঃস্বপ্ন থেকে নিস্তার লাভ করা যায়? শেষে একদিন তাঁর আদেশে রাজগৃহ নগরীকে সজ্জিত করা হ'ল। রাতে প্রতিটি রাজপথ, প্রতিটি গৃহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হ'ল। নগরবাসীরা নানা উৎসব আনন্দে মেতে উঠল সেই রাতে। আর মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁর মন্ত্রী ও পাত্রমিত্রদের নিয়ে প্রাসাদশীর্ষে আরোহন করে সেই উৎসব দেখতে লাগলেন। রজনীর অনাবিল চন্দ্রালোকে তখন ধৌত হচ্ছিল চরাচর। অজাতশত্রুর হৃদয় স্পর্শ করল এই জ্যোৎস্নালোক। তাতে হৃদয়ে

অনুভূত হল, কোন ঋষি বা মহাপুরুষ হয়ত তাঁকে শান্তি দিতে পারেন। ফিরিয়ে দিতে পারেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া গাঢ় নিদ্রার প্রশান্তি।

ভিষক জীবক অধিকাংশ সময় মহারাজের কাছাকাছি থাকেন। কারণ মহারাজ ঠিক সুস্থ ন'ন। সেদিনও ভিষক তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি জানতেন, আজ এই উৎসবের মধ্যে রাত্রি জাগরণ কোন স্থায়ী ফল দিতে পারবে না।

মহারাজ ভিষককে প্রশ্ন করেন—জীবক, এমন কোন পুরুষ কি আছেন, যিনি আমার মনে শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবেন? নইলে আমি যে উন্মাদ হয়ে যাব।

জীবক শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলেন—অবশ্যই আছেন মহারাজ।

মহারাজ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন—আছেন? কোথায়? কে তিনি?

—মহারাজ শত সহস্র ব্যক্তি যাঁর নিকট আশ্রয় নিয়ে পরম শান্তি লাভ করেছে তিনি আপনার অতি নিকটে, আপনারই রাজত্বে অবস্থান করছেন। রাজকার্য এবং কিছু দুরাত্মা সম্ভবত আপনাকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

—কে তিনি জীবক?

—ভগবান তথাগত।

—বুদ্ধদেব?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—তিনি আমার পিতাকে দীক্ষিত করেছিলেন।

—হ্যাঁ। তাই নৃপতি বিম্বিসার তাঁর জীবনের শেষ কদিন অতি ক্লেশে অতিবাহিত করলেও, সেই ক্লেশ তাঁকে তেমন ভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি প্রবোধ পেয়েছিলেন। তাঁর ওই ধরণের মৃত্যুর মধ্যেও তিনি একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। মনে আছে, তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন—জান জীবক, আমরা নিজেদের কত বুদ্ধিমান ভাবি। তবু প্রকৃতপক্ষে আমরা অন্ধকারেই ঘুরে মরি। তাই আলোর সন্ধানে অমিতাভের কাছে ছুটে যাই।

—জীবক, কে বলল অনাহারের ক্লেশ তাঁকে ক্লিষ্ট করতে পারেনি? কে বলল একথা?

—মহারাজ, তাঁর দেহ কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু কারারক্ষীরা দেখেছে, তিনি সব সময় শান্ত সমাহিত ছিলেন। কখনো তিনি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেন নি। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হননি। আচ্ছন্ন অবস্থায় কী যেন দেখতে দেখতে তিনি পুলকিত হয়ে উঠতেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর মুখে

মৃদু হাসি লেগে ছিল।

অজাতশত্রু কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করেন। পরে বলেন—আমি পাপী। আমি এখনি তাঁর কাছে যাব। কোথায় তিনি?

—এখন তিনি আম্রলতিকা কুঞ্জে।

অনুশোচনায় দগ্ধ মহারাজা প্রভাতের সূর্যোদয়ের জন্য প্রতীক্ষা না করেই সেই প্রত্যূষে জীবক এবং অল্পসংখ্যক অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন আম্রলতিকাকুঞ্জের উদ্দেশ্যে। তখনো পক্ষীকুল জাগরিত হয়নি। তাদের শাবকেরা পক্ষপুটের অন্তরালে একটু চঞ্চল হয়ে সবেমাত্র ডাকতে শুরু করেছে। রাজগৃহের চতুর্দিকে কুজ্‌ঝটিকার পশ্চাতে অস্পষ্ট পঞ্চ-গিরি। পিতৃহন্তার অনুশোচনায় তাদের পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয় না। ইহলোকের শোকতাপ সুখদুঃখ সবকিছুর উর্ধে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত তারা। তাদের গাত্রবাহী নির্ঝরিনী, তাদের পদধৌতকারী স্রোতস্বিনী যুগ যুগ ধরে জীবজগৎকে শোনাতে চেষ্টা করেছে শান্তির বাণী আনন্দের গান। কেউ শোনে, কেউ শোনেনা। কেউ কেউ আবার শুনতে চায় না।

আজ অজাতশত্রু প্রকৃতির দিকে চেয়ে প্রথম উপলব্ধি করেন, এরা নিষ্প্রাণ নয়। এরা অনেক কিছু বলতে চায়, শোনাতে চায়। ভিষক জীবককে তিনি বলেন—জীবক মনে হয়, আমি শান্তি পাব। যতই আমি বুদ্ধদেবের নিকটবর্তী হচ্ছি ততই প্রকৃতির মর্মবাণী আমার প্রাণ স্পর্শ করতে চাইছে।

—আপনার অনুভূতি যথার্থ মহারাজা। রাজকার্য পরিচালনা করেও এই অনুভূতি জাগরূক রাখা সহজসাধ্য নয়। আপনি ভাগ্যবান।

অবশেষে অজাতশত্রু আম্রলতিকাকুঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হন। মহারাজাকে সহসা সেখানে উপস্থিত হতে দেখে কিছু ভিক্ষু আশ্চর্য হন।

আনন্দ, যিনি বুদ্ধদেবের সেবা করে, নিয়ত তাঁর সংস্পর্শে থেকে থেকে আত্মোন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছেন, তিনি কিন্তু বিস্মিত হলেন না। পরশমণির স্পর্শ পেয়ে লৌহ যেমন স্বর্ণে রূপান্তরিত হয় তিনিও তেমনি হয়েছেন। মহারাজকে দেখে তিনি বুদ্ধদেবকে তাঁর আগমনবার্ত্তা জানান।

মহারাজ বুদ্ধদেবের পদতলে আনত হন। বলেন—আমি তাপদগ্ধ, আমাকে শান্তি দিন।

বুদ্ধদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—শান্তি তুমি পাবে।

অজাতশত্রু বলেন—শ্রমণের জীবন যাপন করলে তার ফল কি হয় ভগবান?

বুদ্ধদেব তখন তাঁকে কঠোর তপোশ্চারণের গুণগুলি ব্যাখ্যা করে বলেন। তাঁর এই বাণী সামন্নফল সুত্তান্তে বিবৃত আছে।

আম্রলতিকাকুঞ্জ থেকে অজাতশত্রু যখন নিষ্ক্রান্ত হলেন তখন তিনি নবজীবন লাভ করেছেন।

রাজধাণী রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করে অজাতশত্রু তাঁর পিতার সময়ের একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী কর্মচারীকে তাঁর মন্ত্রী করলেন। নাম তাঁর ভাষ্যকার। এতদিন যিনি মন্ত্রীত্ব পদে ছিলেন তিনি বিম্বিসারের সময়ের বৃদ্ধ-মন্ত্রীর সহকারী ছিলেন। বিম্বিসারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধমন্ত্রী রাজধানী এবং পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করে পর্বতে চলে গিয়েছেন। সেখানে তিনি সন্ন্যাসজীবন-যাপন করেন।

নতুন মন্ত্রীকে অজাতশত্রু বলেন—শুনুন ভাষ্যকার, বহুদিন আমি সমস্ত আনন্দ-উৎসবের জগৎ থেকে নির্বাসিত ছিলাম। আমার ইচ্ছা রাজধানীতে কোন একটা উৎসব হোক। বেশ আডম্বরের সঙ্গে হোক।

ভাষ্যকার বলেন—মহারাজ, উৎসব অনেক আছে। আপনি বললে, তার একটাকে বিশেষভাবে পালন করা যেতে পারে। সামনে নক্ষত্রক্রীড়া রয়েছে। সাতদিনব্যাপী এই উৎসব পালিত হয়। এবারে আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা যেতে পারে।

—বেশ, তাই হোক। নক্ষত্রক্রীড়া উৎসব সত্যই আনন্দের।

ভাষ্যকার সারা মগধরাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন, এবারের নক্ষত্রক্রীড়া জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হবে। সমস্ত শ্রেষ্ঠীদের সেইভাবে নির্দেশ দেওয়া হল। কারণ অর্থব্যয় না করলে উৎসব জমে না।

ঘোষণা শুনে শ্রেষ্ঠীরা অর্থ নিয়ে এগিয়ে এল। রাজগৃহের ধনশ্রেষ্ঠীর পৌত্রদ্বয় কুলপন্থক ও মহাপন্থক ভাষ্যকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওদিকে এই উৎসবের সংবাদ বুদ্ধদেবকে জ্ঞাপন করা হলে, তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী কুমার কাশ্যপকে রাজগৃহে প্রেরণ করেন। মগধের বিভিন্ন প্রান্ত-দেশ থেকে নগরীতে জনসমাবেশ হবে। কুমারকাশ্যপ তাদের কাছে বুদ্ধদেবের বাণী প্রচার করবেন। তাঁর বাগ্মিতার প্রচণ্ড আকর্ষণ। নক্ষত্রক্রীড়া উৎসব যতদিন চলবে ততদিন বুদ্ধদেবের একনিষ্ঠ শিষ্য পিণ্ডলা ভরদ্বাজের গৃহে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করা হল। কারণ প্রতিদিন নগরীর বহির্দেশে অবস্থিত বেণুবন থেকে তাঁর পক্ষে নগরীতে আসা সম্ভব হবে না।

নক্ষত্রক্রীড়া উৎসবের সূচনায় শ্রেষ্ঠী শঙ্খ বিদেশ থেকে রাজগৃহে ফিরে এল।

কুবেরতুল্য তার ধনসম্পদ। উৎসবের আয়োজন তার মনঃপুত হল না। তথনি প্রাসাদে গিয়ে মহারাজকে অনুনয় করে, তাকে নিজের মনের মত করে নগরীকে সজ্জিত করার সুযোগ যেন দেন মহারাজ! মহারাজ আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। সেই দিনই শত শত ব্যক্তি কর্ম শুরু করে দিল। নগরবাসীরা শঙ্খের কাণ্ড দেখে হতবাক। দিবারাত্র তার লোকেরা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে রাজগৃহকে করে তুলল স্বপ্নপুরী সদৃশ। সকলে আনন্দে মেতে উঠল। প্রবীনেরা বলাবলি করে, সার্থক নক্ষত্রক্রীড়া। দেখেও সুখ। এত বয়স হল, এমন কথনো দেখার সুযোগ ঘটবে ভাবেনি তারা।

শুধু অজাতশত্রু বলে নয়, বুদ্ধদেবের নিকট যাঁরা যখন শান্তির আশায় আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গিয়েছে তাদের কেউ কথনো ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যায়নি—সে যত সামান্য ব্যক্তি হোক না কেন। রাজগৃহে অবস্থানকালে তিনি প্রব্রজ্যা সূত্র ব্যক্ত করেছিলেন। গৃধ্রকূট পর্বতে থাকার সময় তিনি মাঘ নামে এক ব্যক্তিকে ধর্মসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাঘসূত্র বিবৃত করেন। তারপর যখন তিনি ছিলেন বেণুবন-কলণ্ডকনিবপে তখন পরিব্রাজক সুভিয়কে যে বাণী শোনালেন তারই নাম সুভিয় সূত্র।

কিন্তু এসব হলো এ জন্মের কথা। এই রাজগৃহের সঙ্গে বুদ্ধদেবের শুধু এই জন্মের পরিচয় নয়। সম্পর্ক তাঁর জন্মজন্মান্তরের। তিনি তাঁর সেবক ও সঙ্গী আনন্দকে ডেকে একদিন বললেন, জান আনন্দ একবার আমি এই একই রাজগৃহে এক কদলীবনে বাস করেছিলাম। এই রাজগৃহেরই দস্যুসংকুল দুর্গম পর্বতেও একবার আমি দিন কাটিয়েছি। আর একবার আমি এই একই রাজগৃহের বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী কন্দরে বাস করেছি। একবার থেকেছি ওই তপোদর নিকটে। জান আনন্দ, আমি ওই বেণুবন, যেখানে কাঠবিড়ালীরা আপন মনে নির্ভয়ে খুঁটে খুঁটে খাদ্য খায় সেখানেও থেকেছি। আমি রাজগৃহের মদ্দকুক্ষীর মৃগবনে বাস করেছি। এবারও রাজগৃহ আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

কথা বলতে বলতে ভগবান তথাগত একবার একটু আনমনা হয়ে পড়লেন। আনন্দ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ডাকলেন—ভগবান!

বুদ্ধদেব ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন—আনন্দ, অজাতশত্রু আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। সে লোক পাঠাবে আমার কাছে।

আনন্দ বিষণ্ন হন একটু। বুঝতে পারেন অজাতশত্রু সম্ভবত রাজ্যবিস্তারে

মন দিয়েছেন। রাজ্যবিস্তারের অর্থ হল হিংসার আশ্রয়। কিন্তু বুদ্ধদেব এসব সম্বন্ধে নির্বিকার। তিনি যেন এক ধ্যানমগ্ন পাষাণ প্রতিমা। যুগ যুগ ধরে ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সেই ধ্যান ভঙ্গ হবার নয়। শুধু অজাতশত্রু কেন, পৃথিবীর কারও কিছু তাঁর অন্তরে ঝড় তুলতে পারে না। নৃপতি বিম্বিসারের মৃত্যুতেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র বিকার দেখা যায়নি। এসব নিয়েই পৃথিবী—দ্বেষ হিংসা অত্যাচার অবিচার সর্বই রয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম এটা। ব্যাঘ্রের ভক্ষ মৃগ, সর্প ভেক ধরে। মানুষের মধ্যেও রয়েছে স্বার্থ উচ্চাশা। তারই মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষের মনে পরিবর্তন আসবে। যদি প্রকৃতই তার আকাঙ্ক্ষা থাকে। পৃথিবীর কিছু মানুষও যদি এই ধর্মানুশাসন পালন করে তার প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। অন্ধকারের মধ্যে এটাই আলোকবর্তিকা। হতাশার মধ্যে এটাই আশা। মর্ত্যের ধূলায় এটাই স্বর্গীয় স্পর্শ।

পরদিনই বুদ্ধদেব গৃধ্রকূটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আনন্দ বিস্মিত হলেন। সারিপুত্তও অবাক হলেন। অন্যান্য ভিক্ষু ভিক্ষুনীরা ভাবলেন, এভাবে কেন সহসা আম্রলতিকাকুঞ্জ ছেড়ে চললেন ভগবান। তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না। তাঁকে শুধু অনুসরণ করাই সকলের ব্রত—তাঁর উপদেশ অনুসরণ করা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

গৃধ্রকূটের পথে চলতে চলতে একসময় বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করেন তাঁর প্রিয় শিষ্যবর্গকে—অজাতশত্রু ক'বছর রাজত্ব করছে?

একজন ভিক্ষু বলেন—এটা চতুর্থ বর্ষ চলছে।

ভগবান আপন মনে বলেন—চতুর্থ বর্ষ। আরও চার বৎসর অবশিষ্ট রয়েছে।

কেন একথা বললেন তিনি? সবার মনে একই প্রশ্ন। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের দৃষ্টিবিনিময় হয়। কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করে না। নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ রয়েছে। নইলে একথা বলবেন কেন? অকারণে কোন কথা তিনি বলেন না কখনো। তবে কি চার বৎসর অতীত হলে অজাতশত্রুর রাজত্বকাল শেষ হবে? হতে পারে। পিতৃহন্তা বলে প্রজাদের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ রয়েছে। হতে পারে।

বুদ্ধদেব যেখানে অবস্থান করেন সেখানে এক স্বতন্ত্র সুষমা বিরাজ করে। প্রকৃতিদেবী তার হৃদয় নিংড়ে সবটুকু সেখানে উজাড় করে দেয়। কারও অজানা নয় সেকথা। তাই আম্রলতিকা পরিত্যাগের সময় সেখানকার অধিবাসীরা আকুল হয়ে কেঁদেছিল। বুদ্ধদেব তাদের অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখেছিলেন, কিন্তু

তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কোন রেখাপাত হতে দেখা যায়নি। দেখা যায় না কখনো। তাঁর দৃষ্টিতে করুণা ঝরে পড়ে শুধু।

যে পথ দিয়ে তিনি ফিরে চললেন বেণুবন হয়ে গৃধ্রকূটের দিকে, সেই পথের দুধারের বৃক্ষরাজি তাঁর আগমনবার্তা পূর্ব থেকে কি করে যেন জানতে পেরেছিল। সম্ভবত কোন কোকিল কিংবা দোয়েল, খঞ্জন কিংবা শ্যামা সুর করে বলতে বলতে গিয়েছে গৃধ্রকূট পর্যন্ত। পত্রপুষ্প ফলের সম্ভারে সজ্জিত হয়ে রইল তারা। শাক্যমুনির মর্মবাণী এই অটবী শ্রেণী সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করে। কারণ তারা হিংসা কাকে বলে জানে না। তারা শুধু দিতেই জানে—সকলের মঙ্গলের জন্য তারা উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ভগবান তাই তাদের সান্নিধ্যে থাকেন সব সময়। তিনি প্রাসাদে থাকেন না। সেই কবে কোন্ সুদূর অতীতে নব যৌবন প্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সুখ ঐশ্বর্য আর অতি প্রিয়জনদের পেছনে ফেলে তিনি এক নিশুতি রাতে প্রাসাদ পরিত্যাগ করছিলেন, তারপর আর কখনো কোন প্রাসাদে থাকেননি।

গৃধ্রকূট পর্বতে পৌঁছনোর কদিন পরেই অজাতশত্রুর মন্ত্রী ভাষ্যকার এসে উপস্থিত। তিনি সেখানে বলেন, মহারাজা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বুদ্ধদেবের দর্শনপ্রার্থী।

বুদ্ধদেব সমীপে তাকে নিয়ে যাওয়া হলে ব্রাহ্মণ সন্তান ভাষ্যকার তাঁর যথাযোগ্য বন্দনা করে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলেন—ভগবান, মহারাজা আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আপনার মূল্যবান উপদেশ যাচ্ঞা করেছেন।

বুদ্ধদেব ভাষ্যকারকে ব্যক্ত করতে বলেন।

ভাষ্যকার তখন বলেন যে লিচ্ছবিদের প্রতি মহারাজ অজাতশত্রু বহুদিন থেকে বৈরীভাব পোষণ করেন এবং এই বৈরীভাব অহেতুক নয়। মহারাজা যখন অঙ্গরাজ্য শাসন করতেন তখন থেকে এর সূত্রপাত। গঙ্গা নদীর যোজনায় যে পোতাশ্রয় রয়েছে সেটি মগধ আর লিচ্ছবি রাজত্বের সীমানায়। পোতাশ্রয় থেকে অদূরে যে পর্বত রয়েছে সেটিকে দুই রাজ্যের সীমান্ত রেখা বলা হয়। পর্বতটির সানুদেশে বহুমূল্য খনিজদ্রব্য সঞ্চিত ছিল। সেখান থেকে লিচ্ছবিরা দুইবার খনিজসম্পদ আহরণ করে। অজাতশত্রু তাতে ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু সেই সময় পরিশ্রমী ও শক্তিশালী লিচ্ছবিদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাই চম্পা নগরীতে অবস্থানকালে তিনি সীমিত শক্তি নিয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। এখন তিনি এর একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলতে চান। তিনি চান লিচ্ছবিদের পদানত করতে। কিন্তু সেটি কি করে

সম্ভব হবে ! তাই মহারাজ পাঠিয়েছেন একটা উপায় নির্ধারণ যদি করে দেন।

বুদ্ধদেব শান্ত কণ্ঠে বলেন—যে জাতি পরিশ্রমী আর একতাবদ্ধ তাদের কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তবে ভবিষ্যতে এই লিচ্ছবিরা কোমল প্রকৃতির হয়ে বিলাসে মত্ত হয়ে উঠবে। তাদের হস্তপদ এখন যেমন শক্ত রয়েছে, তেমন থাকবে না। তারা খুব সুখদায়ক কোমল শয্যা ও উপাধানে শয়নে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে। সূর্যোদয়ের পূর্বে তাদের আর নিদ্রাভঙ্গ হবে না। এই অবস্থায় তারা পৌছনোর পূর্বে তাদের কোন ক্ষতি করা সম্ভব হবে না। তবে চাটুবাক্য দ্বারা কিংবা দ্রব্যসামগ্রী দান করে তুষ্ট করা যেতে পারে। কিংবা ওদের পাথরের মত শক্ত ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে ওদের পতন ঘটান যেতে পারে।

মন্ত্রী ভাষ্যকার বুদ্ধদেবকে অতি ভক্তি বিনম্র চিত্তে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে ভাষ্যকার মহারাজকে ভগবান অমিতাভের অভিমত জ্ঞাপন করেন।

মহারাজ বলেন—আমাদের অশ্ব এবং হস্তীর সংখ্যা হ্রাস করে ওদের দান করে তুষ্ট করা সম্ভব নয়। ওদের ঐক্য বিনষ্ট কিভাবে করা যায়, সেই মন্ত্রটা আমাকে দিন।

ভাষ্যকার বলেন—আপনি লিচ্ছবিদের নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি সভা আহ্বান করুন। লিচ্ছবিরাও যেন এই সভার কথা জানতে পারে। সেখানে আমি ওদের পক্ষ নিয়ে অনেক কথা বলব। তখন আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমার মস্তক মুণ্ডন করে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবেন।

অজাতশত্রু মন্ত্রীর এই পরামর্শে হাস্য সংবরণ করতে পারেন না। তিনি প্রশ্ন করেন—এর পর ?

—এরপর মহারাজ, আমি ওদেশে চলে যাব। ততক্ষণে ওরা জেনে যাবে ওদের হিতের জন্য কথা বলতে গিয়ে কীভাবে আমি আপনার নিকট অপমানিত হয়েছি। মনে হয়, ওরা আমাকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করবে। তখন আমি ওদের বলব, এখানকার দুর্গসংলগ্ন খাদ, প্রাকার সব কিছু আমার নখদর্পণে। অনেক কিছু আমার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মগধরাজ্য, বিশেষ করে রাজগৃহ দুর্ভেদ্য বলে মনে হলেও এর অনেক দুর্বল স্থান আছে। এসব বলে ওদের মনে আমি বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারব বলে আমার ধারণা।

—তারপর ?

—ওরা মন্ত্রীত্ব না দিলেও, কোন উচ্চপদ আমাকে দেবে। তখন আমি আমার কাজ শুরু করব।

—ঠিক আছে। আপনার পরামর্শ মত কাজ হবে।

নগরবাসীরা স্তব্ধ। মন্ত্রীবর ভাষ্যকার মুণ্ডিত মস্তকে চলেছেন রাজপথ ধরে। মহারাজা তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি চলেছেন মগধ রাজ্যের কেউ সমবেদনা জানাতে এগিয়ে এল না। কারণ তারা জেনে ফেলেছে তিনি মগধের চিরশত্রু লিচ্ছবিদের পক্ষ নিয়ে মহারাজের সঙ্গে তর্ক করেছেন। শাস্তি তাঁর প্রাপ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এভাবে মুণ্ডিত মস্তকে বিতাড়ন করায় অনেকে ব্যথিত। অথচ উপায় নেই। রাজকার্য বড কঠোর হয় কখনও কখনও।

ভাষ্যকার চলেছেন অবনত মস্তকে। ওই মস্তক যেন অপমানের বোঝা বইতে না পেরে অমন নুয়ে পড়েছে। তিনি অপাঙ্গে নগরবাসীর মুখের দিকে চেয়ে তাদের মনোভাব অনুমান করার চেষ্টা করেন। মনে হয় তারা বিশ্বাস করেছে যে তিনি উচিত কাজ করেননি। এতক্ষণে নিশ্চয় লিচ্ছবিদের কোন গুপ্তচর অশ্ব ছুটিয়ে দিয়েছে তাদের দেশের দিকে। এমন সুখবর সর্বাগ্রে পৌঁছে দিতে পারলে সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে লোভনীয় পুরস্কার লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

মহারাজ স্বয়ং এবং ভাষ্যকারের স্ত্রী ব্যতীত প্রকৃত ঘটনা আর কেউ জানে না। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত। তাঁর শিশুপুত্র অতশত বুঝবে না। তবে প্রতিবেশী গৃহিণীরা কিংবা অন্যান্য রমণীরা তাঁর স্ত্রীকে বাঁকা কথা বলতে ছাড়বে না। বলুক। এ তো ক্ষণস্থায়ী। তিনি সফল হলে দু-তিন বৎসরের মধ্যে হবেন। ফিরে যখন আসবেন তখন ফিরবেন দ্বিগুণভাবে সম্মানিত হয়ে। এখন যারা কটাক্ষ করবে তখন তারা লজ্জায় মাটিতে যাবে মিশে। অবশ্য এই দীর্ঘদিন স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত অবস্থায় থাকতে হবে। দুজনারই খুব কষ্ট হবে। বিরহ বেদনা ভোগ করতে হবে। কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলের জন্য মানুষ আত্মবিসর্জন অবধি দেয়। সেই তুলনায় এ অতি সামান্য ত্যাগ স্বীকার।

চলতে চলতে কয়েকদিন পর ভাষ্যকার গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমের নিকট উপস্থিত হন। সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চারদিকে ভালভাবে চেয়ে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, লিচ্ছবিদের প্রতিরোধ করতে কিংবা তাদের আয়ত্তে রাখতে এই স্থানটির গুরুত্ব অপরিসীম। মহারাজকে অবহিত করতে হবে, যাতে তিনি স্বয়ং স্থানটি পরিদর্শনে আসেন।

ভাষ্যকার কয়েকবার অনুভব করেছেন লিচ্ছবিদের কেউ ছায়ার মত অনুসরণ করছে তাঁকে। মাত্র একবার তিনি তাকে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেয়েছিলেন। চেষ্টা করলে হয়ত ভালভাবে দেখতে পারতেন। কিন্তু সেই চেষ্টা না করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

বিস্তীর্ণ নদী, বর্ষার অব্যবহিত পরে এখনো বেশ স্ফীত। নৌকো পাওয়া কঠিন। তবু একটি নৌকো এসে তীরে ভিড়ল। ভাষ্যকার তাকে অপর পারে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানাতে সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেল। তাঁর মনে হল, যথা সময়ে এই নৌকোর ব্যবস্থা সম্ভবত তাঁরই জন্য। অজাতশত্রুর দুর্বলতার কথা যথাশীঘ্র জেনে নিয়ে তাঁকে পরাস্ত করা ওদের অভিলাষ।

ওদের রাজ্যে পদার্পণ করতে তিনি পেলেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। কদিনের মধ্যে বৈশালীর অধিপতি ওঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তারও কয়েকদিনে পরে তিনি উচ্চপদে আসীন হলেন। তাঁর কর্মক্ষমতার কথা কারও অজানা নয়। তারা জানে এই বৈশালী ত্যাগ করে চলে যাওয়া গোপালের মন্ত্রীত্বের বহুবছর পরে ভাষ্যকারের মত এক যোগ্য মন্ত্রী পেয়েছিলেন মগধরাজ। গোপাল চলে যাবার ক্ষতি যেন বিধাতা নিজে পূর্ণ করে দিলেন।

যুবকেরা দলে দলে তাঁর কাছে রাজ্যশাসন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য আসতে লাগল। তিনি তাদের গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করে তাদের মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষের বীজ বপন করে চললেন। লিচ্ছবির রাজকুমারদের মধ্যেও এই বিষ সংক্রামিত হল। প্রজা আর রাজার মধ্যে ব্যবধান রচিত হল। প্রজারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে রাজা তাদের ভিখারী ছাড়া আর কিছু ভাবেনা। বড জোর ভাবে গরুর রাখাল।

ঠিক তিন বছর শেষ হতে মন্ত্রী ভাষ্যকার মহারাজ অজাতশত্রুকে গোপনে সংবাদ প্রেরণ করলেন—ক্ষেত্র প্রস্তুত মহারাজ। আপনি অগ্রসর হোন।

লিচ্ছবিদের এক অনবদ্য রীতি আছে। বৈশালীতে একটি বৃহদাকার সঙ্কেত ঘণ্টা রয়েছে। সেই ঘণ্টাধ্বনি রাজ্যের মানুষের কর্ণগোচর হলেই, যে যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ছুটে আসে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে। এই অপূর্ব একতা এতদিন তাদের রেখেছিল অপরাজেয়। এবারে অজাতশত্রুর সসৈন্যে অগ্রগমনের সংবাদে যখন এই বিরাট ঘণ্টা মুহুর্মুহু বেজে চলল সঙ্কেত জানিয়ে, তখন কেউ এগিয়ে এলনা। সবাই মনে মনে বলল, আমরা তো ভিখারী, আমরা রাখাল। ওরা যাক্। ওরা বীরপুরুষ। আমরা যাব কেন?

অজাতশত্রু বিনা বাধায় বৈশালীতে প্রবেশ করলেন। বহু মানুষের মৃত্যু হল, বহু ক্ষয়ক্ষতি হল। অজাতশত্রুর বহুদিনের সাধ পূর্ণ হল। বৈশালী মগধরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হল।

অজাতশত্রুর রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে বুদ্ধদেব আর একবার প্রশ্ন করলেন—বিম্বিসারের পুত্র কত বৎসর রাজত্ব করল সারিপুত্ত ?

সারিপুত্ত তাঁকে জানালেন।

বুদ্ধদেব তখন বললেন—তোমাদের আমি পাটলিগ্রামের কথা আলোচনা করতে শুনি। পাটলিগ্রামের কত কাহিনী লোকের মুখে প্রচারিত। আমার একবার দেখতে ইচ্ছা হয়। দুই বৎসরের মধ্যে দেখাতে পারবে না ?

কথাটা শুনে শিষ্যবর্গের মনে যেমন আশঙ্কা দেখা গেল, তেমনি একটি বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত হল, অন্তত দুই বৎসরের জন্য বুদ্ধদেব তাদের মধ্যে থাকবেন। তাঁর শরীরের অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছিল না। শিষ্যবর্গের মনের বাসনা ভগবানের পরিনির্বাণ যেন তাঁর প্রিয় নগরী রাজগৃহে হয়। কিন্তু তিনি পাটলিগ্রাম দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই শরীর নিয়ে চলতে পথশ্রম হবে খুব। তিনি রথে আরোহণ করেন না। অন্যভাবে তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে দেন না। তবু তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে হবে। তাঁর বাসনাই তাঁর নির্দেশ। সেই নির্দেশ পালনে সীমাহীন সুখ। তাঁর পদতলে বসে ধ্যানমগ্ন মুখের দিকে চেয়ে যুগ যুগ কাটিয়ে দেওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের ভক্ত সহচরবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন ভগবানের ইচ্ছা যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ কোন কারণে তিনি অশক্ত হয়ে পড়লে মনের ক্ষোভ কখনো যাবে না। সবাইকে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

আনন্দ বুদ্ধদেবকে অবশেষে একদিন বললেন—দুই মাসের মধ্যে যাত্রা করলে আপনি অনুমতি দেবেন ?

—যত শীঘ্র আয়োজন করতে পার, তত ভাল।

যাত্রার দিন সমুপস্থিত হল।

তখন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এতদিন ভগবান তথাগত এখানে ছিলেন। সকলেই নিশ্চিন্ত ছিল। জানত তিনি আছেন, থাকবেন। পঞ্চ-পর্বত যেমন আছে, তাপোদ যেমন আছে, সরস্বতী নদী যেমন আছে, পুষ্পরেণুগন্ধ মাখা

সমীরণ যেমন আছে, তিনিও তেমন আছেন, থাকবেন। সহসা এ যেন গৃধ্রকূটকে স্থানান্তরিত করা, সরস্বতী নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা। এ সহ্যাতিরিক্ত। আপামর জনসাধারণ, রাণী সমেত রাজা অজাতশত্রু সবাই এসে উপস্থিত হন তাঁর যাত্রাপথের উভয় পার্শ্বে। সবার হৃদয় শূন্য হয়ে যাচ্ছে। অসহায়তা আচ্ছন্ন করছে তাদের।

তথাগত হস্ত উত্তোলন করে সবাইকে অভয় দিলেন। তিনি বললেন—আমি নই। এযাবৎকাল তোমাদের যা বলে এসেছি, তাই অনুসরণ কর। তোমরা শান্তি পাবে, তোমরা সুখী হবে। সঙ্ঘের কাজে সহায়তা কর। সঙ্ঘকে বাঁচিয়ে রাখ।

সকলের এক প্রশ্ন—ভগবান আপনি আবার কবে আসবেন আমাদের মধ্যে ?

ভগবান স্মিত হাসেন।

সদলে এগিয়ে চলেন বুদ্ধদেব। নদী, পর্বত, প্রান্তর অতিক্রম করে এগিয়ে চলেন তিনি। পথিমধ্যে যেখানে যেখানে যাত্রার বিরতি ঘটে, সেখানে মানুষেরা তাঁর বাণী একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করে। কত সহজ ও সুমিষ্ট কণ্ঠে তিনি বলে চলেন তাঁর ধর্মের মর্মকথা। এর মধ্যে পাণ্ডিত্য নেই জটিলতা নেই।

এইভাবে একদিন তিনি এসে উপস্থিত হলেন শোন নদী ও গঙ্গার মিলন স্থলের নিকট। ওদিকে গণ্ডক নদী। চতুর্দিকে বিপুল জলরাশি—তাতে স্রোত, তাতে তরঙ্গ। বুদ্ধদেব একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সেদিকে। তাঁর আগমনবার্তা পেয়ে ইতিমধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা এসে সমবেত হয়। তারা অত্যন্ত আন্তরিক-ভাবে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানায়।

পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হলে বাইরে এসে বুদ্ধদেব সম্মুখের প্রান্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সেখানে অনেকটা দূরে একটি স্থানে সেই উষালগ্নেই অনেক মানুষের আগমন তিনি লক্ষ্য করলেন। আর দেখলেন, নবনির্মিত অর্ধসমাপ্ত কিছু অট্টালিকা।

আনন্দ বুদ্ধদেবের সর্বক্ষণের সহচর। তাকে প্রশ্ন করেন তথাগত—আনন্দ, মনে হচ্ছে ওখানে নতুন বসতি নির্মিত হচ্ছে। কারা এটি নির্মাণ করছে ?

—ভগবান, মগধের প্রধান মন্ত্রী ভাষ্যকার আর শুনিধ ওই নগর নির্মাণ করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল লিচ্ছবিরা যাতে সহসা মগধ আক্রমণ করতে না পারে। এই স্থানটির নামই পাটলিগ্রাম। আপনি ওই গ্রাম দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

—ও। এই স্থানটি পাটলিগ্রাম।

বুদ্ধদেব একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন সেদিকে। ধীরে ধীরে পূর্বাকাশ রঙিন হয়ে ওঠে। রক্তবর্ণ সূর্যের উদয় হয় একটু একটু করে। পৃথিবী জেগে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। পাখীরা আকাশ অতিক্রম করে। ভ্রমর ছুটে যায় ফুলের সন্ধানে। নিকটবর্তী গ্রামের গাভীরা মাঠে আসতে থাকে। মানুষেরা কর্মের সন্ধানে বের হয়।

আনন্দ লক্ষ্য করেন বুদ্ধদেব কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। মনে হল, তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, অথচ তিনি অচেতন নন। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর মন, সবকিছু বিচরণ করছে জগৎ-সংসার পার হয়ে বহুদূরে কোন অপার্থিব রমণীয় স্থানে। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হবার পরে আবার তিনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। তখন আনন্দকে ডেকে তিনি বলেন—জান আনন্দ, আমি দেখতে পেলাম এই পাটলিগ্রাম বেশীদিন আর এমন থাকবে না। শত শত গুণী ব্যক্তির বাসস্থান হবে এই পাটলিগ্রাম। অনেক প্রতিভাধর এখানে বাস করবেন। তাঁদের ঐশ্বর্য তাঁদের পরাক্রম বিস্মিত করবে ইহলোকবাসীকে। জান আনন্দ, একসময় পণ্যদ্রব্যের এক সুবিশাল বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এটির গুরুত্ব যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে রাজগৃহের আকর্ষণ তত হ্রাস পাবে। অবশেষে পাটলিগ্রাম হবে মগধের রাজধানী।

—নতুন রাজধানী কি চিরস্থায়ী হবে ভগবান ?

—জগতে স্থায়ী কিছু নয়। পাটলিগ্রামেরও দুর্বল স্থান আছে। এই নগর বিপর্যস্ত হবে প্রধানত তিনটি কারণে। অনেকবারই হবে। সেই তিনটি হল, অগ্নি, বন্যা আর অন্তর্কলহ। কিন্তু তার অনেক বিলম্ব।

বুদ্ধদেবের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মনশ্চক্ষে নূতন নগরীর রূপ ভেসে উঠল। তিনি দেখলেন হর্ম্য শোভিত, প্রাকারবেষ্টিত এক ঐশ্বর্যশালী নগরী, যার পথে-ঘাটে রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীদের যাতায়াত। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ উন্নত মানের। তারপর একসময় আনন্দ দেখলেন, গঙ্গার জল স্ফীত হয়ে উঠল। নগরবাসী প্রাণপাত চেষ্টায় যে বাঁধ নির্মাণ করেছিল গঙ্গার অগাধ জলরাশির প্রবল চাপে সেই বাঁধ ভেঙে পড়ল। নগরীর ভেতরে প্রচণ্ড বেগে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হল। কত শত মানুষের জীবনহানি ঘটল।

একদিন আনন্দ বুদ্ধদেবের নিকট শিষ্যবর্গের সামনে জানতে চাইলেন, কবে তিনি রাজগৃহে প্রত্যাবর্তনের দিন ধার্য করবেন।

বুদ্ধদেব শান্ত স্বরে বললেন—রাজগৃহে আমি আর ফিরব না। আমি কুশী-নগরে যাব।

শিষ্যবর্গ ম্রিয়মান হয়ে পড়েন। তাঁরা আশা করেছিলেন। আবার তাঁরা রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন। কারণ সেখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রমণ-শ্রমণী, থের-থেরীদের যত সম্মান তত আর অন্য কোথাও কি সম্ভব? তাছাড়া বুদ্ধদেব স্পষ্টতই দিন দিন কৃশ হয়ে পড়ছেন। এখন যদি কুশীনগরের দিকে যাত্রা করেন, তবে কি আর রাজগৃহে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব?

বুদ্ধদেব সহচরবৃন্দের মুখের দিকে তাকান। তাঁদের মনোভাব তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন। তাঁরা লজ্জিত হলেন। নিজেদের প্রশ্ন করেন তাঁরা মনে মনে, যত সামান্যই হোক রাজগৃহে কি তাঁরা ভোগবিলাসের স্পর্শ পেয়েছেন? কিংবা মিথ্যা সম্মানবোধ তাঁদের বিপথে চালিত করছে কি? কেন তবে রাজগৃহে ফিরে যাবার জন্য তাঁরা ব্যাকুল? পৃথিবীর সর্বত্রই তো একই মানব জাতি বসবাস করে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখ নিয়ে। ভগবান তথাগত তাদের সবার কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে বলেছেন। তবে কেন স্থান নিয়ে এই পক্ষপাতিত্ব? তবে কেন তাঁরা রাজগৃহে ফিরতে পারবেন না ভেবে বিমর্ষ হলেন? ভগবানের তো কোন বিকার নেই। রাজগৃহের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড়তম সম্পর্ক। তবু তাকে তিনি পশ্চাতে ফেলে এলেন জীর্ণ বস্ত্রের মত। তিনি আরও দূরে কুশীনগরে চলে যেতে চাইছেন।

দুদিন পরে বুদ্ধদেব পাটলিগ্রামের পশ্চিমের রাস্তা ধরে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে বিদায় জানাতে একত্রিত হল। এখান থেকে তিনি খেয়া পার হবেন। গ্রামবাসীরা সঙ্গে সঙ্গে ওই খেয়া ঘাটের নামকরণ করল "গৌতম ঘাট"।

বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অজাতশত্রু অনুভব করলেন মনের সমস্ত শক্তি বুঝি চলে গেল। মনে পড়ল, সেই ভীষণ দিনগুলির কথা, অনাহারে জরাজীর্ণ হয়ে পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, মনের তখন কী অবস্থা। কিছুদিন তিনি ছিলেন বিকারগ্রস্ত রোগী। সেই দিনগুলির কথা ভাবলে এখনো ভয় হয়। সেদিন বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে বসে সান্ত্বনার বাণী শুনেছিলেন। দগ্ধচিত্ত নিরাময় হয়েছিল। অতবড় চিকিৎসক জীবক, তিনিও কিছু করতে পারেননি সেদিন। আজ পিতার কথা ভাবলে, হৃদয় ব্যথিত হয়, অশ্রু ঝরে পড়ে—কিন্তু অমন হয় না।

বুদ্ধদেব চলে গেলেন। তিনি একদিন চলে যাবেন এ তো স্বাভাবিক। তবে

তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ ভক্তের মনে আশা ছিল, তাঁর পরিনির্বাণ হবে এই রাজগৃহে। তবে কি তিনি আবার ফিরে আসবেন ? মনে হয় না। যেভাবে তিনি হাত তুলে মিষ্টি হেসে সবাইকে অভয় দিয়ে যাত্রা করলেন তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল সেদিন তিনি এখান থেকে চিরবিদায় নিলেন।

অজাতশত্রুর মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে তাঁর যেন আর কোন কাজ নেই। এত যে উদ্যম, রাজ্যজয়ের এত ইচ্ছা কোথায় গেল সব ? প্রতিদিন রাজসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি গিয়ে সিংহাসনে উপবেশন করেন। মন্ত্রী, পাত্রমিত্র পারিষদ সবাই থাকেন। দৈনন্দিনের কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন হয়—তার বেশী নয়।

সেদিন প্রাসাদে শয়নকক্ষে অজাতশত্রু শয়ন করেছিলেন। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। এ সময়ে কখনো তিনি শয়ন করেন না। ভাবছিলেন, আগামীকাল থেকে আবার পূর্ণ উদ্যমে সব কিছু শুরু করতে হবে। নইলে শত্রুরা এর সুযোগ নেবে। কক্ষের আলো জ্বালাতে এসেছিল যে কিঙ্করী তাকে তিনি জ্বালাতে নিষেধ করলেন। কিঙ্করী কেঁপে উঠল। সে জানত না, মহারাজা স্বয়ং রয়েছেন সেখানে। কেউ তাকে বলে দেয়নি। রাণী কোথায় গেলেন ? মহারাজা একাকী শয়নকক্ষে অথচ কোন রাণী নেই ? সে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসে।

বাইরে স্বয়ং রাজমহিষী দণ্ডায়মান। ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি প্রশ্ন করেন—আলো জ্বালালে না ?

—না, নিষেধ করলেন।

—কে ? কে নিষেধ করল ?

চকিতে মহারাণীর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বলে—মহারাজা।

—মহারাজা ! তোমার মতিভ্রম হয়েছে। তাঁর আগমনবার্তা তিনি সব সময় আমাকে জানিয়ে আসেন।

কিঙ্করী নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। মহারাণীর কথার উত্তর দেবার স্পর্ধা তার নেই। তার ভয় হল, সে কি তবে অন্য পুরুষকে দেখেছে ? মহারাজার কক্ষে অন্য পুরুষ ? অসম্ভব। তবে কি কোন অশরীরী কিছু ?

—এসো। এভাবে কখনো দীপ না জ্বেলে চলে যাবে না।

মহারাণী কক্ষে প্রবেশ করেন। কিঙ্করী দ্বিধা জড়িত চরণে তাঁকে অনুসরণ করে। দু পা এগিয়ে মহারাণী থমকে দাঁড়ান। কিঙ্করীকে অতি নিম্ন কণ্ঠে বলেন—তুমি চলে যাও।

মহারাজা রাণীর প্রবেশ লক্ষ্য করেন না। তাঁর চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। রাণী এক

পা এক পা করে স্বামীর শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ান। তারপর তাঁর মস্তকে হস্ত স্থাপন করেন।

অজাতশত্রু চমকে ওঠেন। বলেন—ও, তুমি।

—আবার কে হবে?

—তাও তো বটে।

—মহারাজ আজ না বলে চলে এলে কেন?

—অন্যায় করেছি।

—না, অন্যায় হবে কেন? সবই তো তোমার। আমিও।

অজাতশত্রু উৎসাহিত হয়ে রাণীকে কাছে টেনে নেন। হেসে বলেন—তাই নাকি? একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

—তুমি ভুলে গেলে আমার দুর্দশার শেষ থাকবে না। তোমার মনের মধ্যে যতক্ষণ আমার স্থান আছে ততক্ষণ আমি গরবিনী, সৌভাগ্যবতী। তুমি আমাকে ভুলে থাকলে আমার রইল কি?

—না, সেভাবে ভুলিনি। ভুলতে পারি না।

মহারাণী মহারাজার বক্ষে মস্তক স্থাপন করেন।

—উদয় কোথায় রাণী?

—উদ্যানে পাঠিয়েছিলাম। এখনি চলে আসবে।

—ওকে দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কী সুন্দর হয়েছে। ওর চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন মাখানো। ওর মনে সহস্র কৌতূহল। ও যোগ্য রাজাধিরাজ হবে—দেখে নিও।

—নিশ্চয় হবে। তোমারই তো পুত্র।

—আর তোমার?

রাণী হেসে বলেন—হ্যাঁ, আমি দশ মাস ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

—অমনভাবে বলো না। আমাদের উভয়ের দোষগুণ সবকিছুর সমান অংশীদার ও।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমার উদয়নকে মহারাজের ইচ্ছানুসারে তাঁর নিকট আনা হয়। তাকে দেখে অজাতশত্রুর পিতৃ হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। নয়ন ভরে দেখেন, স্বাস্থ্যবান, প্রাণবান তাঁর শিশুপুত্রকে।

—উদয়ন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিলাম।

—বাঃ খুব ভাল। কার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলে?

—কেন, আমার কিঙ্করের সঙ্গে। সে পারে না। একটুতে হেরে যায় ভয়ে পালায়।

—তাই নাকি? তা তুমি কোথাকার রাজা?

—কেন? তুমি জান না? মগধের রাজা আমি।

—আর আমি?

উদয়ন মিষ্টি হেসে বলে—তোমাকে আমার সেনাপতি করে নেব।

রাজা রাণী দুজনেই প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন পুত্রের কথায়।

অজাতশত্রুর রাজত্বকাল অষ্টম বর্ষে পড়ল। তাঁর স্বপ্ন শুধু মগধের অধীশ্বর নয়, রাজরাজেশ্বর হওয়া। পিতা বিম্বিসার অসাধারণ যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। যুদ্ধে তিনি পিতার সমকক্ষ না হলেও রাজ্যবিস্তারের অন্যান্য সমস্ত পরিকল্পনার যথেষ্ট পারদর্শী। ইতিমধ্যে লিচ্ছবিরা তাঁর বশীভূত। তারা ভবিষ্যতে যাতে মাথা তুলে মগধের বিপদের কারণ না হতে পারে তার জন্য গঙ্গা শোন আর গণ্ডকের কাছে দুর্গ নির্মাণ করেছেন। সেই দুর্গপ্রাকারের বহির্ভাগে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠছে এবং অচিরেই যে সেটি নগরীর রূপ নেবে, তেমন সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। পুরাতন রাজগৃহের বহির্দেশে পিতা বিম্বিসার যে নগর গড়ে তুলেছিলেন, সেটিকেও সংস্কার করে আরও সুরক্ষিত করে তোলা হয়েছে। কিন্তু এত করেও মন বড় শূন্য বলে মনে হয়। শুধু তাঁর নয়, সমস্ত নগরবাসীর এই অবস্থা। বুদ্ধদেব এখানে নেই। তিনি চলে যাবার পর থেকে ভিক্ষুরাও ধীরে ধীরে নগরী পরিত্যাগ করে চলে যেতে শুরু করলেন। এখানে তাঁদের আর আকর্ষণ নেই।

আর ঠিক সেই সময় হৃদয়বিদীর্ণকারী সংবাদ এসে পৌঁছল রাজধানীতে। ভগবান তথাগত কুশীনগরীতে পরিনির্বাণ লাভ করেছেন। নগরবাসী আকুল হয়ে কাঁদল কদিন। মর্মে মর্মে অনুভব করল তারা যাঁকে হারাল, তাঁকে পেতে হলে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করেও নিরাশ হতে হয়। সমগ্র মগধরাজ্যে তথা সমগ্র ভারতভূমিতে শোকের ছায়া নেমে এল।

অজাতশত্রু দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করলেন কুশীনগরে আনন্দের নিকট। তিনি যাতে বুদ্ধদেবের দেহের পবিত্র অংশ প্রেরণ করেন রাজগৃহে।

তারপর একদিন সমারোহের সঙ্গে দেহের অংশগুলি এসে পৌঁছল রাজধানীতে। অজাতশত্রু, প্রধানমন্ত্রী ভাষ্যকার, উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এবং নগরবাসীরা সবাই নগরীর প্রধান দ্বারদেশে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে সেই

পবিত্র সামগ্রী গ্রহণ করলেন। সকলের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

পরম জ্ঞানী মহাকাশ্যপ রাজগৃহে ছিলেন। তাঁর প্রভাবে অনেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী তখনো রাজগৃহে থেকে গিয়েছিলেন। মহাকাশ্যপ সিদ্ধান্ত নিলেন ভগবান তথাগতের অন্ত্যেষ্টি এই রাজগৃহে সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করতে হবে। শুনে অজাতশত্রু খুব উৎসাহিত বোধ করলেন। শেষে ভিক্ষুদের সম্মুখে রেখে সমস্ত নগরবাসী একদিন সেই অনুষ্ঠান ক্রিয়ায় যোগদান করে।

এরপর অজাতশত্রু নগরীর চতুর্দিকে ধাতু-চৈত্য নির্মাণ করেন। যে সব মহাবিহার বুদ্ধদেব চলে যাবার পরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল তার আঠারোটির সংস্কার সাধন করলেন।

এদিকে মহাকাশ্যপ স্থির করলেন বৌদ্ধধর্মের প্রথম অধিবেশন তিনি রাজগৃহে করবেন। কারণ ভগবান বুদ্ধ তাঁর জীবনের অনেক সময় এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হবে। তাঁদের আপ্যায়ন করা এবং বসবাসের জন্য সুবন্দোবস্ত করতে মহারাজের আনুকূল্য একান্ত প্রয়োজন। তিনি জানেন অজাতশত্রু কখনো আপত্তি করবেন না। তবু তাঁর সঙ্গে কথা বলে মৌখিক অনুমতির প্রয়োজন।

এই ভেবে একদিন তিনি প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহাকাশ্যপ সকলের পরিচিত ও সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর আগমনে রক্ষীরা তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে উপবেশন কক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সেই সময় সহসা রাজকুমার উদয়ন সেখানে উপস্থিত হয়। তাকে এখন আর শিশু বলা চলে না, বরং বলা চলে বালক। মহাকাশ্যপকে সে না চিনলেও তাঁর মত পোশাক পরিহিত অনেক ভিক্ষু বা শ্রমণকে সে দেখেছে রাজপথে।

এগিয়ে এসে সে বলে—আপনি এখানে কেন? এখানে রাজা থাকে।

মহাকাশ্যপ হেসে বলেন—জানি। রাজার কাছেই এসেছি।

—কেন?

—প্রয়োজন আছে।

—আমাকে বলুন!

—আগে তুমি রাজা হও। তখন এসে বলব। কেমন?

উদয় রীতিমত ক্রোধান্বিত হয়। তার মুখ দেখে সেকথা বোঝা গেল। প্রহরীরা ভয় পেল। কারণ মহারাজা পুত্রকে ভীষণ ভালবাসেন। হয়ত প্রহরীদের প্রতি দোষারোপ করা হবে, কেন মহাকাশ্যপের সামনে রাজকুমারকে আনা হল। রাজকুমার নিজে এসেছে, সেকথা কি কেউ মানবে?

রাজকুমার যেভাবে প্রস্থান করল, সেই ভঙ্গিটির মধ্যে তার স্বভাব মহাকাশ্যপের সামনে উদ্ঘাটিত হল। অজাতশত্রুর কথা ভেবে তাঁর অনুকম্পা হয়।

তাঁর উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে অজাতশত্রু এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মহাকাশ্যপ বলেন—আমার একান্ত ইচ্ছা মহারাজা বৌদ্ধধর্মের প্রথম অধিবেশন এই রাজগৃহেই হোক। এই স্থান ভগবান বুদ্ধের পদধূলিতে পবিত্র ও ধন্য। তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

—আপনার স্থান নির্বাচনের জন্য নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। আমি ভাগ্যবান।

—মহারাজ বহু শ্রমণ, বহু ভিক্ষু ভিক্ষুণীর আগমন ঘটবে এই উপলক্ষে। স্থান সংকুলান হবে তো?

—নিশ্চয় হবে। সামান্য যেটুকু অভাব হবে, আমি তার ব্যবস্থা করব। এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান ভূভারতে আর কোথায় আছে!

—একথা কেন বললেন মহারাজ?

—প্রকৃতি এখানে সন্ন্যাসীদের আশ্রয়দানে অকৃপণ। যুগ যুগ ধরে এই পঞ্চপর্বতের অসংখ্য কন্দরে কত মুনি ঋষি আরাধনা করছেন, বসবাস করছেন। এখানে যদি আশ্রয় না পান তাঁরা কোথায় পাবেন তবে?

মহাকাশ্যপ সপ্রশংস দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে চেয়ে বলেন—আপনি যথার্থ বলেছেন। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

অজাতশত্রু বলেন—বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহার কথা একবার স্মরণ করুন প্রভু। অমন আদর্শ স্থান কি কোথাও পাওয়া যাবে?

—না।

—যদি সামান্য অসুবিধা হয় আমি সপ্তপর্ণীর পাশে বিশাল মণ্ডপ নির্মাণ করে দেব।

মহাকাশ্যপ অজাতশত্রুর অতি উৎসাহে নিশ্চিন্ত হয়ে হৃষ্টচিত্তে তাঁর বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একটু অসহায় হয়ে পড়েছিল। এই অসহায়ত্বের কথা মনে রেখেই ভগবান তাঁর অনুগামীদের সঙ্ঘের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে অবিচল রাখার কথা অনেকবার বলে গিয়েছেন। সঙ্ঘকে দৃঢ়ভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তবু তাঁর অবর্তমানে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল, সেই শূন্যতা তাদের বিচলিত করে তুলল। ঠিক সেই সময় রাজগৃহ থেকে মহাকাশ্যপের আহ্বান

গিয়ে পৌছল ভারতভূমির বিভিন্ন প্রান্তে বুদ্ধভক্তদের নিকট। তারা আশার আলো দেখতে পেল। যে রাজগৃহে এককালে স্বয়ং বুদ্ধদেব সূর্যের ন্যায় ভাস্বর ছিলেন, সেখানে আবার এক আলোক আভাস। জ্ঞানী গুণী বৌদ্ধেরা যাত্রা শুরু করলেন। সবার গন্তব্যস্থল রাজগৃহ।

নগরবাসীরা বিস্ময়পুলকিত চিত্তে অবলোকন করল যে রাজগৃহ বহুদিন পরে তার আপন মহিমা ফিরে পেয়েছে। সে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। উজ্জ্বল পীত ও গৈরিক বর্ণের পরিচ্ছদে নগরীর রাজপথ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে এক দৃষ্টিনন্দন শোভা। শোভাযাত্রা চলেছে এই বর্ণের। নগর প্রদক্ষিণের পরে বিশিষ্ট বিজ্ঞ ও ভক্ত অতিথিবর্গ যাত্রা করলেন বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণীর দিকে। সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রথম সভার আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা অবশ্যই মহারাজ অজাতশত্রু এবং পরিচালক মহাকাশ্যপ।

অধিবেশন চলল দিনের পর দিন। বুদ্ধদেবের জীবনী ও সাধনা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হল। যতদিন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, কেউ তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর প্রতিদিনের সামান্যতম উক্তি যার যা স্মরণে আছে বিবৃত করলেন। এইভাবে সপ্তপর্ণীর অধিবেশনে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী ও অনুশাসন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হল। তাঁর শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা বিষয়ক মতামত, সঙ্ঘ সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ যাতে চিরকাল মানবজাতির লভ্য হয় তার ব্যবস্থা করা হল।

তারপর একদিন অধিবেশন শেষ হল। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শ্রমণ-শ্রমণী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা সবাই ধীরে ধীরে নগর পরিত্যাগ করে আপন আপন স্থানে ফিরে গেলেন। রাজগৃহ পড়ে রইল আগের মত—শূন্য। বহু মূল্যবান পবিত্র স্মৃতি বুকে নিয়ে।

দিন যায়। বৎসরের পর বৎসরও অতিবাহিত হতে থাকে। অজাতশত্রু তাঁর রাজকার্য কঠোরভাবে পালন করে চলেন, রাজচক্রবর্তী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁর অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে। তবু বয়স যত বৃদ্ধি পায়, একটা অভাববোধ তাঁকে পীড়িত করে। তিনি মাঝে মাঝে মহাকাশ্যপের নিকট যান। দুদণ্ড তাঁর কাছে বসেন।

একদিন একান্তে তাঁকে প্রশ্ন করেন—আমার পুত্রকে কি আপনি দেখেছেন কখনো?

—হ্যাঁ মহারাজ কয়েকবার দেখেছি তাকে।

—কেমন মনে হয়?

—তাকে প্রথম দর্শনের কথা ভুলতে পারব না। তখন রাজকুমার সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মেছিল।

—কবে দেখেছিলেন প্রথম?

—অনেক বছব হয়ে গেল। সপ্তপর্ণীব প্রথম অধিবেশনের পূর্বে।

—কি মনে হয়েছিল আপনার তখন?

—রাজকুমার অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাব বহু সদ্‌গুণ রয়েছে বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে অসহিষ্ণুতা। আব রযেছে প্রচ্ছন্ন ক্রূরতা।

অজাতশত্রু চিন্তান্বিত হন। তিনি বলেন—ওর কোন ক্ষতি হবে না তো? ওর ক্ষতির কথা আমি চিন্তা করতে পারি না।

- অসহিষ্ণুতা মানুষের স্বভাবের একটি ক্ষতিকর বৃত্তি। তাতে নিজের ক্ষতি হতে পারে, অন্যেরও হতে পারে। উচ্চাশাব সঙ্গে অসহিষ্ণুতা মিলে অনেক সর্বনাশ ডেকে আনে।

—উপায়?

—উপায় কিছু নেই। ভগবান তথাগতেব নিকট শুধু প্রার্থনা করা, যাতে তার মতিভ্রম না হয়। তবে জানেন তো, ভবিতব্যকে খণ্ডন করা যায় না।

অজাতশত্রু ভাবেন, তাঁব অন্ধ পিতৃস্নেহ উদয়নের কোন ক্ষতি করতে পারে। সে আর বালক নয়। বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম কবেছে। এই সময়ে তাকে দায়িত্ব নিতে শিখতে হবে। নইলে বয়স্যদেব সঙ্গে থেকে, তাদের চাটুবাক্য অহরহ শুনে সে বিপথে চলে যেতে পাবে।

রাণীকে একথা জানাতে তিনি প্রশ্ন করেন—কোন্ দায়িত্ব সে নেবে?

—আমি যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমিও ওর বয়সী ছিলাম তখন। পিতা আমাকে চম্পা নগরীতে পাঠিয়েছিলেন।

রাণী বেদনাপূর্ণ নয়নে বলেন—উদয়ণ আমার কাছে থাকবে না?

—না। আমার কাছেও থাকবে না। ওকে ভবিষ্যৎ মগধের উপযুক্ত অধীশ্বর কবে গড়ে তুলতে হবে। তাই এই বিচ্ছেদবেদনা আমাদের সহ্য করতে হবে।

রাণী কোনমতে রাজী হলেও উদয় ক্ষিপ্ত হয়। সে কিছুতেই রাজগৃহ ছেড়ে যাবে না। মহারাজা বুঝলেন বয়স্যদের চাটুবাকের কুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে।

তিনি পুত্রকে কাছে ডেকে অনেক বোঝালেন। বললেন, তিনি নিজে কিভাবে চম্পা নগরীতে বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন। বললেন, রাজ্যশাসনের প্রকৃত স্বাদ আর আনন্দ ওখানে গেলে পাওয়া যায়। বললেন, ওখানে উদয় হবে প্রথম ব্যক্তি যার ওপরে কথা বলার কেউ থাকবে না। সবার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে সে।

তুদিন ধরে ক্রমাগত বুঝিয়ে বলার পর, পিতার উপদেশ উদয়ের মনে ধরে। শত হলেও, রাজগৃহে সে একেবারে স্বাধীন নয়। এখানে প্রতিপদে সহস্র বাধা। তাছাড়া ওখানে সে হবে প্রকৃত রাজা।

এক পক্ষকালের মধ্যে সে যাত্রা করল চম্পা নগরীর দিকে। সঙ্গে অবশ্য তুজন বয়স্যকেও নিল। নইলে দিনগুলি নীরস বলে মনে হবে।

মহারাজা নিশ্চিন্ত হলেন। এবারে পুত্র বুঝবে সহিষ্ণুতা কাকে বলে। বাধ্য হয়ে বুঝতে শিখবে। আর তার উচ্চাশাও কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হল।

ইতিমধ্যে লিচ্ছবিরা আবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে শুরু করল। তারা বশ্যতা স্বীকার করেছিল শুধু এই সর্তে যে মগধরাজকে তারা নিয়মিত কর দিয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি। নিজেরা তারা স্বাধীনভাবে চলত। পাটলিগ্রামে ভাষ্যকার তুর্ভেদ্য তুর্গ নির্মাণ করায় এদিকে তারা হস্তপ্রসারিত করতে সাহস পায়নি। কিন্তু এতদিন পরে আবার নিয়মিত ভাবে অর্থ প্রেরণ বন্ধ করেছে।

অজাতশত্রু অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করে অগ্রসর হন বৈশালী অভিমুখে। পিতার নিকট থেকে এইটুকু শিক্ষা তিনি অল্প বয়স থেকে পেয়েছিলেন যে, শত্রুপক্ষকে একেবারে সময় না দিয়ে তৎপরতার সঙ্গে আক্রমণ করলে তারা বিহ্বল হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

সমস্ত ভারতভূমির রাজা মহারাজারা জ্ঞাত আছেন যে মগধেশ্বর সম্প্রতি অতি মারাত্মক তুটি অস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তার একটি হল মহাশিলাকণ্টক। এটির দ্বারা শত্রু সেনার ওপর অবিশ্রান্তভাবে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সজোরে নিক্ষেপ করা যায়। ফলে শত্রুসৈন্য কিছুক্ষণের মধ্যে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় অস্ত্রটির নাম রথমুষল। রথচক্রের সঙ্গে ধাতুনির্মিত গদা এমনভাবে যুক্ত থাকে যে সেই রথ শত্রুবাহিনীর ভেতরে চালিত করলে শত শত সৈন্য আহত বা নিহত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।

অজাতশত্রু সসৈন্য গণ্ডক নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হবার অব্যবহিত পরে বৈশালী থেকে এক অশ্বারোহী ছুটতে ছুটতে এসে তাঁকে অভিবাদন

জানায়।

মন্ত্রী ভাষ্যকার মহারাজের পাশে ছিলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে দূতকে প্রশ্ন করেন—কি সংবাদ ?

—বৈশালীরাজ পত্র প্রেরণ করেছেন।

—দাও।

পত্রে দেখা গেল, বৈশালীরাজ ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র লিখেছেন যে তিনি পূর্ববৎ নিয়মিতভাবে কর প্রদান করে যাবেন। যে মন্ত্রী তাঁকে কর বন্ধ করে দেবার মন্ত্রণা দিয়েছিলেন তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছে। সুতরাং মগধরাজ যেন অনর্থক লিচ্ছবিদের আক্রমণ না করে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভাষ্যকারের সঙ্গে পরামর্শ করে অজাতশত্রু অশ্বারোহীকে বললেন—আমি এখানে অপেক্ষা করছি। বৈশালীরাজ যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

অশ্বারোহী আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে চলে যায়।

দুদিন পরে বৈশালী রাজ এলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের দূরে রেখে সামান্য কয়েকজন রক্ষীকে নিয়ে অজাতশত্রুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হন। মন্ত্রী ভাষ্যকার তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান তাঁকে সম্মান জানাতে। ভাষ্যকার তাঁর অপরিচিত নন। কারণ তিনি যখন সেখানে গিয়ে লিচ্ছবিদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন তখন এই রাজা ছিলেন তরুণ।

ভাষ্যকার বলেন—মহারাজের জয় হোক।

মহারাজ গম্ভীর হয়ে বলেন—আমাদের জয়ের পথ আপনি একসময়ে কৌশলে রুদ্ধ করে দিয়ে এসেছিলেন। সেই পথ উন্মুক্ত হবার আশা আমার জীবনে সম্ভবত নেই।

—আশা পরিত্যাগ করা অনুচিত।

—হ্যাঁ। আশা পরিত্যাগ করিনি। হয়ত আমার পুত্র সক্ষম হবে। তবে আমি মগধরাজের সঙ্গে বিবাদ চাই না। বরং রাজ্যের উন্নতিতে মন দেব।

অজাতশত্রু যথোচিত সম্মানের সঙ্গে মহারাজকে অভ্যর্থনা করলেন। বৈশালী-রাজ তাতে মুগ্ধ হলেন। অজাতশত্রুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। অভয় অবশ্য বলেছিলেন, যতটা দুর্নাম তাঁর রয়েছে, তার চেয়ে অনেক ভাল তিনি। দেখা যাচ্ছে কথাটা মিথ্যা নয়। ব্যবহার অকৃত্রিম—প্রাণখোলা। সহজভাবে কথা বলা যায়।

অজাতশত্রু বলেন—দেখুন রাজা, আমি চাই ভারতভূমিতে আমিই প্রধান থাকব। অন্য কেউ আমাকে অস্বীকার করলে সহ্য হয় না। আপনাদের ওপর

এককালে আমার ক্রোধ ছিল খুব। ভেবেছিলাম, পারলে আপনাদের একেবারে শেষ করে দেব, যদিও এখন বুঝি অমন ভাবনা বাতুলতার নামান্তর। আমার ক্রোধের কারণ দুবার আপনাদের কাছে আমি প্রতারিত হয়েছি। দুবার আপনারা আমার অঞ্চল থেকে মূল্যবান খনিজ পদার্থ আহরণ করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত অনেকদিন পূর্বের কথা। এখন ওই প্রসঙ্গ উত্থাপনের কোন অর্থ হয় না। আপনি আমার সুহৃদ। এই ভাল। রাজী তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়।

উপহার বিনিময়ের পরে হৃষ্টচিত্তে বৈশালীরাজ অজাতশত্রুর শিবির পরিত্যাগের পূর্বে বললেন--একটি অনুরোধ ছিল আমার। পূর্ণ করেন তো বলতে পারি।

—আপনি আমার অতিথি। আপনাব কোন অনুবোধ অপূর্ণ রাখতে চাই না।

—আপনার বিখ্যাত দুই ভীতিপ্রদ অস্ত্র দেখার বাসনা ছিল আমার।

অজাতশত্রু মন্ত্রী ভাষ্যকারের দিকে চাইলে তিনি দ্বিধায় পড়েন। শত হলেও লিচ্ছবিরা শত্রু। তাদের এই অস্ত্রের কলাকৌশল দেখানো সমীচীন হবে না।

ভাষ্যকারের মনোভাব অজাতশত্রু অনুমান করতে পারেন, কিন্তু এখন অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রয়োগ-কৌশল দেখানো চলবে না।

তিনি নিজে বৈশালীরাজকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মহাশিলাকণ্টক ও রথমুষল দেখান। লিচ্ছবিরাজ তখন অস্ত্র দুটির ব্যবহার পদ্ধতি দেখতে উৎসুক হন। অজাতশত্রু কিছু বলার পূর্বে ভাষ্যকার বলে ওঠেন—যারা ও দুটি ব্যবহার করে তারা এখন নেই। আপনি শিবিরে আসার পরে অনুমতি নিয়ে তারা পাটলিগ্রাম পরিদর্শনে গিয়েছে।

অতিথি হতাশ হন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাষ্যকারের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁর কথা কতদূর সত্য। কিন্তু ভাষ্যকারের মুখের অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

অতিথি তখন বলেন—হতাশ হলাম। যাই হোক কিছু করার নেই। আপনাদের পাটলিগ্রামের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।

অজাতশত্রু বলেন—হ্যাঁ, আমি নিজেই বিস্মিত হচ্ছি। এতগুলি নদী রয়েছে বলে এই স্থানটির আকর্ষণ বোধহয় বেশী। নইলে এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে এ যেন রাজগৃহকেও পেছনে ফেলে দিতে চাইছে।

অজাতশত্রু লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন লিচ্ছবিরাজের ললাটে দুশ্চিন্তার

রেখা। তাঁর রাজত্বের সীমান্তের নিকট মগধের একটি সমৃদ্ধশালী নগরী গড়ে ওঠা আশঙ্কার কারণ।

যুবরাজ উদয়ভদ্র যোগ্যতার সঙ্গে অঙ্গরাজ্য শাসন করেন। অজাতশত্রু আনন্দিত হন। মন্ত্রী ভাষ্যকার তাঁর একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে চম্পা নগরীতে রেখেছেন যুবরাজের সুখসুবিধার প্রতি সবার অলক্ষ্যে লক্ষ্য রাখতে এবং সেই সঙ্গে যুবরাজের সঙ্গীদের আচার-আচরণের কথা বিশদভাবে জানাতে। লোকটি একদিন গোপনে সংবাদ পাঠাল দুজন সঙ্গী যুবরাজের উচ্চাশাকে উস্‌কে দিতে সম্প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল হয়েছে। উদয়ভদ্র তাতে প্ররোচিত হচ্ছেন।

ভাষ্যকার এই সংবাদে বিচলিত বোধ করেন। উদয়ভদ্র তাঁর খুবই পরিচিত। যুবরাজের স্বভাব অজানা নয়। এভাবে চাটুকরেরা তাঁর চিত্তে অতৃপ্তির সৃষ্টি করলে, পরিণামে ফল বিষময় হতে পারে। তিনি মহারাজকে সব কথা জানিয়ে বললেন, রাজকুমারের সঙ্গীদের ওখান থেকে ফিরিয়ে আনতে।

অজাতশত্রু চিন্তা করে বলেন—উদয়ন অসন্তুষ্ট হবে, তাতে বিপরীত ফল ফলতে পারে।

মহারাজের কথাকে অস্বীকার করা যায় না। তবু সঙ্গীদের ওখানে রাখা চলবে না। তিনি নির্দেশ পাঠান বয়স্যদের যে কোনভাবে অপসারিত করতে। পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেও আপত্তি নেই। তবে সেটি করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। যুবরাজের মনে যাতে একবিন্দুও সন্দেহ না জাগে। ওই দুজনকে যদি কোনমতে বন্য হস্তীযূথের সম্মুখে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে সব চেয়ে ভাল হয়। কিংবা অহিতুণ্ডিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে।

দু মাস অতিবাহিত হতে না হতে চম্পানগরী থেকে সংবাদ আসে যুবরাজের দুই বয়স্যের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। উদয়ভদ্র বিমর্ষ। তিনি কিছুদিনের জন্য রাজগৃহে গিয়ে থাকার আয়োজন করছেন।

সর্পাঘাতে মৃত্যুর ঘটনা শুনে মহারাজ অজাতশত্রু নিমেষের জন্য মন্ত্রী ভাষ্যকারের চোখের দিয়ে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু বলেননি। মানুষের মৃত্যু কতরকমের হতে পারে, অদৃষ্টের লেখা। মৃত্যুর ঘটনা তাঁর মনের আনন্দকে হ্রাস করতে পারেনি। কারণ উদয়ন রাজগৃহে আসছে। কতদিন পরে পুত্রকে দেখবেন তিনি। মহারাণীও পুলকিত। প্রাসাদ অনেকদিন পরে প্রাণচঞ্চল হয়ে

উঠেছে। এবারে পুত্রের বিবাহের আয়োজন করতে হবে। বয়েবজন অতি রূপসী রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখান থেকে এবারে যখন উদয়ন চম্পা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আর একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফিরতে হবে না তাকে। সঙ্গে থাকবে তার নববধূ—ভাবী রাজমহিষী। বয়স্যদের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে উদয়।

যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বহুদিন পরে নগরীও উৎসবমুখর হয়ে উঠল। কতদিন রাজধানীর এই রূপ দেখার ভাগ্য হয়নি নগরবাসীদের। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের কয়েক বছর পরে প্রথম যে অধিবেশন হয়েছিল সপ্তপর্ণীতে তখন রাজধানী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা ছিল আর এক ধরনের রূপ। সেই রূপ, সেই অলঙ্করণ মানুষকে মাতায় না, নির্মল আনন্দ দেয় শুধু। তার স্বাদ তার আকর্ষণ ভিন্ন। উদয়ের আগমনের জন্য এই অলঙ্করণ হল পার্থিব। মাটির সাধারণ মানুষ, ভোগবিলাস যাদের কাছে মুখ্য, তারা এই ধরনের আনন্দ বেশী পছন্দ করে। সাধারণ মানুষেরা একঘেঁয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে একটা কিছুকে উপলক্ষ করে মাঝে মাঝে আনন্দে গা ভাসাতে চায়। এই আনন্দ উদয়ের আগমন উপলক্ষে না হয়ে বিবাহ উপলক্ষেও হতে পারত। কিংবা হতে পারত মহারাজার জন্মদিনে। উপলক্ষ প্রধান নয়, প্রধান হল আনন্দ করা।

যাঁর জন্য এত আয়োজন তাঁকে কিন্তু নগরীর রূপ দেখে আনন্দিত হতে দেখা গেল না। তিনি গম্ভীর এবং কিছুটা অন্যমনস্ক। মহারাজ আশাহত হলেন। পুত্রকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে তাঁর।

তিনি উদয়কে প্রশ্ন করেন—শরীর ভাল আছে তোমার?

—হ্যাঁ।

—পথে কোন অসুবিধা হয়নি?

—না।

মহারাজ বুঝতে পারেন, পুত্র যে কোন কারণে হোক কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। তিনি বলেন—তোমার মায়ের কাছে চল।

—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি নিজে গিয়ে দেখা করব।

এতক্ষণে অজাতশত্রু রীতিমত আহত হলেন। এ কোন্ উদয়? একে যে চেনা যায় না। সেই হাসি মুখ, সেই মিষ্টি কথা—কোথায় গেল সব? রাজ্যশাসন করতে গিয়ে কি সব ভুলে গেল? তা হবে কেন? বৃদ্ধ বিম্বিসারকে বন্দী করে কারাগারে প্রেরণ করার দুদিন আগেও তাঁকে প্রাণখোলা হাসি হাসতে দেখা গিয়েছিল। নিজের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা তখনো জানতে পারেন নি। তিনি

সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেও হাসতে ভোলেননি। অজাতশত্রু নিজেও তো হাসেন। তবে তাঁর পুত্রের এ দশা কেন ?

রাণীর কাছে গিয়ে অসহায়ের মত তিনি বলেন—জান রাণী, উদয় হাসতে ভুলে গিয়েছে। সব সময় কি যেন ভাবছে।

রাণী নিজেও কম ক্ষুন্ন হননি পুত্রের ব্যবহারে। এতক্ষণ তিনি অধীর আগ্রহে পুত্রের অপেক্ষা করছিলেন। একটু আগে শুনলেন পুত্র নিজের কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। বলে দিয়েছে কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। এমন ঘটবে মা হয়ে রাণী কল্পনাও করতে পারেননি। তবু রাজার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কষ্ট হল।

বললেন—পথশ্রমে বোধহয় ও ক্লান্ত।

—এত ক্লান্ত ? তাহলে দেশরক্ষা করবে কি করে ?

—অল্প বয়স। কোন সামান্য কারণে অসন্তুষ্টও হতে পারে। এই বয়সে পুরুষদের অমন হয়, তুমি তো জান।

অজাতশত্রু রাণীর কক্ষ থেকে বের হয়ে মন্ত্রী ভাষ্যকারকে সংবাদ পাঠালেন, আজ তিনি আর সভায় যাবেন না। আজ বিশ্রাম নেবেন। মন্ত্রী ভাষ্যকারের একটি মহৎ গুণ অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু বুঝেও তিনি নীরব থাকতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বিচলিত বোধ করলেন। একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। অথচ রাজা বিশ্রাম নিতে চান। বড় অস্বস্তি নিয়ে তিনি নিজগৃহে চলে গেলেন।

গভীর রজনী। নগরী নিদ্রায় অচেতন। ক্বচিৎ কখনো প্রহরীর হাঁক শোনা যায়। নগরবাসীর নিরাপত্তার জন্য প্রহরারত তারা।

প্রাসাদ নিস্তব্ধ। প্রথম রজনীর প্রজ্বলিত অনেক দীপ এখন নির্বাপিত। অন্ধকারের মধ্যে ডুবে রয়েছে অত বড় রাজপুরী।

মগধরাজ অজাতশত্রু আজ নিঃসহায়। রাণী আজ তাঁর শয়নকক্ষে আসেননি। মহারাজ আসতে বলেননি, মন তাঁর ভারাক্রান্ত। শয্যায় শয়ন করেছেন রজনীর প্রথম যামে। তখন থেকে অনিদ্র অবস্থায় রয়েছেন। উদয় তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল। কেন ? এর হেতু কি ?

অজাতশত্রু একবার ভাবেন রাণীর কাছে যাবেন। তিনি হয়ত সান্ত্বনার কথা শোনাতে পারবেন। কিন্তু রাণীর অবস্থাও কি তাঁর মত নয় ? রাণীর বেদনার্ত মুখ তিনি দেখেছেন। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে ? বহু বছর পূর্বে তিনি রাতের

পর রাত অনিদ্রায় অতিবাহিত করতেন। সেই রাতগুলি ছিল দুঃস্বপ্নে ভরা। আজকের অনিদ্র রজনী বেদনায় ভরা।

কক্ষের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র দীপ জ্বলছে। অস্পষ্ট আলো তার। ভেতরের কোন দ্রব্যই ভালভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সহসা দ্বারে শব্দ। একটু উন্মুক্ত হল দ্বার। রাণী বোধহয় আর একা থাকতে পারলেন না। তাঁর কাছে এসেছেন। রাজা উঠে বসেন শয্যার ওপর।

কিন্তু এ কি। পুরুষ মূর্তি? প্রাসাদে পুরুষ! কে এ? এত স্পর্ধা, মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করেছে বিনা অনুমতিতে। রক্ষীরা কোথায় গেল। নগররক্ষীরাই বা কি করছে?

মহারাজ চিৎকার করে ওঠেন—কে তুমি?

—আমি।

—আমি? ও উদয়। তাই বল। এস এস। এতক্ষণে সময় হল?

মহারাজা ভাবেন অনুতপ্ত পুত্র রাতের অন্ধকারে এসেছে তার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছেন তিনি। নিজের পুত্র। কে রয়েছে পৃথিবীতে তার চেয়ে আপন?

—এ কি পুত্র? তোমার হাতে অসি! কেন?

উদয় দৃঢপদে পিতার শয্যার দিকে এগিয়ে যান। তাঁর চোখ দুটি অস্পষ্ট আলোয় জ্বলতে থাকে।

—উদয়ন, ওভাবে চাইছ কেন? তুমি কি উন্মাদ হলে? অসিহস্তে এগিয়ে আসছ কেন? উদয়ন—

উদয়ভদ্র শান্ত অথচ কঠিন স্বরে বলেন—আগামী কাল থেকে মগধের অধীশ্বর আমি।

—এ তুমি কি বলছ! তুমি কি আমাকে হত্যা করবে?

—হ্যাঁ।

—পিতৃহন্তা হবে?

একটু হেসে উদয় বলে—হ্যাঁ, আপনার কাছে শিক্ষা নিয়েছি। আমার রক্তের মধ্যে পিতৃহন্তার বীজ। তবে নৃপতি বিম্বিসারের মত তিলে তিলে মারব না আপনাকে। অত নির্দয় আমি নই।

অজাতশত্রু চকিতে অদূরে দোলায়মান তাঁর কোষমুক্ত অসির দিকে হস্ত প্রসারিত করেন। অসি তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উদয়ভদ্রের দীর্ঘ তরবারি তাঁর মস্তক ছিন্ন করে।

উপসংহার

তেমনি অনুশোচনা, তেমনি ক্রন্দন, তেমনি বিভীষিকা দর্শন—নৃপাত বিম্বিসারকে হত্যার পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর অবস্থা যা হয়েছিল, তার অবিকল পুনর্ঘটন ঘটল উদয়ভদ্রের জীবনে। সূর্য অস্ত যাবার পূর্ব থেকে তাঁর অন্তরাত্মা কম্পিত হতে থাকে, সন্ধ্যা ঘনালে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সহসা একদিকে চেয়ে কোন ভীতিপ্রদ ছায়া দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন।

ভিষক এবং বিজ্ঞজনেরা বলেন রাজগৃহ পরিত্যাগ না করলে মহারাজার নিরাময় হবার কোন আশা নেই।

তাই কোন এক পুণ্য তিথিতে মহারাজা উদয়ভদ্র রাজগৃহ পরিত্যাগ করে পাটলিগ্রামের দিকে সদলে যাত্রা করলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হল নতুন জায়গায়। পাটলিগ্রামের নামকরণ হল পাটলিপুত্র।

উদয়ভদ্র নতুন স্থানে এসে পিতৃহত্যার অভিশাপ থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেলেন। নইলে পাটলিপুত্রের সন্নিকটে গঙ্গার দক্ষিণে কুসুমপুর নামে অমন মনোরম নগরী নির্মাণের মানসিকতা পেতেন না। এই কুসুমপুরেই তাঁর প্রাসাদ নির্মিত হল।

উদয়ভদ্র পিতা অজাতশত্রুকে একটি অতি সত্য কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন পিতৃঘাতীর রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত। সেটি যে যথার্থ, তাঁর প্রমাণ পরবর্তীকালে পাওয়া গেল। উদয়ভদ্রকে হত্যা করে তাঁর পুত্র অনুরুদ্ধ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। অনুরুদ্ধ নিহত হন তাঁর পুত্র মুণ্ডার ছুরিকাঘাতে। মুণ্ডার একই পরিণতি হয় পুত্র নাগদাশকার হস্তে। এঁরা প্রত্যেকেই কম বেশী মগধের সিংহাসন অলঙ্কৃত বা কলঙ্কিত করেছিলেন। কিন্তু একই নিষ্ঠুরতা বারবার দেখে নাগরিকবৃন্দ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারা সিদ্ধান্ত নিল এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। পিতৃহন্তার বংশকে মগধ থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করার জন্য তারা বলপ্রয়োগ দ্বারা নাগদাশকাকে নির্বাসনে পাঠাল।

তবে মগধের রাজধানী আর কখনো রাজগৃহে ফিরে যায়নি।—যে রাজগৃহ, সুদূর অতীতে, যখন তার নাম ছিল গিরিব্রজ, তখন থেকে মগধের বহু ঐতিহাসিক উত্থানপতনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এবারে এই নতুন রাজধানী পাটলিপুত্র মগধের পরবর্তীকালের মহিমা আর গৌরবের উজ্জ্বল দিনগুলি প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

রাজগৃহ পর্বের শেষে সেটি হবে পাটলিপুত্র পর্ব।

—